সভ্যতায় নারী

নাদভী

নাদভী প্রকাশনী

এই বইয়ের বহু চুম্বকাংশ হতেঃ

..... যেই মেয়ের জন্মকে আপনি অপছন্দ করে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতাকে উপেক্ষা করে MR করানোর জন্য আপনার স্ত্রীকে হাসপাতালের বেডে শুইয়ে দিয়েছেন, সেই মেয়ে জন্ম নিয়ে বড় হয়ে কেমন হবে জানেন? সে কিন্তু আপনাকে অর্থাৎ পুরুষকে মনে-প্রাণে ভালোবাসবে। এটি নারীর স্বভাব। তাই নারী যেই সোসাইটিতে বড় হোক না কেন, সে যতই Educated যতই Liberal এবং Model ও Broad-mind হওয়ার দাবী করুক না কেন, সে যখন একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তখন অন্য নারীকে তার স্বামীর আঙ্গিনায় কখনো মেনে নিতে পারে না। তার সাথে হিংসা করে নিজ স্বামীর একাই মালিকানা দাবী করা তার স্বভাব। স্বামীকে রাত-দুপুরে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমাকে বুঝাতে পারছি না তোমার সাথে আমার সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু। তবে শুধু এইটুকু মনে রেখো, আপনজন হাজার থাকার পরও তোমার কথাই কেবল মনে পড়ে। কি বুঝলেন? আবার অন্যদিকে যখন সে আপনার সন্তান জন্ম দিয়ে মা হয়ে যাবে তখন দেখবেন বাজারে সবকিছু পাওয়া গেলেও আপনার সন্তানের মায়ের মত জান্নাত পাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, যাই কিছু হোক না কেন ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু মেয়েরাই। আপনাকে এটি মানতেই হবে। কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র দেয়া এমন একটি ফুল যে সব বাগানে ফোটে না।
.....

..... এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা মেয়ে জন্ম হওয়ার কারণে নিজ স্ত্রীকে দোষারোপ করে। স্ত্রীকেই মেয়ে জন্ম হওয়ার কারণ বলে মনে করে এবং সন্দেহ করে। তবে যারা এই রোগে আক্রান্ত তাদেরকে মনে রাখতে হবে, সন্দেহ এমন এক রোগ যা মানুষের শান্তিকে নীরবে হত্যা করে ফেলে। আর তাই সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি কোনোভাবেই স্ত্রীর প্রেম যন্ত্রের গভীরে গেয়ে ওঠা প্রেমের গুনগুনানী সুর শুধু দিনে দুপুরে নয়, রাতের অন্ধকারে বেড শেয়ার করতে গিয়েও শুনতে পায় না। যে নারীর স্বামীর মাঝে সন্দেহ রোগ বাসা বেঁধেছে, সেই নারীর ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কী করার আছে? তেমনই এক নারী সন্দেহ প্রবণ স্বামীর সংসারে কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে জানেন? সে বললো, ভাই আমার ধৈর্যের কথা আপনাকে কি বলবো? আমার স্বামী আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে অন্য কাউকে পাওয়ার জন্য। এমন পুরুষকে বলবো, ফেলে আসা দিনগুলোকে কখনো মনে রেখো না। আগামী কালের সুখের আশায় আজকের নিজেদের একান্ত সময়ের হাসিকে নষ্ট করো না। ভাগ্যে যা লিখা ছিলো তার অভিযোগ করো না। ফায়সালা আকাশে হয় যমীনে নয়। এমন ঈমান নিয়ে বাঁচতেও হবে মরতেও হবে। তবেই তুমি একজন স্বার্থক পুরুষ.....।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সভ্যতায় নারী

নাদভী

প্রকাশক

নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী

নাদভী প্রকাশনী

প্রফেসর নাদভী রেসিডেন্স,

বুলবুলী পাড়া

(আইআইইউসি গেইটের সামনে)

কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

সভ্যতায় নারী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

শব্দ বিন্যাস

জারীর কম্পিউটার্স
বাড়ি নং-৯৮০,
রোড নং-৭, ৪র্থ তলা
ও. আর. নিযাম রোড
জি ই সি, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ : এট্যাচ এ্যাড
৩৮ মোহনা ম্যানসন (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান : **আযাদ বুক্স**
১৯, শাহী জামে মাসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Shobbhotay Nari
By
Professor Nadwi
Phone : 01819-548093
E-mail : ataurrahmannadwi@gmail.com

Published in Bangladesh By Nadwi Prokashoni
Professor Nadwi Residence
Bulbuly Para (in front of IIUC Gate)
Kumira, Sitakundo, Chittagong
BANGLADESH

Price : 250 Taka only

উৎসর্গ

মরহুমা আম্মা
মেহের আফজুন বেগম
ও
শ্রদ্ধেয় আব্বা
এ. বি. এম. আব্দুর রায্যাক্ব মাস্টার
যাঁদের দো'য়ায় আমি আজ ধন্য
এবং
জীবন সফরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী
নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী
আমার পারিবারিক বাগান সাজিয়ে
দুন্ইয়া ও আখেরাতের মুক্তির চিন্তায় কাটে যার দিবা-রজনী।

নাদভী

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথন	৫
ভূমিকা	৮
সভ্যতায় নারী ঃ একটি পর্যালোচনা	১৪
গ্রিক সভ্যতায় নারী	১৯
রোমান সভ্যতায় নারী	২২
পারস্য সভ্যতায় নারী	২৮
ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী	২৯
জাহেলী যুগে নারী	৩৩
ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস ও আমরা	৬৮
ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা	১২৫
প্রাচীন ও পশ্চিমা সভ্যতার ফলাফল	১৪১
পশ্চিমা সভ্যতায় সমানাধিকার ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম	১৪৬
পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামে নারীর অবস্থান	১৫৯
সভ্যতার নামে প্রযুক্তির আক্রমণে রক্তাক্ত উম্মাহ্‌র বন্ধন	২০২

প্রকাশকের কথন

প্রফেসর নাদভী সার্বক্ষণিক একজন গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। দ্বীন ভিত্তিক সমাজচিন্তক গভীর জীবন দর্শনে দক্ষ এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রথিতযশা সাহিত্যিক। মানব সমাজে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে ইসলামের আলোকে সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে পাঠকদের কাছে উপস্থাপনে পারদর্শী একজন লেখক ও গবেষক। তিনি তাঁর লেখায় হাসি-ঠাট্টার উপমার মাধ্যমে সমাজের কাছে অনেক গভীর ম্যাসেজ দিয়ে থাকেন। অভাবনীয় বিষয়গুলোকে তিনি কলমের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে মনোমুগ্ধকর করে তুলে ধরার এক ঈর্ষণীয় যোগ্যতা রাখেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত **'বিয়ে' 'সংসার' 'দাম্পত্য জীবন' 'বিশ্বায়ন ও নারী'** নামক বইগুলো আমাদের দাবীর জ্বলন্ত প্রমাণ।

এর পূর্বেও তিনি **'নারী এজেন্ডা'** নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরেকটি বই লিখে সর্ব মহলে বেশ খ্যাতি কুড়িয়েছেন। তিনি মানুষের মনের ভাষায় যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে মানব সমাজের দাম্পত্য জীবনে দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোক সাজিয়ে এই বইতে উপস্থাপন করে আবারও একজন সফল লেখকের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই তাঁর বই প্রকাশের সাথে সাথে পাঠকরা হাতে হাতে নিয়ে নেয়। কারণ তিনি তার লেখায় পাঠকদের মনের কথাগুলোকে তাদের ভাষায় ও বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরে সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করে আনেন। প্রফেসর নাদভীর **'সভ্যতায় নারী'** বইটি আমাদের প্রকাশনীর পঞ্চম বই। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইগুলো আমাদের প্রকাশনী হতে প্রকাশ হওয়ার পর যারাই পড়েছেন তারাই অধীর আগ্রহে অন্য বইয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। এই বইটি তার দীর্ঘ দিনের চিন্তার ফসল। পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিয়ে তাদের অপেক্ষার ক্লান্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত। আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত মস্তকে লাখো শুকরিয়া আদায় করে বলছি **আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌**। মূলতঃ তার প্রত্যেকটি বই ও প্রবন্ধ অতুলনীয় একটি গবেষণা কর্ম।

তাঁর আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একটি ঘটনাকে আরেকটির সাথে মিলিয়ে ক্বোরআন হাদীস হতে কোটেশন উল্লেখ করে সেটিকে সমসাময়িক

বিষয় বানিয়ে আগে পরে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে পাঠকদেরকে মাতিয়ে রাখেন। অন্যরা যা ভাবতে পারছে না প্রফেসর নাদভী সেটিকে শুধু একটি বিষয় নয়; বরং আকর্ষণীয় করে গল্পের মত পাঠকদেরকে শুনাতে থাকেন। তাই যে কোনো বয়সের পাঠক তাঁর বইয়ের এক পৃষ্ঠা পড়লে পরের পৃষ্ঠায় কি আছে তা জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহরে সাথে পাতা উল্টাতে থাকেন। কারণ তিনি ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে শিক্ষণীয় একটি বিষয়কে আজকের ঘটে যাওয়া আরেকটি বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মূল ম্যাসেজটি পাঠকদের মন ও মস্তিষ্কে চিত্রায়িত করে থাকেন। এভাবে Islamization of Knowledge এর কাজটি খুব সূক্ষ্মভাবে করাকে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এটিই তার যোগ্যতা এবং এটিই তার মিশন এন্ড ভিশন। **'সভ্যতায় নারী'** বইটিও একই যুগসূত্রে গাঁথা তাঁর আরেক মনোমুগ্ধকর সংযোজন।

বইটি মূলতঃ নারীদের জন্য গভীর একটি দর্শন। সুন্দর দাম্পত্য জীবন গঠনের একটি আধুনিক ফর্মূলা। পাঠকদেরকে পরিবার ও সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখার কৌশল সম্পর্কে ভাবতে এবং নিজেদের চলনে বলনে পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করবে। সভ্যতার নামে ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে আশ্রয় নেয়া টুকটাক বিষয়গুলোকে তিনি ইসলামের আলোকে সাজিয়ে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র মোড়কে মুড়িয়ে দিয়ে এক অনন্য স্বাদের স্বকীয়তায় উপস্থাপন করেছেন। যা পাঠকদেরকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে শুধু সক্ষম হবে তা নয়; বরং এক বৈঠকে বইটি শেষ না করে উঠতেও মন চাইবে না। কারণ সভ্যতার নামে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে এই বইয়ের চেয়ে অগ্রগামী কোনো বই এযাবৎ তাদের হাতে পড়েনি। এমনকি বর্তমান বইয়ের জগতে আছে কিনা তাও সন্দেহ। তবে আমরা মনে করি এটিই প্রথম এবং এবিষয়ের পথিকৃৎ।

প্রফেসর নাদভী ছাত্র জীবন হতেই আরবী-বাংলায় লেখা-লেখি শুরু করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌতে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তাঁর প্রথম লেখা জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তাঁর লিখিত আরবী প্রবন্ধ নাদওয়ার আরবী পত্রিকা **'আল্-রায়েদ'** ও **'আল্-বা'আসুল ইসলামী'** তে নিয়মিত যেমন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলায় লিখিত তার প্রবন্ধগুলোও কলকাতা হতে প্রকাশিত **'আল্-কলম'** পত্রিকাসহ

বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়ে দেশ-বিদেশে পাঠক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

প্রফেসর নাদভী যখনই কোনো বিষয়ে কলম ধরেন তখনই সেই সম্পর্কে লেটেস্ট ধারণা নিয়ে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা ও পদ্ধতিতে বিষয়টিকে তুলে ধরেন। মানব সমাজে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলোকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রেকর্ড করে কলমের মাধ্যমে সেগুলোকে ইতিহাস বানিয়ে ফেলেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কঠিন বিষয়কেও সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে পারদর্শী বললে ভুল হবে না। তিনি তাঁর বই ও প্রবন্ধ পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য সমাজের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে কৌতুকের ভাষা ও পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেন। যা পাঠকদেরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

যার প্রমাণ **প্রফেসর নাদভী** এই বইতেও রেখেছেন। খুব সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়ে কঠিন কথাগুলোও সহজ করে উপস্থাপন করেছেন। একারণেই তাঁর বই পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তার সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলো সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার মাঝে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। দেশ-বিদেশের পাঠকরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে যুগোপযোগী এমন সামাজিক একটি বই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপহার দেয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা আশা করি **'সভ্যতায় নারী'** এই বইটিও সর্ব মহলে সাড়া জাগাতে যেমন সক্ষম হবে, তেমনি সুন্দর একটি সামাজিক জীবন গঠনের সঠিক পথ-নির্দেশনা বলেও বিবেচিত হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং উম্মাহ্‌র আরো খেদমাত করার তাওফীক্ব কামনা করছি। আল্লাহ্ তাঁকে ক্বাবুল করুন। **আ-মী-ন**।

নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী
নাগড়ীপাড়া,
মোহাম্মাদপুর, মাগুরা।
২৬ ডিসেম্বর, ২০১৮

ভূমিকা

اللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَدَدَ ذَرَّات الكَوْن في السَّموات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُما وَمَا وَرَاءَ ذلك. وَأَنْتَ سُبْحَانَكَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَفِي الْمَلأ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ!

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। অসংখ্যবার দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত ও সভ্যতার পথপ্রদর্শক রাসূলে আরাবী মুহাম্মাদ (স.) এর উপর।

বিয়ের পর হতেই আমার শারীকে হায়াত **নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী** (এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আমাকে আমার ছাত্র জীবনের অভ্যাস অনুযায়ী লেখা-লেখি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করে আসছেন। তার সাথে সাথে বিয়ের আগে ও পরে দেশ-বিদেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত আমার লেখাগুলো একাত্রিত করে বই আকারে দেখারও প্রবল ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন। তাছাড়াও তিনি আমার আরবী লেখাগুলোর বাংলা এবং বাংলাগুলোর আরবী করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করে আসছিলেন। কিন্তু করছি করবো বলে কাটিয়ে দিলাম বহু বছর। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

প্রায় দশ বছর আগে **'নারী এজেন্ডা'** নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিলো। বইটি সর্বমহলে প্রশংসিত হলেও কিছু লোকের পছন্দ হয়নি। তাই বেশ কিছু ঝামেলাও তারা করেছিলো। তবে তারা কিছু করতে না পারলেও কিছু দিনের জন্য আমার কলমকে থামিয়ে দিয়েছিলো এটি সত্য। বাংলাদেশের মিডিয়ার মত। ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে গেলেই টুঁটি চেপে ধরে। হয় বন্দুকের গুলি, না হয় কলমের কালী দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়। তবে সত্য কথা হলো, সব মহলেরই একই অবস্থা। কোথাও কেউ নিজের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। সবাই নিজেকে ফেরেশ্‌তা ভাবে। নিজেকে ছাড়া পৃথিবীটা অচল মনে করে। তাই না লিখেই বসেছিলাম এক দশক। কোনো প্রবন্ধ লিখলেও গোলআলু মার্ক না হওয়ায় কেউ ছাপানোর সাহস করে না। তারপরও যা লিখেছি তাও অনেক। অতঃপর আবারও স্ত্রীর পরামর্শে কলম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

এসব উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু লিখেই চলছিলাম। দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নব সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলাম অনেক বছর। ভাবলাম পরিস্থিতি ভালো হলে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেলে সেই লেখাগুলো দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আলোর মুখ দেখবে। কিন্তু না, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই অপেক্ষার পালা বাদ দিয়ে নিয়মিত লিখতে বসে গেলাম। আল্লাহর রাহমাতে লিখতে বসেই অহর্নিশ চিন্তা ও গবেষণার স্রোতঃধারার প্রচন্ড গতি অনুভব করলাম। পেছনে জীবন সঙ্গিনী নীলের সার্পোট তো আছেই। অতঃপর খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বই পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলাম, **আল্‌হামদু লিল্লাহ্**।

প্রতিনিয়ত পাঠকদের প্রশংসা, বিশেষ করে ভার্সিটির কলিগদের আলোচনা ও সমালোচনাসহ অনুপ্রেরণা এবং তাদের আরো নতুন বইয়ের চাহিদাকে মূল্যায়ন করে কালক্ষেপণ না করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম লেখার টেবিলে। আমার বইয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রশংসার ভাষার স্রোতে ভেসে গেলাম বহূদূর। এভাবে বহু প্রতীক্ষা ও নির্ঘুম রাত কাটানোর পর পৌঁছে গেলাম আরো একটি নতুন রচনা **'সভ্যতায় নারী'** নামক বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায়, **ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ**।

একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিন পরস্পর ভাই ভাই। তাই ঈমানের দাবী অনুযায়ী প্রত্যেক ঈমানদার নারীও আমার বোন। অন্যদিকে পুরো মানব জাতি আদমের সন্তান হওয়ার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বী নারীরও সুতো টান দিলে আদম (আ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই বলে আমি মনে করি। তাই এখানে নির্দিষ্ট কোনো পরিবার ও নারী, সভ্যতা বা কোনো সমাজের রীতি-নীতির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং কোথায় নারীর কী অবস্থান ছিলো তা তুলে ধরে বর্তমান সমাজে নারী যে অবস্থানে পৌঁছেছে এটি কোন্ সভ্যতার অবদান সেটি তুলনামূলকভাবে আমানাতদারীর সাথে তুলে ধরাই আমার মূখ্য উদ্দেশ্য।

অতএব আমার বর্ণনা কারো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন এবং চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতার সাথে মিলে গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয় মনে করতে হবে। কারণ কাউকে মন্দ ঠাওরানো বা কারো মত প্রকাশের স্বাধীনতায়

আঘাত করার জন্য আমি কলম ধরিনি। নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়ে নিজেই নিজের অবস্থান হতে লিখে চলেছি। একটি লেখা শেষ করে বই আকারে প্রকাশের পর মনে করি এবার একটু শ্বাস নেবো। না তার আগেই আমার ছেলে জারীর নাদভী, মেয়ে নাবেগাহ নাদভী এবং নাদেজাহ নাদভী বলে উঠে এরপর এই বিষয়ে লেখা শুরু করেন। তবে ছোট ছেলে জালীস নাদভী আমার এমন লেখা-লেখিতে বেজায় না-খোশ। কারণ সে মনে করে এভাবে তার বাবা লেখায় ব্যস্ত থাকলে সে ল্যাপটপ নিয়ে খেলতে পারবে না। তাই কিছুক্ষণ পর পর এসে জিজ্ঞেস করে **'আবী, ইলা মাতা তাকতুব?'** আর্থাৎ আর কতক্ষণ লিখবেন আব্বা। আবার কখনো এসে জিজ্ঞেস করে **'ইলা মাতা আনতাযের?'** আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?

তাই খেলার জন্য তাকে ল্যাপটপ দিয়ে মাঝে মাঝে তার ইচ্ছেও পূরণ করতে হয়। কিন্তু আমার দাম্পত্য জীবনের কন্ট্রোলার **নীল** তার ছেলের এমন আবদার পূরণে বাধ সাধেন। তিনি মনে করেন, ছেলের আবদার পূরণ করতে গিয়ে তার দেয়া বিষয়টি হয়ত সময়ের অভাবে চাপা পড়ে যাবে। কারণ তিনিও প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য ও বিষয়বস্তু দিয়েই চলছেন। সাথে সাথে এ সব বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তথ্য উপাত্ত জোগান দিয়ে বলেও যাচ্ছেন, সমাজে এখন এটির খুব প্রয়োজন। তোমরা জান না, সমাজে কি হচ্ছে? রয়েল সোসাইটিতে হায়া শরমের শুধু জানাযাহ্ বের হয়নি, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তার দাফনও হয়ে যাচ্ছে। তাই এসব বিষয়ে এখনই তোমাকে কলম ধরতে হবে। সমাজকে বুঝাও এই দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা না করলে এসব কাজ কে করবে? আখেরাতে আল্লাহ্কে কি জাওয়াব দেবে?

এদিকে ভাসিটির কলিগরাও কম বলেন না। তারাও বিভিন্ন বিষয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে অপেক্ষা করছেন। দেখা হলেই প্রশ্ন করছেন, তাঁর দেয়া বিষয়ে কবে লেখা শুরু হবে। অনেকে বলেও ফেলেন, এবার এটি শুরু করেন। কেউ বলছেন সন্তানদের চরিত্র গঠন সম্পর্কে একটি বই অতি প্রয়োজন। আবার কেউ বলছেন বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে লিখা এখন সময়ের দাবী। আর নিজের পরিকল্পনা তো আছেই। তবে এখানে পাঠকদেরকে বলে রাখি, লিখতে বসেছিলাম **'ত্বালাক্ব'** নিয়ে। লিখেও ফেলেছি প্রায় বারোশ পৃষ্ঠার

অনেক বড় একটি বই। এত বড় বই পাঠকরা পড়তে সাধারণত বিরক্তিবোধ করে তাই সেই বইয়ের **'বিয়ে'** অধ্যায়টিকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে **'বিয়ে'** নাম দিয়ে ছেপে দিয়েছি গত বছর। বাজারে আসতেই সেটি শুভাকাঙ্খিদের হাতে হাতেই শেষ হয়ে গেছে।

অতঃপর পূর্বের ত্বালাক্ব সংক্রান্ত বইটি নিয়ে যখন কাজ শুরু করলাম তখন মনে হলো, বিয়ের পরে **'সংসার'** ও **'দাম্পত্য জীবন'** নিয়েও আলোচনা হওয়া দরকার। আল্লাহ্‌র রাহমাতে উক্ত দু'টি বইও খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি **আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌**। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে নব দম্পতিরা শায়ত্বানের প্ররোচনায় একটু বেশী উদাসীন হয়ে জীবনকে ভোগ করতে চায়। তারা বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় যা খুশী তার করতে চায়। তাই বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য **'বিশ্বায়ন ও নারী'** নামে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্য একটি বইও তাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি, **ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ**।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান কোথায় ছিলো এবং কোথা হতে উঠে এসে পরবর্তীতে কোন্‌ ধর্ম ও সভ্যতার অবদানে মানব সমাজে মানুষ হয়ে বাঁচার সুযোগ পেয়েছে শুধু তাই নয়, পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি দানের মাধ্যমে একটি সম্মানিত জীবন পেয়েছে তা তুলে ধরাকে আমি ঈমানী দায়িত্ব মনে করেছি। কারণ প্রাচীন সভ্যতায় নারী জীবনের ইতিহাস জানা না থাকলে পুরো বিষয়টি অন্ধকারেই থেকে যাবে। ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির অপপ্রচারে মুসলিম নারীই নিজের আসল পরিচয় ভুলে তাদের প্রপাগান্ডার স্রোতে ভেসে যাবে। আশা করি সেই স্রোতের মুখে আমার এই বইটি সামান্য হলেও বাধা হয়ে দাঁড়াবে। **'সভ্যতায় নারী'** বইটি সেই চিন্তারই ফসল।

উল্লেখ্য যে, আমি যখনই একটি কথা শুরু করেছি তখন আগে ও পরে ক্বোরআন হাদীস এবং ইতিহাসের আলোকে সমাজে প্রচলিত চরিত্রগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে পুরো বিষয়টিকে পাঠকদের বোধগম্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আর এটিকে তথ্যবহুল এবং অথেন্টিক করতে বহুঘাটে সকাল সন্ধ্যা আমার তরী ভিড়াতে হয়েছে। অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি। তবে শোনা শোনা কথাকে আমি এখানে দলীল

হিসেবে উপস্থাপন করিনি; বরং ইতিহাসের পাতা হতে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পাঠকদেরকে বুঝানোর জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি। আমাকে এসব ঘষামাজা করতে হয়েছে দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত। নির্ঘুম কেটেছে আমার বহু রাত। শরীরের যেমন হক্ব নষ্ট হয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রী-সন্তানও বঞ্চিত হয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার হতে। তারপরও পাঠকদের কাছে অনেক কিছু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে তাঁরা যদি বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে পড়েন তাহলে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন এবং লেখকের পুরো দর্শনও পরিষ্কার হয়ে যাবে, **ইন্ শা আল্লাহ্**।

এখানে একটি কথা পাঠকদেরকে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই। তা হলো আমি কাউকে আঘাত দিয়ে এখানে কোনো কথা বলিনি। অথবা কোনো এক পক্ষের হয়েও আমার কলম চলেনি। আমি কখনো এসব নিয়ে চিন্তাও করিনা। ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সভ্যতায় নারী সমাজের বাস্তব চিত্রগুলো যুগের ভাষায় তুলে ধরেছি মাত্র। অতএব আমার আলোচনা যদি নাটকীয়ভাবে কারো ব্যক্তিগত জীবনের সাথে মিলে যায় তাহলে হয়ত তার জীবনের গতিপথও পাল্টে যেতে পারে। নিজের আঙ্গিনায় বয়ে যেতে পারে সুবাতাস। সমাজের নারী-পুরুষ যদি এই বইটি একবার পড়ে নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর সাথে মিলিয়ে দেখেন তাহলে নারী সম্পর্কীয় বিষয়ে ইসলামকে অপবাদ দেয়ার কফিনে রীতিমত শেষ পেরেক ঠুকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মূলতঃ প্রাচীন সভ্যতা ও ইসলামে নারী বিষয়ে কাজ করা অনেক কঠিন। বিষয়টি অত্যন্ত বন্ধুর ও পিচ্ছিল, খুবই স্পর্শকাতর, উঁচুনিচু ও এবড়ো-থেবড়ো। তাই এই আঙ্গিনায় বিচরণকারীকে সুবিচারক বলা বড় কঠিন। তবে ইসলাম গত দেড় হাজার বছর হতে অথেন্টিসিটি ও নৈতিক ভিত্তি এবং শালীনতার অতিপরিচিত যে রোডম্যাপে মানব সমাজের জীবন তরীকে পরিচালিত করছে, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সকল অভিজ্ঞতা সেটিকে যুগোপযোগী ও নির্ভুল বলে আখ্যায়িত করছে। মুসলিম পরিবারের নারী জীবনে এমন পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই আমার এই সামান্য প্রয়াস। এই বই প্রকাশের পেছনে আমার অনেক আপনজনের ভূমিকা রয়েছে। অনেকে পরামর্শ দিয়ে আবার অনেকে আর্থিক সাপোর্ট দিয়ে কাজটিকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করেছেন।

আমার সকল কাজের পেছনে কারো না কারো হাত থাকে। কিছু লোককে আল্লাহ্ অন্যের সহযোগিতার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কাউকে সহযোগিতা নেয়ার জন্য দুন্ইয়াতে পাঠিয়েছেন। যারা সহযোগিতা নেয় আমি তাদের একজন। আর তাই আমি কোনো লেখা রেডি করে ছাপানোর পূর্বে বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মতামতের যেমন অপেক্ষা করি, তেমনিভাবে পুরো লেখার মাঝে কোনো অসঙ্গতিসহ প্রিন্টিং মিসটেকগুলো খুব সহজে খুঁজে পাওয়ার সুযোগও গ্রহণ করি। তারাও আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাকে সামনে চলার পথ দেখিয়ে দেন। এটিই আমার মূল সম্বল এবং লেখার জগতের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আমার প্রিয় সহকর্মী অধ্যাপক **মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা** বইটির প্রুফ রিডিং এর কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে আমার প্রতি অনেক বড় ইহ্সান করে পাঠকদের কাছে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

পরিশেষে পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখছি যে, আমার বইতে অনেকগুলো আরবী শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সেগুলোকে নিজেদের কথপোকথনে ব্যবহার করার জন্য পাঠকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বোল্ড করে তাদের দৃষ্টিতে আনারও চেষ্টা করেছি। এসব শব্দের বানানও আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লিখেছি। এটি আমার একটি মিশন এন্ড ভিশনও বটে। অতঃপর অভ্যাস অনুযায়ী আমি নিজের লেখাকে সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বার বার পড়েছি। পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ ভাষাগত ত্রুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি। তবুও ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক।

তাই বলতে পারি প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও বইটিতে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকেই গেলো। আগামী সংস্করণে তা সংশোধন করার ওয়াদা করছি। যেহেতু আমি এই ময়দানে কাজ করি, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলতে পারি এরপরও ভুল থেকে যাবে। পাঠকদের চোখে ধরা পড়া ভুল আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আগামী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে **ইন্ শা আল্লাহ**। সাথে সাথে বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞজনদের যে কোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ আমার এই শ্রমকে ক্বাবুল করে আখেরাতে নাজাতের ওয়াসীলাহ করুন, **আ-মী-ন**।

নাদভী

২৬ ডিসেম্বর ২০১৮

সভ্যতায় নারী ঃ একটি পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বে অনেকগুলো প্রাচীন এবং বড় বড় ধর্মসহ বহুল পরিচিত ও প্রচারিত প্রাচীন সভ্যতার পাশাপাশি কিছু আধুনিক সভ্যতাও জন্ম নিয়েছে। সে সব ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষাও রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নারী সম্পর্কে এক এক ধর্ম এক এক ধারণা পোষণ করে আসছে। অতঃপর ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত যে সব সভ্যতার জন্ম নিয়েছে সেখানেও নারী সম্পর্কে ভালো কোনো ধারণা ছিলো না। যুগের পরিবর্তনসহ জাতি-গোষ্ঠী ও সভ্যতার পালাক্রমে নারীর পরিচয় ও প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব সব সময় সকল সমাজ ধর্ম ও সভ্যতায় ছিলো বিকৃত। মা-বাবার ঘরে জন্ম নিয়ে এক সাথে থাকার পরও নারী ছিলো পরিবার বিহীন। জীবনের সকল বাঁকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিলো অপসৃত ও উৎপাটিত। তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই ছিলো উদাসীন। কোনো সমাজ ও আঙ্গিনায় তার উল্লেখযোগ্য কোনো মূল্যই ছিলো না। বিবেচনায় নেয়ার মতো তার অবস্থান কোনো যুগ, সমাজ ও সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

আসমানী কিতাব এবং নাবী-রাসূলদের যুগ ছাড়া বাকী সব যুগ, ধর্ম, বর্ণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ সব চিন্তা-চেতনায় নারীকে সর্বদাঃ

﴿رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾[১]

'ঘৃণ্য শায়ত্বানী কার্যকলাপ'

হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবে নারীর ভাগ্যে জুটেছে অত্যন্ত নির্দয়-নিষ্ঠুর আচরণ। সবার কাছ থেকে পেয়েছে যুল্‌ম-অত্যাচার, দুঃখ-দুর্ভাগ্য, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অপমান-অসম্মান, উৎপীড়িত-নিপীড়িত, অত্যাচারিত এবং নিগৃহীত জীবন। অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মনোবাসনা এবং বিকৃত ও ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মান্ধতা মানব সমাজে নারীকে এ সব রূপ ও জীবন দান করেছে। সর্বকালে নারীকে শুধু ভোগ্যপণ্য মনে করা হয়েছে। তার শরীর ভোগ করে পুরুষরা নিজেদের

১- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৯০

জৈবিক চাহিদাপূরণ করেছে বটে, তবে তাকে কখনো মানুষ মনে করেনি; বরং উল্টো তাকে শুধু নিজ স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার সবক শেখানো হয়েছে। এটির নাম কখনো দেয়া হয়েছে ধর্ম। আবার কখনো সভ্যতা।

মোটকথা, সব ধর্ম ও সভ্যতায় নারী যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও বঞ্চিত এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। এটিকে অতিরঞ্জিত বলারও কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। তাই এখানে ইসলাম পূর্ব কোনো যুগ ও সভ্যতায় নারীকে এমন কোনো অবস্থানে অধিষ্ঠিত দেখাতে পারছি না, যা দেখে ও জেনে পাঠক আনন্দিত হবেন। কারণ বিশ্বব্যাপী নারী সকল আঙ্গিনায় মানবাধিকার বঞ্চিত ছিলো। এমন সব অনিয়ম সকল ধর্মতত্ত্ব ও সভ্যতায় নিয়মে পরিণত হয়েছিলো। তবে আমি এখানে পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, কোনো ধর্ম ও সভ্যতার সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ কোনো ধর্ম ও গোষ্ঠীকে বদনাম করতে পারলে আমার কোনো লাভ আছে বলেও আমি মনে করি না। তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আমার গবেষণা কর্মটি পাঠকদের কাছে তুলে ধরে বিচারের ভার তাদের ওপরই ন্যস্ত করলাম।

এই লেখাটি তৈরী করতে গিয়ে আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, ইসলাম ছাড়া বাকী সব ধর্মের অনুসারীদের সমাজে ধর্মীয় ভাবধারায় যেসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম নিয়েছে সেখানেও নারীকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি প্রাণী হিসেবে দেখানো হয়েছে। নারীকে মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর একটি সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের রাস্তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বাইরে এলাকা ও অঞ্চল, জাতি-গোষ্ঠী ভেদেও নারী সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণায় রয়েছে বিস্তর ফার্ক্ব।

আজকের পশ্চিমারা সব সময় শুধু ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। যা তাদের রক্ত মাংসের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তাই একটি নারীকে বিয়ে করার পরও তারা একত্রে ঘর-সংসার করতে পারছে না। অতএব পশ্চিমা সভ্যতায় নারী পূর্বের মত নির্যাতনের শিকার না হলেও তারা এখনো সেখানে উপযুক্ত কোনো স্থান ও মর্যাদা খুঁজে পায়নি। কখনো পাবে বলে মনেও হচ্ছে না।

পশ্চিমাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় নারী সব সময় অপরাধী হলেও তারা নারীকে সর্বদা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তারপরও পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহল অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নারী স্বাধীনতার স্লোগানের আড়ালে বিশ্বের মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের আঙ্গিনায় নারী উন্নয়ন ও নারী প্রগতির কৃত্রিম জয়গান শুনিয়ে চলেছে। তাই তাদের মিথ্যা প্রচার ও প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে শুধু অমুসলিম নারীরাই নয়, মুসলিম নারীও ঘর-বাড়ি ছেড়ে ত্রিমোহনী এবং চৌমোহনীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো,বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্র একটি ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ও তার অনুসারীদের আঙ্গিনায় নারী অধিকার বঞ্চিত ও অবহেলিত বলে প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যে ইসলাম ও তার অনুসারীদের দিকে অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে সে ইসলামের নাবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর উম্মাতকে স্ত্রীর সাথে বিনম্র এবং মায়াবী ভঙ্গিতে কথা বলার তা'লীম দিয়েছেন। কারণ স্ত্রীর দিলটি খুবই নরম। স্ত্রীর সাথে মায়া-মমতার আচরণ করা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্। তাই মনে রাখবেন, স্ত্রীর কাছে নিজেকে সব সময় দুর্বল দেখাতে পারলে দেখবেন, আপনার চাওয়ার আগে সে আপনার হাতে তার কলিজা এনে দেবে। ইসলাম স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে নিজেকে বাহাদূর প্রমাণ করতে নিষেধ করেছে।

সত্যিকারের মুসলমান নিজের স্ত্রীর চোখ হতে কখনো অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দিতে পারে না। কারণ স্ত্রী কান্না করলে স্বামীর পকেটের বরকত চলে যায়। অতঃপর অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটার দাম অনেক বেশী পরিশোধ করতে হয়। পরিশেষে স্বামীকেই কাঁদতে হয়, স্ত্রীকে নয়। বিষয়টি মনে রাখতে পারলে স্ত্রীকে মনের মত করে পাবেন। এমন একটি সত্য ও বাস্তব কথা আমাদের নারী সমাজ যেমন বুঝতে পারছে না, তেমনিভাবে পুরুষরাও ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির প্রপাগান্ডার সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে। পরিণতিতে সবাই তাদের সাথে সূর মিলিয়ে বলে উঠছে হ্যাঁ ইসলামে নারী বঞ্চিত।

তাই প্রাচীন ধর্ম, সভ্যতা, সমাজ ও ইতিহাসে নারী সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা জানার অবশ্যই প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কারণ প্রাচীন ধর্ম

ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত না হলে পবিত্র ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ তাদেরকে কোন্ স্থান হতে উঠিয়ে এনে কোন্ পজিশনে পৌঁছে দিয়েছে তা বুঝতে অক্ষম হবো। ইসলাম ধর্মে নারীকে যে ইয্যাত ও সম্মান দেয়া হয়েছে এবং মুসলিম পরিবার ও সমাজে তাদের অধিকার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত তাও ইসলাম বিদ্বেষীদের মিথ্যা প্রচার ও প্রপাগান্ডার আড়ালে থেকে গেছে যুগ যুগ ধরে। এ প্রসঙ্গে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, নারী সম্পর্কীয় ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে আমাদের অনেকেই যখন তখন ইসলাম বিরোধীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠে হ্যাঁ, ইসলামে নারী বঞ্চিত ও নির্যাতিত। তাই বিশ্বধর্ম ও ধর্মতত্ত্বসহ সভ্যতার আলোকে নারী সম্পর্কীয় তুলনামূলক সঠিক তথ্য পাঠকদের জানা দরকার।

আমি এখানে পাঠকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই বইটি লিখতে গিয়ে আমি আগামী দিনে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হওয়ার বাস্তবতা খুঁজে পেয়েছি। এটি শুধু আমার দাবী নয়, অমুসলিমরাও এটি স্বীকার করে যাচ্ছেন। কারণ তাদের মতে মুসলমানরা নিজেদের এই অমূল্য সম্পদের মূল্যায়ন করতে না পারলেও বর্তমান বিশ্বের অমুসলিমরা ঠিকই এটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাই মার্কিন অভিনেত্রী নিন্ডসে লোহান ক্বোরআন নিয়ে গবেষণা করে নিজের ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ইসলাম একটি সুন্দর ও বাস্তব দ্বীন, এটি এমন একটি জিনিস যা আমি দীর্ঘ দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

উপরোক্ত আলোচনায় নারীর অবস্থান তুলে ধরার পর ইসলাম পূর্ব পৃথিবীর প্রচলিত সভ্যতায় নারীর অবস্থান কী ছিলো তাও পাঠকদের জানা থাকা দরকার। তাহলে নারী কোথায় ও কোন্ ধর্মে সম্মানিত এবং কোন্ ধর্মে অপমানিত, কোন্ আঙ্গিনায় লাঞ্ছিত কার আশ্রয়ে বঞ্চিত এবং কোথায় মানুষ হিসেবে শুধু প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং ষোলআনা তার অধিকার আদায় করাকে নিজের ঈমানী দায়িত্ব মনে করা হচ্ছে তা বুঝতে পারবে। তাই এখানে বর্তমান বিশ্বের প্রসিদ্ধ কিছু সভ্যতায় নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি কেউ স্বীকার করুক বা না করুক এটিই সত্য এটিই বাস্তব। নারী মানব সমাজের

একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মানব ইতিহাসে নারীর জীবন কেমন ছিলো? তারা কি মানুষ না অন্য কিছু? নারীর অধিকার সম্পর্কে জগদ্বাসীকে সর্ব প্রথম কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং কোন্ ধর্ম তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে তা আজ আমাদের অনেকেরই অজানা।

তাই সত্যিকারে যারা এ সব জানতে এবং বুঝতে চায়, কোন্ ধর্ম এবং কোন্ সভ্যতা নারী অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং নারীকে মানুষ হিসেবে বাঁচার পথ দেখিয়েছে তাদের জন্যই মূলতঃ আমার এই প্রয়াস। প্রাচীন সভ্যতা ও ইসলামে নারীর অবস্থান ও মান-মর্যাদা তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পরিষ্কার না হলে আমরা মনে করি পুরো বইটিই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তবে এখানে সংক্ষেপে যা বলা যায় তা হলো, ইসলাম পূর্ব কোনো সভ্যতায় নারী মানুষ হিসেবে বাঁচার সুযোগ পায়নি, নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলা তো দূর কী বাত।

ইতিহাসের পাতায় যে সব সভ্যতার অস্তিত্ব এখনো সংরক্ষিত, সেখানেও নারী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর এক চিত্র আঁকা রয়েছে। হাজার বছর পরও ইতিহাসের পাতা উল্টালে এখনো অধিকার বঞ্চিত নারীর আর্তনাদ শোনা যায়। নারীর ওপর নির্যাতনের ভয়ানক শোরগোলে এখনো অন্তর কেঁপে উঠে। ঐ সব প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আজো সাক্ষী হয়ে মানব সমাজের জন্য নারীর অবহেলা ও নিপীড়নের কাহিনী বুকে ধারণ করে আছে। সেখানকার **'আম ও খাছ'** শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সমাজ নারীকে কীভাবে মূল্যায়ন করতো এবং কোন্ দৃষ্টিতে দেখতো তাও পাঠককে জানান দিচ্ছে অত্যন্ত আমানাতের সাথে।

আমাদের দাবীর বাস্তবতা প্রমাণের জন্য নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি সভ্যতায় নারীর অবস্থান পাঠকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। নিরপেক্ষভাবে বইটি পড়লে যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন নারী অধিকার কোথায় প্রতিষ্ঠিত আর কোথায় অবহেলিত। কোন্ আঙ্গিনায় নারী সম্মানিত আর কোন্ আঙ্গিনায় অপমানিত।

গ্রিক সভ্যতায় নারী

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেসব সভ্যতার অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সভ্যতা রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা বা Greek Civilization কয়েক হাজার বছরের পুরাতন একটি সভ্যতা। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হতে শুরু হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সভ্যতা। সেই সভ্যতা পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠীর কাছে আজও অতি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ অতুলনীয় একটি সভ্যতা বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই লেখক ও গবেষকরা নিজেদের লেখাকে পাঠকদের কাছে গ্রহণ যোগ্য এবং মূল্যবান করে তোলার জন্য এখনো উক্ত সভ্যতার উদাহরণ টেনে আনার প্রয়োজন মনে করেন।

তবে আমরা যখন দেখতে পাই সেই গ্রিক সভ্যতার প্রাথমিক যুগে নারী আইন-কানূন, পারিবারিক-সামাজিক এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে অধিকার বঞ্চিত ছিলো, তখন খুবই ব্যথিত হই। নারীর স্বাধীনতা বলতে সেই সভ্যতায়ও কিছু ছিলো না। নারীর জন্য এটি প্রয়োজনও মনে করা হয়নি। গ্রিক সভ্যতায় নারীদেরকে এমন কিছু কুঠরিতে রাখা হতো যেখানে আলো বাতাসের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। পথ-ঘাট এবং লোকালয় হতে বহু দূরে অবস্থান হওয়ায় নারীদের সাথে যোগাযোগ করাও দুষ্কর হতো। মূলতঃ এটি নারী নির্যাতন এবং নারী অবজ্ঞারই একটি বিকল্প ব্যবস্থা।

নারীর প্রতি অবিচারের বর্ণনা এখানেই শেষ নয়, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় বাবা পরিবারের দায়িত্বশীল হতেন। তাই তিনি ইচ্ছে করলে নিজ মেয়েকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিতে পারতেন। বাবার অবর্তমানে ভাইও তার বোনকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার রাখতো। বাবার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র ছেলেরা সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা কখনো বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওয়ারিস হতে পারতো না। তদানীন্তন সমাজের সকল শ্রেণীর মাঝে মেয়েদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। আপন বাবা ও ভাইয়ের ইচ্ছে হলে যখন তখন হাটে-বাজরে বিক্রি করা যেতো। মোটকথা, সামাজিকভাবে নারীর কোনো অধিকারই ছিলো না। জন্ম হতে

সমাজ ও পরিবারে এসব অত্যাচার সহ্য করার কারণে তারা নিজেরাও নিজেদের কোনো অধিকার সম্পর্কে ভাবতে পারতো না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রাচ্যের বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল (Aristotle 322 -384) ও নারী স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে নারীর প্রতি ঠিকই তার আকর্ষণ ছিলো। তাই নারীর সান্নিধ্যে গিয়ে শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য নিজের বিয়েটি কিন্তু ঠিকই সতের বছর বয়সে করে ফেলেছিলেন। তিনি নয়শ খ্রিস্টপূর্ব Sparta (9^{th} -192^{nd} BC) গ্রিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ জাতির নারী অধিকার নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন মানব সমাজকে শহর কেন্দ্রিক প্রশাসনের আলো সর্ব প্রথম তারাই দেখিয়েছিলো। উপ শহরের দর্শন সর্ব প্রথম তারাই দুন্ইয়াবাসীর সামনে শুধু পেশ করেনি; বরং তারা এটিকে নিজেদের অঞ্চলে স্থাপন করে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েও ছিলো। এসুবাদে তারা নারীকে স্বাধীনতার কিছুটা আলো দেখিয়ে যুল্ম নির্যাতন হতে মুক্তির পথ বাতলে ছিলো। তবে তারাও পুরোপুরি মুক্তি দিতে পারেনি।

নারীকে দেখানো তাদের স্বাধীনতার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ যোগ্য বিষয় হলো, সেই সমাজেই নারী নিজ স্বামীকে ত্বালাক্ব দেয়ার অধিকার পেয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার সুযোগও পেয়েছিলো। এই সিঁড়ি বেয়ে নারীকে মানব সমাজে উঁচু হয়ে দাঁড়ানোর সাহস যুগিয়েছিলো স্পার্ট্রা নামক সেই জাতি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এরিষ্টটল সেই জাতির পতনের মূল কারণ হিসেবে নারীকে দেয়া স্বাধীনতাকেই চিহ্নিত করেছেন।' [২]

গ্রিক সভ্যতার প্রায় সব দার্শনিকই নারীকে কখনো মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও দর্শনের অপব্যবহার করে সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯) বলেছেন:
'নারীর চেয়ে বেশী ফিত্না সৃষ্টিকারী দুন্ইয়াতে আর কেউ নেই। তিনি নারীকে এমন সুন্দর একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন, যেই বৃক্ষটির ফল

২- المرأة في القرآن، ص: ٧٣-٧٤ (আল্ মারআতু ফিল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা নং-৭৩,৭৪)

একটি পাখি খাওয়ার সাথে সাথে মরে যায়। তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন, আমি যখনই যে বিষয়ে চিন্তা করেছি তখনই তার গভীরতাকে খুব সহজে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি নারীর স্বভাবকে সঠিক ভাবে পুরাপুরি বুঝতে পারিনি। নারী মানব সমাজে ফিত্না সৃষ্টি করার কতো বেশী শক্তি সামর্থ্য রাখে তা আমি এখনো জানতে পারলাম না। তাই আমি মনে করি, দুন্ইয়াতে যদি নারী সৃষ্টি না হতো, তাহলে দুন্ইয়া শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্গে পরিণত হতো। তিনি নারীদের যাদু ও তাদের ফিত্না হতে দূরে থাকার জন্য তার শিষ্যদেরকে সতর্ক করেছেন। এমন কি নারীর আবেগ ও অনুভূতিকে কখনো মূল্যায়ন না করার জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন। তা না হলে নারী তার ধোকাবাজিতে সফল হয়ে যাবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।'[৩]

Encyclopedia Britannica তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় নারীদের স্থান ও মান মর্যাদা এতো বেশী নীচে ছিলো যে, তাদেরকে শুধুমাত্র বাচ্চা পালনকারী ক্রীতদাসী ও বাঁদীর মতো মনে করা হতো। তাই নারীদেরকে সব সময় ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হতো। তারা শিক্ষা হতে বঞ্চিত ছিলো। স্বামী তাদেরকে ঘরের জিনিস পত্রের মতো নিজের ইচ্ছে মাফিক ব্যবহার করতো।'[৪]

এটিই হলো গ্রিক সভ্যতায় নারী জীবনের চিত্র। তারপরও তারা সাধু। কবির ভাষায় বলতে হয়:

'আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিলো মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।'

অতএব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজকের মুসলিম উম্মাহ্র অনেকের কাছে তারাই আজ জগতের মহা পন্ডিত। তাই নারীর বর্তমান অবস্থা বুঝতে হলে উক্ত সভ্যতাসহ প্রাচীন সভ্যতায় নারীর পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থান ভুলে গেলে চলবে না।

৩- মুসলমান মিঞা বিবি কে হকুক ও ফারায়েয, (উর্দু) পৃষ্ঠা নং- ৫-৬।
4- Encyclopedia Britannica, Vol. 1. P-48, 1983

রোমান সভ্যতায় নারী

প্রচীন সভ্যতায় নারীকে অর্বাচীন মনে করার কারণে তাদের যে দুরবস্থা ও দুর্দশা ছিলো Roman civilization বা রোমান সভ্যতায়ও তাদের সেই ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। উল্লেখ্য যে, রোমান সভ্যতা ২৭ খ্রিস্টপূর্ব হতে শুরু হয়ে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ দীর্ঘ দেড় হাজার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এখানেও নারী পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার হতে বঞ্চিত ছিলো। পারিবারিক কোনো বিষয়ে তাকে কখনো উপযুক্ত মনে করা হতো না। বাইরের কোনো সমস্যা সমাধানেও তার সাথে পরামর্শের প্রয়োজন মনে করতো না। এমন কি পারিবারিক ও সামাজিক কোনো বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হতো না। নারীকে মানুষের বাইরে ভিন্ন ধরনের এক প্রকার প্রাণী মনে করা হতো। পুরুষরা তাদেরকে জানোয়ার মনে করতো শুধু তাই নয়; বরং জানোয়ারের মত তাদের সাথে ব্যবহারও করা হতো। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, সকল যুল্‌ম অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে রোমানরা নারীর মুখে এক ধরনের তালাও লাগিয়ে রাখতো। যেন তারা কখনো এসব যুল্‌ম অত্যাচারের বাদ প্রতিবাদ করতে না পারে।[৫]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পাতা উল্টালে নারীকে সেই অবস্থায়ই দেখতে পাই, যে অবস্থায় তারা অন্যান্য সভ্যতায় ছিলো। এখানেও তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই অন্য সভ্যতার নারীদের চেয়ে রোমান সভ্যতায় ভালো ছিলো তা বলা যাবে না। এখানেও তাদের প্রতি অশুভ লক্ষণ এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো। রোমান নারীদের সাথে আচরণের এটিই ছিলো ভিত্তি ও নিয়ম। সত্যি বলতে কি, এটি এমন একটি অযৌক্তিক দাবী যা মানব সমাজে নারীকে মনুষ্যত্ব, ইয্‌যাত ও মানবাধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। তারা সমাজের সর্বত্র অপমান ও অসম্মানের পাত্রে পরিণত ছিলো। তাই তারা সব সময় নারী হতে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াতো।

৫- তারিখে আখলাকে ইউরোপ, (উর্দু) পৃষ্ঠা নং-৪১৫

অন্যদিকে নারীরা সারাক্ষণ গৃহে বন্দী জীবন কাটাতো। সমাজ সম্পর্কে কিছুই তারা জানতে পারতো না। কারণ তাদের জীবন ছিলো মানব সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন একটি জীবন। বাবা স্বামী ও সন্তান ছাড়া তারা আর কাউকে চেনতো না। এটিই ছিলো নারীদের সাথে রোমান সভ্যতার আচরণের নিদর্শন। তারা মনে করতো নারীর বন্দীত্ব কখনো অপসারণ করা যাবে না। তাদের কাঁধের জোয়াল কখনো খোলা যাবে না। এ সব কুসংস্কারের জালে বন্দী ছিলো নারী জীবন। এসম্পর্কে রোমান ভাষায় প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ ছিলো:

`Nunguam Exivtur servitms nuliedris`[6]

'শ্রম নেব, মজুরী দেবো না।'

রোমান সভ্যতায় পরিবারের অভিভাবক হলেন বাবা। বাবার মৃত্যুর পর ছেলে। এভাবে নারীকে সব সময় গৃহে বন্দী থাকতে হতো। বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী মা-বাবার পরিবার হতে স্বামীর পরিবারে স্থানান্তর হওয়ার সাথে সাথে আসল পরিচয় হারিয়ে ফেলতো। কারণ মূল পরিবার তখন তাকে মৃত ভাবতো। নারী তার স্বামীর পরিবারের একজন মেয়ে হিসেবেই প্রবেশ করতো। তার আসল পরিচয় ছিন্ন হয়ে যেতো। সে তার মূল ধর্ম ও ক্রিয়া-কলাপ হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। আর তাই সে তার জন্ম সূত্রে নিজ পরিবারের যেমন পরিচয় দিতে পারতো না তেমনি সেখানকার কোনো কিছুর দাবীও করতে পারতো না।

স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ পাবে তার সন্তানদের বোন হওয়ার কারণে। **অর্থাৎ যে সন্তানদেরকে সে নিজ গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিয়েছে, স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ দেয়ার সময় সেই সন্তানদের বোন হিসেবে দেয়া হতো!** এবার একটু ভেবে দেখুন নারীর সাথে নিকৃষ্টতম আচরণ আর কী হতে পারে? এখানেই শেষ নয়, স্বামী ইচ্ছে করলে তাকে বিক্রিও করে দিতে পারতো। অনুরূপভাবে স্বামী তাকে ত্বালাক্ব যেমন দিতে পারতো তেমন তাকে যখন তখন শাস্তিও দিতে পারতো।[৭]

৬- المرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، ص: ٤٩ (আল্ মারআতু ফিল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা-৪৯)

৭- الزواج والطلاق في جميع الأديان: الشيخ/ عبد الله المراغي، ص: ٦١٦

রোমক নারীকে মহা বিপদের ক্রীড়নক ভাবা হতো। গ্রিক সভ্যতায় নারীর অবস্থান যেমন ছিলো রোম সভ্যতায়ও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। বরং এখানে আরো জঘণ্য ছিলো। চরম নির্যাতনের শিকার ছিলো নারী। কারণ পূর্বের রোমকরা নারীদের সম্পর্কে ধারণা পোষণ করতো যে, নারী হলো সমাজের ক্রীড়নক এবং প্রতারণার মাধ্যম। পুরুষদের অন্তর বিনষ্টকারী। তাই শায়ত্বান নারীকে তার শায়ত্বানী কাজে ব্যবহার করে। এই কারণেই তদানীন্তন সমাজে নারীদেরকে পুরুষদের কাছে অপদস্থ হতে হতো এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট ভাবা হতো। তাদের ওপর নির্যাতনের এমন কিছু পন্থা অবলম্বন করা হতো যা শুনে মানব অন্তর প্রকম্পিত হয় এবং মানব বিবেক আন্দোলিত হয়। এটি কারো বানানো গল্প নয়। এটি নতুন ও পুরাতন ইতিহাসে রেকর্ড রয়েছে। নারী সম্পর্কীয় বিষয়ে রোমে অনুষ্ঠিত রোমান ইতিহাসের বিখ্যাত কনফারেন্স এর কার্যবিবরণীতেও নির্যাতনের ঐ সব বর্ণনা পুংখানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত কনফারেন্সে যে সব প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে তা হলো :

১. নারীর মধ্যে মানব রুহ বলতে কিছু নেই। তাই নারী আখেরাতের জীবন পাবে না।
২. নারী কখনো গোস্ত খেতে পারবে না। হাসতে পারবে না। এমন কি কথাও বলতে পারবে না।
৩. নারী হলো 'ঘৃণ্য শায়ত্বানী কার্যকলাপ'। তাই সমাজে অপমান অপদস্থ হওয়া তার প্রাপ্য।
৪. নারীকে বাঁচতে হলে তার পুরো জীবন মূর্তিপূজা এবং স্বামীর আনুগত্য করে কাটাতে হবে।

উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীর মুখে লৌহ নির্মিত এক প্রকারের তালা লাগিয়ে রাখা হতো। এমন কি নারী বদ্ধ ঘরে অবস্থান করার পরও তার মুখে তালা লাগিয়ে রাখা হতো। রাস্তায় বের হলে এবং চলার পথেও লৌহ নির্মিত মুখোশটি তার মুখে লাগিয়ে রাখা হতো। তাদের পরিভাষায় সেটিকে (موزلير) বলা হতো।[৮]

৮- المرأة وحقوقها في الإسلام: لمبشر الطرازي، ص:٩-١٠
(আল্ মারআতু ওয়া হুকুকুহা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং-৯-১০)

রোমান সভ্যতায় নারীকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হতো। নারীকে অতি তুচ্ছ এবং একটি সস্তা জিনিস হিসেবে গণ্য করা হতো। তাই যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পুরুষ নারীকে ব্যবহার করতো। নারীর সাথে তাদের নিকৃষ্ট আচরণ এখানেই শেষ নয়, তদানীন্তন রোমান শিক্ষা-বিষয়ক বোর্ডের কেউ কেউ নারীর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে এমনও নীতিমালা তৈরী করেছিলো যে, নারী অর্ধ আউন্স স্বর্ণের বেশী এবং রঙ বে-রঙের বা চাকচিক্য ও আকর্ষণীয় কোনো পোশাক পরিধান করতে পারবে না। সাধারণ বাহন ছাড়া নারী একা একা কোনো যান বাহনে এক মাইলের বেশী চড়তে পারবে না। [৯]

রোমান সভ্যতায় বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিলো। তবে রাজা-বাদশারা ইচ্ছে মতো বহু বিবাহ করতো। কিন্তু সম্রাট Valentinian II (371-392 AD) সাধারণ পুরুষদেরকেও বহু বিয়ে করার অনুমতি দিলেওতবে সেখানে কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেনি। তাই যার যে কয়টি বিয়ে করার ইচ্ছে হতো সেই কয়টি বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, উচ্চপদস্থ খ্রিস্টান যাজক অথবা গির্জার কেউ এর বিরুদ্ধে তখন কোনো বাদ-প্রতিবাদ করেছে বলে রোমান ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।[১০]

রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীকে বিষাক্ত এক বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হতো। রাষ্ট্রীয় এমন নীতি সর্বত্র এবং সকল শ্রেণীর মাঝে বিরাজমান ছিলো। সম্রাট Constantine (272-337 AD) এর যুগে এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করে বহু বিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই আইনটি হালে পানি পায়নি। সংখ্যা গরিষ্ঠরা এটিকে গ্রহণ করেনি। তাই খুশী মতো তারা যত ইচ্ছে তত বিয়ে করে ফেলতো। সত্য কথা হলো, কোনো সভ্যতায়ই নারী হয়ে বেঁচে থাকা সহজ ছিলো না। ইসলাম ছাড়া কোনো যুগই তাদেরকে মেনে নেয় নি। নারী নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। নিজে নিজের পছন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। এমন কি নারী নিজেকে

---

[৯] - حق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها: طه عبد الله عفيفي ص: ١٢،١٣
'হাক্কুয যাওজে 'আলা যাওজাতিহী ওয়া হাক্কুয যাওজাতে 'আলা যাওজিহা' পৃষ্ঠা নং-১২,১৩

[১০] - المرأة وحقوقها في الإسلام: لمبشر الطرازي، ص: ١٠
(আল্ মারআতু ওয়া হুকুকুহা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং-৯-১০)

নিরপরাধও প্রমাণ করতে পারে না। তাই তারা সব কিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়। অতএব আমরা বলতে পারি, যেদিন মেয়ের জন্মের আনন্দে মিষ্টি বিতরণ হবে সে দিনই নারী সম্পর্কে মানব সমাজে নারী সম্পর্কীয় সকল কু-ধারণা ও কুসংস্কারের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কারণ নারী হলেন **'মা'**। আর **'মা'** এমন এক জিনিস যার দো'য়ায় আসমান হতে রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

রোমানদের আক্বীদাহ বিশ্বাস ছিলো মানব শরীর কখনো অপবিত্র থাকতে পারবে না। এরপরও কিন্তু নারীকে সব সময় অপবিত্র মনে করা হতো। তাদেরকে অপরাধী বলে অভিশাপ দেয়া হতো। তাই নারী হতে দূরত্ব বজায় রাখাকে ভালো এবং উত্তম কাজ বলে মনে করা হতো। তবে পরিবারে বাবার সকল কর্তৃত্ব নেতৃত্ব চলতো। পরিবারে বাবার অবস্থান গির্জার পোপের মতো ছিলো। পরিবারের সবার কর্তা ছিলেন তিনি। তাই তার আনুগত্য করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো। নারী বিয়ে করার পর অবশ্যই তাকে স্বামীর ধর্মে প্রবেশ করতে হতো। নারীর কর্তৃত্ব বিয়ের সাথে সাথে স্থানান্তর হয়ে যেতো। স্বামী তার স্ত্রীর কর্তা হয়ে যেতো। এছাড়াও রোমানরা কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করতো। তাই তারা সব সময় পুত্র সন্তান কামনা করতো। তবে সত্য কথা হলো, কন্যা সন্তান আল্লাহর দেয়া এমন একটি ফুল, যে ফুল সব বাগানে ফুটে না।

রোমান সভ্যতায় ধন-সম্পদে নারীর কোনো কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব চলতো না। নারী যত অর্থই উপার্জন করুন না কেন, সেই অর্থ পরিবারের অর্থ বলেই গণ্য হতো। এখানে তার বয়স এবং বিয়ে হওয়ার কোনো মূল্য ছিলো না। তবে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আইন জারি করে মায়ের পক্ষ হতে পাওয়া সম্পদ এবং বাবার দিক থেকে পাওয়া সম্পদের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছিলো। এই সম্পদ তার খুশী মতো সে খরচ করতে পারতো। পরিবারের কর্তৃত্ব হতে মুক্তি পেতে হলে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ বাবা রেখে দিতো।

রোমান সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের যুগে নারীর অর্জিত সম্পদ সম্পর্কীয় আইন তৈরী করে বলা হলো, নারীর নিজের কর্মের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ তার নিজের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে নিজ

পরিবারের পক্ষ হতে পাওয়া সম্পদ নিজের সম্পদের মত সে কখনো ব্যবহার করতে পারবে না। উক্ত সম্পদ যার কাছ থেকে পেয়েছে, সে যদি তাকে ব্যবহারের স্বাধীনতা দেয় তাহলে নিজের ইচ্ছে মতো এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। এর বিপরীত হলে **রাব্বুল উস্‌রাহ** বা পরিবারের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। আর যদি সে মারা যায় এবং তার সন্তান যদি বালেগ থাকে তাহলে তার অনুমতি নিতে হবে। যুবতী নারীর অভিভাবকত্ব সে যতদিন জীবিত থাকবে অসিয়ত অনুযায়ী চলতে থাকবে।

পরিশেষে অভিভাবকের আইনটিকে সংশোধন করে নারী নিজের পছন্দ মত অভিভাবকের কাছে চলে যাওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এখানে নারীকে কিছুটা স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। তবে তার বয়স ও মানসিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রাচীন আইন বিশারদগণ নারীকে পাথর নিক্ষেপ করার আইনটিকে **'তাদের বিবেককে জাগ্রত রাখার জন্য'** বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মোটকথা, রোম সভ্যতার ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনি দেখতে পাবেন, সেখানে নারীর অবস্থা সাগরের জোয়ার ভাটার মতো ছিলো। কখনো একই অবস্থা বিরাজ করতো না। তবে অধিকাংশ সময় নারী অধিকার বঞ্চিত ছিলো।

অন্যদিকে রোমের পুরো ইতিহাসে নারী তার স্বামীর হাতের খেলনায় পরিণত ছিলো। স্বামী যখন খুশী তখন তাকে ইচ্ছে মত ব্যবহার করতো। এমনকি রোমান সভ্যতার উত্থানের সময়ও নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু মনে করা হতো। কোনো কোনো অঙ্গরাজ্য রাষ্ট্রের পুরো বিষয়গুলোর মত নারীদের বিষয়গুলোকেও নিজেদের মত করে সাজাতে থাকে। শেষকথা হলো, রোমান সভ্যতায়ও নারী নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার ছিলো। এমন কি নিষ্ঠুরতার সীমা ছাড়িয়ে স্বামী ইচ্ছে করলে নিজ স্ত্রীকে হত্যাও করতে পারতো। রোমান বিপ্লব সাধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উল্লেখিত নির্যাতন ও নিষেধাজ্ঞা হতে নারী মুক্তি পায়নি।

পারস্য সভ্যতায় নারী

প্রাচীন যুগে অর্থাৎ ইসলামের আগমনের পূর্বে ইরান সাম্রাজ্যকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য মনে করা হতো। তাদের বিশেষ এক সভ্যতা ছিলো এবং উক্ত সভ্যতাকে ঐতিহাসিকগণ একটি মূল্যবান সভ্যতা মনে করেন। পারস্যসভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছর যাবত চলে আসছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই সভ্যতায়ও নারীর কোনো ইয্যাত সম্মান ছিলো না। নারী সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ কোনো ধারণা ছিলো না। তারাও নারীকে বাঁদী মনে করতো এবং তাদের সাথে বাঁদী ও দাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করতো। বিয়ে-শাদী করার জন্য নারীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতো না। যখন যাকে ইচ্ছে তখন তাকেই বিয়ে করে ফেলতো।

আল্লামা শাহ্‌রাস্তানী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "كِتَابُ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ" এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'সম্রাট মযদক তার রাজ্যের সকল নারীকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। আগুন-পানি, খাদ্য-বস্ত্র ব্যবহার যেমন সবার জন্য বৈধ ছিলো তেমনি নারীও সবার জন্য জন্য হালাল ছিলো। যে যাকে যেখানে পেতো এবং পারতো তাকেই বিয়ে করে ফেলতো।' [১১]

নারীকে মানব অধিকার হতে বঞ্চিত করা হতো। জীব-জন্তুর মত তাদের সাথে আচরণ করা হতো। এখানেই শেষ নয়, কিছু মানুষের ধারণা ছিলো, পরিবার ও সমাজে নারীর অস্তিত্ব তাদের লজ্জা শরমের বিষয়। তাদের এমনও ধারণা ছিলো, আল্লাহ্ নারীকে সৃষ্টি করে তাঁর অন্য সৃষ্টির ওপর অনেক বড় অত্যাচার করেছেন। পারস্য সভ্যতায় সমকামিতাকে স্বাভাবিক একটি বিষয় মনে করা হতো। এই সমকামিতার রোগে আক্রান্ত ছিলো তদানীন্তন পুরো সমাজ। যার কারণে পুরুষদের মাঝে নারীর প্রতি আগ্রহ কম ছিলো। তারা নারীকে বিয়ে করে জৈব চাহিদা পূরণের কোনো প্রয়োজনও মনে করতো না। এসব কারণেও তাদের সমাজে নারীকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট মনে করা হতো।' [১২]

---

[১১] – كتاب الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ص:٨٦

১২- মুহসিনে ইনসানিয়াত আউর ইনসানী হকুক, (উর্দু) পৃষ্ঠা নং- ৩১৬।

ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী

ইউরোপীয় সভ্যতাও প্রাচীন সভ্যতা সমুহের অন্যতম। ঐতিহাসিকদের মতে এটি প্রায় তের হাজার বছরের পুরোনো একটি সভ্যতা। উক্ত সভ্যতার প্রভাব এতো বেশী ছিলো যে, আধুনিক যুগেও বর্তমান বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের একটি হলো ইউরোপ। এছাড়াও বহুদিন হতে তারা নিজেদেরকে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা বলে দাবীও করে আসছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনি তাদের প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাবেন, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আজকের ইউরোপ গভীর এক অন্ধকারে নিমর্জিত ছিলো। যাকে অজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু বললে অতিরঞ্জিত হবে না বলে আমরা মনে করি। সেই সমাজে নারীর না ছিলো কোনো ইয্যাত, না ছিলো কোনো সম্মান।

আরো একটু আগ বাড়িয়ে উক্ত সভ্যতায় চরম নিষ্ঠুরতার শিকার ছিলো নারী। দুর্বল এবং কুশ্রী নারীকে প্রাণেও মেরে ফেলা হতো। যাদেরকে বাঁচার সুযোগ দেয়া হতো তাদের সাথে নিজ পরিবারের লোকরাই দাসী ও বাঁদীর মত আচরণ করতো। নারীর অবস্থানকে তারা নিজেদের জন্য বেঢপ বা কুৎসিত একটি দাগ মনে করতো। তাই নারীর অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারতো না। স্বামী ও অভিভাবক এবং পোপের গোলামী করাই ছিলো নারীর মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। খ্রিস্টান ধর্মের বড় বড় পাদ্রীরাও মনে করতো নারীর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরিণতিতেই যীশুকে শূলে চড়তে হয়েছে। তাই নারীকে তারা সব সময় প্রচন্ড ঘৃণা এবং অপমান করতো। ঐতিহাসিকভাবে উক্ত সভ্যতার দার্শনিকরা যুগে যুগে তাদের শিষ্যদেরকে এমনই শিক্ষা দিয়েছে।

তাই আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক Thomas Harding বলেছেন: 'নারী হলো ভয়ানক বিষধর এক অজগর সাপের মত। যার মোকাবেলা করা সহজ নয়। বছরের পর বছরও যদি আমরা চিন্তা করি, তারপরও নারীর ধূর্ততা ও প্রতারণা বুঝতে পারবো না। তাই আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, নারী হলো একটি শায়ত্বানী

যাদু। যার হাত হতে বাঁচা অনেক কঠিন। নারী দেখতে সুন্দর একটি ফুলের মত হলেও তার পুরো গায়ে শুধু কাঁটা আর কাঁটা।'[১৩]

একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ইউরোপে ফ্যামিলি সিস্টেম সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা নেই। অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফির মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই নিজে কামাচ্ছে আর নিজেই খাচ্ছে। যৌন চাহিদা পূরণের জন্য বিয়ে করা প্রয়োজন মনে করে না। বরং জানোয়ারের মত নারী-পুরুষ নিজেদের যৌন চাহিদা পূরণ করছে। রক্তের সম্পর্ক নড়বড়ে। সেখানে যেসব সংস্থা নারীকে স্বাধীনতা দেয়ার নামে আজ বিবস্ত্র করে ছেড়েছে সেই সব সংস্থা ফ্যামিলি সিস্টেম চালু করতে চাচ্ছে। কারণ সেখানে এখন নারীর কোনো মূল্য নেই। নারী একটি টিস্যু পেপার মাত্র।

কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলতে পারবে না 'তুমি ঘরে থেকো, আমি সব কিছুই তোমার কাছে এনে হাযির করছি'। কোনো সন্তান নেই যে তার মাকে বলবে, 'মা তুমি ঘরের বাইরে যেয়ো না, আমি তোমার সব কাজ করে দেবো'। কোনো মেয়ে নেই যে নিজের মাকে বলবে 'মা তুমি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছো এখন বিশ্রাম করো। আমি সব কাজ করে ফেলবো'। সেখানে নারী ঘরের কাজও করে আবার অফিসের ধাক্কাও তাকে সইতে হয়। কাল পর্যন্ত যারা নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়েছিলো তারাই আজ কারো আশ্রয়ে একটু প্রশান্তি খুঁজে মরছে। কোনো পুরুষ তাকে আপন করে নিতে রাজি নয়। তার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নয়। শুধু টিস্যু পেপারের মত ব্যবহার করে ফেলে দিতে চায়।

পরিশেষে কেউ কাউকে আর চেনে না। তেমনই এক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী একবার গল্প করছে। স্ত্রী তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো আমার সাথে দীর্ঘ দশ বছর কাটাতে তোমার কেমন লাগলো? স্বামী উত্তরে বললো দুই সেকেন্ডের মত লাগছে। অতঃপর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো আমার জন্য যে তুমি এক লাখ টাকা খরচ করেছো সেটি তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? স্বামী বললো এক পয়সার মত মনে হচ্ছে। স্ত্রী এবার বললো আমাকে একটি পয়সা দাও। স্বামী বললো দুই সেকেন্ড অপেক্ষা কর। কী বুঝলেন?

---

[13]- A History of the World (উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা নং-২২১)

একবার এক স্ত্রী তার স্বামীকে খুব আদর করে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বলো তো আমি যখন গান করি তখন তুমি জানালা দিয়ে বাইরে কেন তাকিয়ে থাকো? স্বামী খুব ধীরস্থিরে উত্তর দিয়ে বললো, যাতে করে মহল্লার মানুষরা এটি মনে না করে বসে যে, আমি তোমার টুটি চেপে ধরেছি।

তেমনই এক স্ত্রী একবার তার স্বামীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো তুমি কোথায়? স্বামী উত্তরে বললো, রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাইক হতে পড়ে গিয়েছি। মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। পা ভেঙ্গে গিয়েছে। স্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো আচ্ছা যা হোক, লাঞ্চবক্সটি সোজা রেখো। তা না হলে তরকারী ও ঝোল পড়ে যাবে। আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি সেটি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। এভাবেই চলছে ইউরোপের পারিবারিক জীবন। আর আমরা মনে করে বসে আছি তারা স্বর্গীয় জীবন উপভোগ করছে।

হে মুসলিম নারী! মনে রেখো, তুমি কোনো রাজরাণীর চেয়ে কম নও। বাবার ছায়ায় বড় হয়েছো। ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকছো। স্বামী তোমার জীবন সাথী। সন্তান বৃদ্ধকালে তোমার সাহায্যকারী। স্বামীর ঘরে থেকে পাতিল ঘষে আর রুটি বেলে তুমি নিজেকে কাজের বুয়া মনে করো? না, কখনো না। এমন কথা কখনো ভেবো না। এটি তোমার ভুল ধারণা। এই রুটি গোস্ত চাল তরকারী তোমার স্বামী এনে তোমার হাতে তুলে দিয়েছে। তুমি কি জান? কীভাবে সে এ সবের ব্যবস্থা করেছে।

শোনো, তোমার স্বামী শুধু তোমার জন্য নিজেকে রোদে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করেছে। সূর্যের প্রচন্ড তাপের সাথে যুদ্ধ করে সে তোমার ইয্যাত রক্ষা করে চলেছে। তুমি কি জান? শুধু তোমার জন্য একটি টাকা রুজি করতে গিয়ে তোমার স্বামী কত জনের গোলামী করেছে? কত বসের চোখ রাঙ্গানোকে সহ্য করেছে? কত অফিসারের বকা শুনেছে? কত ভাবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়েছে? তাই মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু দূরত্ব খুবই কম। তবে এটি অতিক্রম করতে জীবন শেষ হয়ে যায়। মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তার ওভার টাইমের অফার লেটারটি পায়নি। পেলেও বসের মর্জি মত পেয়েছে। তাই পশ্চিমা নারীদের দেখে তোমাকে শিক্ষা নিতে হবে। তাদের পরিণতি দেখে তোমাকে

আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কিন্তু তারপরও তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছো না। স্বাধীনতার নামে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে চাও। ঘর হতে বের হওয়ার আশা ছেড়ে দাও। কারণ সর্বত্র তোমাকে পাওয়ার ও ভোগের পরিকল্পনা চলছে। তারপরও তুমি স্বামীর ঘরে তার হৃদয়ের রাণী হওয়ার পরিবর্তে অফিসের চাকরানী হয়ে পর পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকতে চাও? যদি তাই হয়, তা হলে তোমার বিবেকের ওপর হাজার আফ্‌সোস।

শিক্ষার নামে ইউরোপ যেতে চাও? যাও কে তোমাকে বাধা দেবে? তবে তোমাকে বুঝতে হবে, যে নারীর পিএইচডি ডিগ্রী আছে কিন্তু নারীত্ব ও লজ্জা শরম নেই সেই নারীর চেয়ে অশিক্ষিত, পর্দানিশীন এবং লজ্জাশীল নারী হাজারগুণ উত্তম। কারণ যে পরিবারের মেয়েরা পর্দায় চলাফেরা করে তাদের বাপ-ভাইয়েরা রাস্তায় মাথা উঁচু করে হাঁটে। আর যে পরিবারের নারী পুরুষের পেছনে হাঁটতে অভ্যস্ত, বিশ্বাস কর আর নাই কর, সেই নারী জীবন চলার পথে পুরুষের চেয়ে চার কদম এগিয়ে থাকে। এমন পরিবেশেই গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি ওঠার আগেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কথা মনে হতেই পুরুষের দৃষ্টি নীচু হয়ে যায়। আর এর নামই ভালোবাসা। এমন পুরুষের বাহুতেই নারীর স্বর্গীয় সুখ লুকায়িত রয়েছে।

মনে রাখতে হবে, ভালোবাসা সব সময়ে প্রথম হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমনই এক ভালোবাসা হয়ে থাকে। অতএব কেউ যদি বলে এখন দ্বিতীয় বার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে প্রথম বার তাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টিই হয়নি। স্বামীর ভালোবাসার ডায়েরীতে যখন একবার কারো নাম চলে আসে তাহলে এই নাম আজীবন থাকে। তাই প্রথম ভালোবাসাকে ভুলার জন্য অনেক ভালোবাসার জন্ম দিলেও কিন্তু প্রথম ভালোবাসা স্বামীর মনে থেকেই যায়। অন্তরের কোনো এক কোণে পড়ে থাকে। সময় মত জেগে উঠে। তবে এখানে পার্থক্য হলো, সেই ভালোবাসা পূনরায় পাওয়ার যেমন আশা থাকে না ঠিক তেমনিভাবে সেটিকে হারানোরও ভয় থাকে না। পাওয়া না পাওয়ার কোনো দুঃখ-বেদনা আর থাকে না।

জাহেলী যুগে নারী

ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, ঈসা (আ.) এর উর্ধ্ব গমনের পর থেকে **রাসূলে আকরাম** (স.) এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই সময়টিকে জাহেলী যুগ বলা হয়ে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ হতে অন্ধকার যুগ শুরু হয়ে ১৪৯২ সালে ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের নব জগত (আমেরিকা) আবিষ্কারের সময়ে গিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। অন্ধকার যুগকে ইতিহাসে (The dark age) এবং মধ্য যুগ (The medieval) ও বলা হয়। ইসলাম এবং খৃষ্টধর্মের উত্থানের কারণে এটিকে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের যুগও (The age of faith) বলা হয়ে থাকে।

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন দুর্বল ছিলো সামাজিক অবস্থাও তেমন খারাপ ছিলো। মানুষরা সভ্যতা বলতে কিছু বুঝতো না এবং জানতোও না। দুশ্চরিত্র ও নিষ্ঠুরতার কারণে মানবতা এবং মনুষ্যত্ব কি জিনিস তারা তা জানার প্রয়োজনও মনে করতো না। দয়া-মায়া, প্রেম-ভালবাসার ধারে কাছেও তাদেরকে পাওয়া যেতো না। যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো বছরের পর বছর। এমন কি তারা নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে না পেলে আপন ভাইয়ের সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এটিকে জনৈক আরবী কবি খুব সুন্দর করে এভাবে বলেছেন:

(وأحْيَاناً عَلى بَكْرٍ أخِيْنَا * إذَا مَا لَمْ نَجِدْ إلَّا أخَانَا)[১৪]

'কখনো কখনো বাক্‌র গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হতো, যদি তাদেরকে না পাওয়া যেতো তাহলে নিজের ভাইদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেতাম।'

তাই ইতিহাসের পাতায় প্রাক ইসলামী যুগকে **জাহেলী যুগ** (The age of ignorance) বলা হয়। আজও বর্বর কোনো কিছুর প্রতি নিজের ঘৃণা প্রকাশের জন্য জাহেলী যুগের সাথে তুলনা দেয়া হয়। কারণ সেই যুগ ছিলো অন্ধকারের যুগ। সভ্যতা ও ভদ্রতা বলতে কিছুই তাদের জানা ছিলো

---

[১৪]- شاعر جاهلي من بني تغلب

না। আর তাই আল্লাহ্ রাসূলে আরাবী (স.) কে পাঠিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পুরো মানব জাতিকে জানান দিতে গিয়ে এভাবে বলেছেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[১৫]

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে ছিলো উত্তম আদর্শ।'

জাহেলী যুগে নারী ছিলো ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। মানব সমাজের নিকৃষ্ট একটি সৃষ্টি মনে করে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হতো। নারীকে শুধু পুরুষের কামানুভূতি ও উত্তেজনা নিরসনের মাধ্যম এবং জৈব চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র ভাবা হতো। এটি কারো বানানো কল্পকাহিনী নয়; তদানীন্তন মানব সমাজের বাস্তব সত্য একটি চিত্র। ইতিহাসের সকল গ্রন্থসহ সীরাতে নাববীতেও জাহেলী যুগের অনেক কিছু উল্লেখ রয়েছে। এমন এক নিষ্ঠুর ও অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তার রাসূলকে এই বলে পাঠিয়েছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾16

'হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে দুন্ইয়া বাসীদের জন্য রাহমাত হিসেবে পাঠিয়েছি।'

জাহেলিয়্যাত এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহ.) একবার আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন: জাহেলিয়্যাত এবং ইসলামের কথা ক্বোরআনে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম আর কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে মানব জাতিকে উভয় যুগের মাঝে বিশাল পার্থক্য জানাতে গিয়ে বলেছেন:

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾[১৭]

১৫- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-২১
১৬- সূরাতুল আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭
১৭- সূরাতু আলে 'ইমরান, আয়াত নং-১০৪

'আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। তোমরা একটি অগ্নিকুন্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ্ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন।'

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেছেন:

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[১৮]

'যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিলো পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি, এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি যার উজ্জল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে। সে কি এমন ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং কোনোক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না? কাফেরদের জন্য তো এভাবেই তাদের কর্মকান্ডকে মনোমুগ্ধকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে।'

সত্য কথা হলো, জাহেলিয়্যাত এবং ইসলামের এর চেয়ে উত্তম আর কোনো চিত্র আঁকা কোনো সাহিত্যিক বা শিল্পীর পক্ষে কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। উভয়ের মাঝে পার্থক্য এবং উভয়ের বৈশিষ্ট্য এর চেয়ে পরিষ্কার এবং ভাষার অলঙ্কার ও বাগ্মিতা আর হতে পারে না। উপরোক্ত দু'টি আয়াতের তাফসীর এবং বিস্তারিত বর্ণনাই হলো জাহেলিয়্যাত এবং ইসলামের পুরো ইতিহাস। জাহেলিয়্যাত কি? তা পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে

﴿كُنتُمْ أَعْدَاءً﴾

'তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু'

এবং মানব জাতির অবস্থান বলতে গিয়ে

﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ﴾

'তোমরা একটি অগ্নিকুন্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে'

বলে পুরো জাহেলিয়্যাত বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ইসলাম কি? তা পরিস্কার করে বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

১৮- সূরাতুল আন'আম, আয়াত নং-১২২

﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾

'তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন'

এবং

﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾

'সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন'

বলে পুরো ইসলাম বুঝিয়ে দিয়েছেন। জাহেলী যুগের যত বড় শিক্ষিত হোক না কেন এর চেয়ে সঠিক সংজ্ঞা এবং এর চেয়ে উত্তম ও যুৎসই কোনো পরিভাষা ব্যবহার করে জাহেলিয়্যাত এবং ইসলামের সংজ্ঞা দিতে পারবে না। এটি আমরা হলফ করে বলতে পারি। ক্বোরআন যে ভাবে

﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا﴾

'আর যে মৃত ছিলো'

বলে প্রকাশ করেছে। ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাস যদি উল্লেখ করা হয়, তাহলে ক্বোরআনে উল্লেখিত পরিভাষা

﴿فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾

'আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে'

এর চেয়ে উত্তম কোনো শব্দ ও ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখিত পরিভাষাগুলো যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে পড়ে, তাহলে তার মনে হবে যে, আল্লাহ্ যেন বানান করে অথবা দুই এ দুই এ চার হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাঁর বান্দাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মৃত ছিলো আমি তাকে জীবিত করেছি বলেই তিনি কথা শেষ করেন নি। তাই তিনি আরো বলেছেন, আমি তাকে আলো দান করেছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে হাঁটা-চলা করে। এখানে শেষ করেও তিনি শেষ করেননি; বরং

﴿كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾

'সে কে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে সেখান হতে বের হতে পারছে না' বলে পুরো মানব সম্প্রদায়কে ষোলআনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ আরবী সাহিত্যিক ড. উমর ফার্‌রুখ **'তারিখুল জাহেলিয়্যাহ'** নামে জাহেলী যুগ সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ

রচনা করেছেন। উক্ত বইতে তিনি নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান তুলে ধরে লিখেছেন :

(والإرثُ في الجاهِلِيَّةِ كَانَ حَقُّ الرِّجالِ الذَّينَ يَركَبونَ الْـخَيْلَ ويحمِلُونَ السِّلاحَ، فَالطَّاعُونُ في السِّنِّ والصِّبيانُ لَـمْ يكُنْ لَـهُمْ حقٌّ في الإرثِ، أمَّا النِّساءُ فَكَانَ الرجالُ يَرثونَ مِنْهُنَّ وَيَرِثُونَـهُنَّ كَمَا يَرِثُونَ الْـمَتَاعَ وَالأَمْوالَ. وَلِذَلِكَ كَانَتْ قاعدةُ الْعَامَّةِ في الجاهليةِ أنَّ الْـمرأةَ لَا حَقَّ لَـهَـا في إرثِ قَرِيـْبِهَا الْـمُتَوَفَّى. عَلَى أنَّ الأَخْبَارَ وَرَدَتْ في أنَّ المرأةَ في بَعْضِ القبائلَ كَانَتْ تَرِثُ أَحْيَانًا).[১৯]

'জাহেলী যুগে পুরুষরাই উত্তরাধিকার পেতো। কারণ তারা যুদ্ধ করে অস্ত্র ধরে। প্রবীণ এবং শিশুরা উত্তরাধিকার পাবে না। আর পুরুষরাই নারীদের পক্ষে উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তি গ্রহণ করতো, এমন কি উত্তরাধিকার হিসেবে তারা নারীদেরও মালিক হয়ে যেতো। যেমনিভাবে তারা ধন-সম্পদের মালিক হতো। তাই জাহেলী যুগে স্বাভাবিকভাবে মনে করা হতো, নারী তার আপনজনের মৃত্যুতে কখনো সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। তবে কোনো কোনো গোত্রে কখনো কখনো নারী ওয়ারিস হতো।'

উপরোক্ত লেখকের বর্ণনায় বোঝা গেলো যে, জাহেলী যুগেও জীবন চলার পথে শুধুমাত্র ছেলেরাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। এখানেও নারীর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এর কারণ হিসেবে যা বলা হয়েছে তা হলো, ছেলেরা যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। আর যখন তারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসে, তখন নিজেদের পুরো গোষ্ঠী ও গোত্রের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং নিজেদের গোত্রকে বাহাদুর গোত্র হিসেবে অন্য গোত্রের সামনে তুলে ধরে। এ কারণেই তাদেরকে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হতো। অপরদিকে মেয়েরা নিজ গোত্রের সম্মান বৃদ্ধিতে এমন অবদান রাখতে স্বভাবগতভাবে অক্ষম। একারণেই নারীকে সমাজের বোঝা মনে করা হতো। তাদেরকে বাবার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হতো। এটি যুগে যুগে সকল ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন।

١٩- تاريخ الجاهلية، د. عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ص:١٥٨

যেমন Dr. Gustave Le Ban (7th May 1841-13th Dec.1931) তার বিখ্যাত গ্রন্থ La Civilization des Arabes এর মধ্যে এসম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন:

'জাহেলী যুগে নারীকে মানুষ এবং জানোয়ারের মাঝামাঝি একটি প্রাণী মনে করা হতো। যার কাজ ছিলো শুধু বাচ্চা জন্ম দেয়া এবং পুরুষের সেবা ও যৌন চাহিদা পূরণ করা। নারীর শরীর ভোগ করে নিজের শারীরিক চাহিদা পূরণ হলেও কন্যা সন্তানের জন্মকে নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে করা হতো। আর তাই জন্মের পর পরই মেয়ের জন্মদাতা বাবা নিজ মেয়েকে জীবিত কবর দিয়ে দিত। জীবিত কন্যাকে মাটি চাপা দেয়া জাহেলী যুগে একটি সাধারণ ব্যাপার ছিলো।'[২০]

ইতিহাসের ছাত্ররা অবশ্যই জানে যে, জাহেলী যুগে মেয়ের জন্মের পর জীবিত দাফন করার প্রথা সর্ব প্রথম **বনু আসাদ** গোত্রের বিত্তশালীরাই শুরু করেছিলো। অতঃপর **বনু রাবী'আহ, বনু কান্দাহ** এবং **বনু তামীমের** বড়লোকরাও এটি ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছিলো। পরিশেষে এই কু-প্রথা সমাজের বিত্তশালীদের গন্ডি অতিক্রম করে সাধারণ পরিবারেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন সমাজের শুধু ধনী-গরীব নয়, যে কেউ মেয়ে জন্ম নেয়ার পর জীবিত দাফন করে ফেলতো। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, এই ঘৃণ্য কাজটি যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম করেছিলো তার নাম ছিলো **ক্বায়েস বিন 'আমের**। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেছেন, জাহেলী যুগে তিনি বারো তেরো জন মেয়েকে জীবিত দাফন করে ফেলেছেন।'[২১]

মেয়ে শিশুদের জীবিত কবর দেয়া সম্পর্কে তদানীন্তন আরববাসী বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-চেতনা লালন করতো। তারা কুসংস্কারে ডুবে ছিলো। তাই কোনো কোনো গোত্র এমনও মনে করতো যে, মেয়ে বড় হয়ে গেলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিয়ের পরে জামাই আসবে। এটি আরো লজ্জার বিষয়। তাই কন্যা সন্তান জন্মের পর পরই জীবিত কবর দিয়ে দিলে

২০- La Civilization des Arabes উর্দু অনুবাদ, তামাদ্দুনে আরব, পৃষ্ঠা নং-৩৭৪

٢١- أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٤٣٣/٢

(উসদুল গাবাহ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ, ২/৪৩৩)

ক্বিস্‌সা খতম। আবার কোনো কোনো গোত্রে নীল বা কালো চোখ, কালো বা শ্বেত বর্ণ, ল্যাংড়া, লুলা ও প্রতিবন্ধী মেয়েকে জন্মের পর পরই জীবিত দাফন করে ফেলা হতো। এ ধরনের মেয়েদেরকে তারা নিজেদের জন্য অমঙ্গল মনে করতো। অন্যদিকে কিছু গোত্র এমনও ছিলো, যারা অভাব অনটনসহ খাদ্যের অভাব ও বিয়ে দেয়ার ভয়ে মেয়েদেরকে জীবিত দাফন করে ফেলতো। পরবর্তীতে ধনীদের গন্ডি অতিক্রম করে এই প্রথাটি গরীবদের মাঝেও ব্যাপকতা লাভ করেছিলো।' [২২]

মোটকথা, জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারতো না। তাই কন্যা জন্মের কথা শুনতেই সে যুগের লোকদের চেহারা খারাপ হয়ে যেতো। যার প্রভাবে এযুগের মানুষরাও প্রভাবিত। এখনও মেয়ে জন্ম হলে মুখ কালো হয়ে যায়। এটি কারো বানানো গল্প নয়। তখনকার নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক দূরবস্থার কথা পবিত্র ক্বোরআনও উল্লেখ করেছে। আমরা ক্বোরআনে দেখতে পাই আল্লাহ্ এসম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

'এরা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান, **সুবহান আল্লাহ্!** এবং নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাদের কাছে যা কাংখিত। যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফেরতে থাকে, কারণ এই দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? দেখো কেমন খারাপ কথা যা এরা আল্লাহ্‌র ওপর আরোপ করে।' [২৩]

তবে মনে রাখবেন, কন্যা জন্ম দিলে আমরা মন খারাপ করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভাগ্যবান স্ত্রী হলেন তিনি, যিনি প্রথম কন্যা সন্তান জন্ম

২২- بلوغ الارب في أحوال العرب، محمد شكري آلوسي، ص:٥٢٦

২৩- সূরাতুন নাহল, আয়াত নং-৫৭-৫৯

দেন। আর এসব গর্দভরা সহায় সম্বলহীনভাবে ছেড়ে চলে যায় কৌশল অপহৃত সদ্য প্রসূতি স্ত্রী ও হতভাগা নবজাতক কন্যাসহ বাসা-বাড়ি। এভাবে তারা কন্যা জন্ম হওয়ার বিরুদ্ধে নিজের বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ফয়সালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এটি কারো বানানো সাহিত্য রচনা ও কল্পকাহিনী বা অবাস্তব মনগড়া কোনো ক্বিস্‌সাহ নয়। অথবা কোনো এক পক্ষকে খুশী করা বা অপর পক্ষকে বদনাম করার জন্যও লেখা হয়নি। ইতিহাসের পাতা উল্টালে যে কেউ এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাবে।

বিষয়টির বাস্তবতা ও সত্যতা অনুধাবনের জন্য এমনই একটি ঘটনা এখানে পাঠকদের জন্য উল্লেখ করছি। যার পুনরাবৃত্তি আমাদের বর্তমান সমাজেও প্রতিনিয়ত ঘটছে। কিছু প্রকাশ হচ্ছে আর কিছু পর্দার আড়ালে রয়ে যাচ্ছে। যে ঘটনাটির জন্ম দিয়েছে জাহেলী যুগের **আবু হামযাহ** নামক এক ব্যক্তি। আর তার অনুকরণ করে চলছে এ যুগের নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা। ঘটনাটি হলো, আবু হামযার স্ত্রী একবার কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে তাকে একা রেখে নিজের তাঁবু ছেড়ে প্রতিবেশীর তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। এভাবেই চলছে বেশ কিছু দিন। সে তার স্ত্রীর কাছেও যাচ্ছে না। খবরও নিচ্ছে না। এরই মাঝে একদিন নিজের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতর হতে তার সেই স্ত্রীর গান গাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলো। আওয়াজ শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং গানের ভাষাটি বোঝার চেষ্টা করলো। তার স্ত্রী তখনও নৃত্য করে গেয়ে যাচ্ছে:

مَا لِأَبِي حَـمْزَةَ لاَ يَأْتِيْنَا ؟! / يَظِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِيْ يَلِيْنَا

غَضْبَانُ أَنْ لَا نَلِدَ الْبَنِيْنَا / تَاللهِ مَـا ذَلِكَ فِي أَيْدِيْنَا

وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أَعْطِيْنَا / وَنَـحْنُ كَالأَرْضِ لِزَارِعِيْنَا

نُنْبِتُ مَا قَدْ زَرَعُوه فِيْنَا[24]

٢٤- تفسير سورة التكوير، للشيخ مصطفى العدوي، بهجة المجالس وأنس المجالس، للشيخ ابن عبد البر، البيان والتبيان، للجاحظ، أطفال في حجر رسول الله، للشيخ سلمان العودة، و تفضيل انجاب الذكور وحقوق المرأة، للأستاذ أبو رغيف.

'আবু হামযার কি হয়ে গেলো সে আমাদের কাছে আর আসছে না? আমাদের প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।সে এ জন্যই রাগ করেছে যে, আমরা পুত্র সন্তান জন্ম দিচ্ছি না। **আল্লাহ্‌র ক্বসম!** এটি তো আমাদের হাতে নেই। কারণ আমরা তো সেটিই গ্রহণ করি যা আমাদেরকে দেয়া হয়। শস্য উৎপাদনের জন্য আমরা কৃষকের যমীনের মত। আমরা সেটিই উৎপাদন করি যা আমাদের মধ্যে রোপন করা হয়।' [২৫]

উল্লেখিত ঘটনাটি জাহেলী যুগের হলেও বর্তমান আধুনিক সমাজেও এমন অসংখ্য ঘটনার জন্ম হচ্ছে। মেয়ে জন্ম দেয়ার কারণে স্ত্রীকে মেরে ঘর হতে বের করে দেয়া হয়েছে এমন সংবাদ প্রতিনিয়ত মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছে। আমাদের সমাজে শুধু নয়, নিজ পরিবারের মাঝেও এমন অনেক মা-বাবা, ভাই-বোন রয়েছে তারাও মেয়ে জন্মের কথা শুনে নিজের বিরক্তিভাব প্রকাশ করে। এমন মনোভাব জাহেলী যুগের মনোভাবের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বলে আমরা মনে করি।

এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা মেয়ের জন্ম হওয়ার কারণে নিজের স্ত্রীকে দোষারোপ করে। স্ত্রীকেই মেয়ে জন্ম দেয়ার কারণ বলে মনে করে এবং সন্দেহ করে। তবে যারা এই রোগে আক্রান্ত তাদেরকে মনে রাখতে হবে, সন্দেহ এমন এক রোগ যা মানুষের শান্তিকে নীরবে হত্যা করে ফেলে। সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি কোনোভাবেই স্ত্রীর প্রেম যন্ত্রের গভীরে গেয়ে ওঠা প্রেমের গুনগুনানী সুর শুধু দিনে দুপুরে নয়, রাতের অন্ধকারে বেড শেয়ার করতে গিয়েও শুনতে পায় না। যে নারীর স্বামীর মাঝে সন্দেহ রোগ বাসা বেঁধেছে, সেই নারীর ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কি করার আছে? তেমনই সন্দেহ প্রবণ এক স্বামীর সংসারে এক নারীর কীভাবে জীবন কাটছে জানেন? সে বললো ভাই ধৈর্যের কথা আপনাকে আর কী বলবো? আমার স্বামী আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে অন্য কাউকে পাওয়ার জন্য। এমন পুরুষকে বলবো ফেলে আসা দিনগুলোকে কখনো মনে রেখো না। আগামী কালের চিন্তায় এবং সুখের আশায় আজকের নিজেদের একান্ত সময়ের হাসিকে নষ্ট করো না। ভাগ্যে যা লিখা ছিলো তার অভিযোগ করো না। ফায়সালা আকাশে হয় যমীনে নয়। এমন ঈমান নিয়ে বাঁচতেও হবে মরতেও হবে। তবেই তো তুমি একজন স্বার্থক পুরুষ।

২৫- বিস্তারিত দেখুন লেখকের বই **'দাম্পত্য জীবন'** পৃষ্ঠা নং- ৯১-৯২।

তাফসীরে কুরত্ববীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ লুত্ব (আ.) কে শুধু মেয়ে দিয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আ.) কে শুধুমাত্র ছেলে সন্তান দান করেছিলেন। ইস্মাঈল এবং ইস্হাক্ব (আ.) কে ছেলে-মেয়ে উভয়ই দিয়ে ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া (আ.) নিঃসন্তান ছিলেন।'

তাই বলছিলাম, আল্লাহ্ যখন ক্বোরআনে বলেই দিয়েছেন, সন্তান দেয়ার কাজ তাঁর। তারপরও মানুষরা এটিকে কেন মেনে নেয় না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবন সন্তান না হওয়ার কারণে এত বেশী প্রভাবিত যে, তাদের নিজেদের কাছে নিজেদের জীবনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তারা মনে করে বেঁচে থেকে আর কী লাভ! এধরনের দম্পতিদেরকে বলবো, এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র যুক্তিসিদ্ধতা ও বিচক্ষণতা রয়েছে বলে মেনে নেয়ার নামই ঈমান। তিনি ইচ্ছে করলে সন্তান দিতেই পারেন। তাই নিঃসন্তান দম্পতিদের আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করা উচিৎ। আল্লাহ্ যেন সকলকে নেক সন্তান দান করেন।

অতএব আল্লাহ্র নাবী-রাসূলদের সাথে যদি এমন হতে পারে তাহলে আমাদের সাথে এর ব্যতিক্রম কীভাবে আশা করা যায়? তাই জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকাই হলো ঈমানের দাবী। ছেলে-মেয়ের জন্ম সম্পর্কে আমরা রাসূল (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে বিস্তারিত দেখতে পাই, তিনি বলেছেন:

((عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ». قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ

إِجَازَةً؟ قَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ»، قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا» قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ »، قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ))[٢٦]

'সাওবান (রা.) (রাসূলুল্লাহ্‌র খাদেম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখনই একজন ইয়াহুদী পাদ্রী তাঁর কাছে আসলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্‌কে বললো:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

এটি শুনে আমি তাকে জোরে এক ধাক্কা দিলাম। ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে যেতে লাগলো। অতঃপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে কেন ধাক্কা দিয়েছো? আমি তাকে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ্ বলতে পারছো না? তখন ইয়াহুদী বললো, আমরা তাকে সেই নামেই ডাকি যেই নাম তার পরিবার রেখেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমার নাম মোহাম্মাদ। এটিই আমার পরিবারের দেয়া নাম। এরপর ইয়াহুদী রাসূল (স.) কে বললো, আমি আপনার কাছে একটি বিষয় জানতে এসেছি। রাসূল (স.) বললেন, আমি যদি সেটি তোমাকে বলি তোমার কি কোনো উপকার হবে? সে জানালো, আমি আমার দু'কান দিয়ে শুনবো। রাসূল (স.) তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে মাটিকে একটি দাগ দিলেন এবং তাকে বললেন, জিজ্ঞেস কর।

---

[٢٦] - روى مسلم،رقم الحديث: ٣١٥

ইয়াহুদী জিজ্ঞেস করলো, যে দিন এই যমীন এবং এই আকাশ পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন মানুষরা কোথায় থাকবে? রাসূল (স.) বললেন, তারা তখন একটি অন্ধকার স্থানে অবস্থান করবে। যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। সে আবার প্রশ্ন করলো, সর্ব প্রথম সেখান হতে কারা বের হবে? উত্তরে রাসূল (স.) জানালেন, অসহায় মুহাজির। ইয়াহুদী আবারও জিজ্ঞেস করলো, তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন উপহার হিসেবে তারা কী পাবে?

রাসূল (স.) বললেন, নূন মাছের কলিজা। অতঃপর সে আবারো প্রশ্ন করলো। তাদের খাদ্য কী হবে? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় জবাই করা হবে। যে ষাঁড় জান্নাতের বাগানের ঘাস খেয়ে বড় হয়েছে। সে পুনরায় জানতে চাইলো, তাদের পানীয় কী হবে? রাসূল (স.) উত্তরে তাকে বললেন, জান্নাতের একটি ঝর্ণা যা **'সালসাবীল'** নামে অভিহিত, তাদেরকে সেই ঝর্ণার পানি পান করানো হবে। পরিশেষে ইয়াহুদী বললো, আপনি সত্য বলেছেন। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্‌কে জানালো যে, আমি মূলতঃ আপনার কাছে এমন একটি বিষয় জানতে এসেছি, যা সম্পর্কে দুন্‌ইয়ায় কেউ কিছু বলতে পারবে না। তবে একজন নাবী এবং একজন বা দুইজন ব্যক্তি শুধু এই সম্পর্কে বলতে পারবে।

রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে তা জানালে তোমার কোনো কাজে আসবে? সে বললো, আমি আমার দু'কান দিয়ে শুনবো। তখন সে বললো, আমি আপনার কাছে ছেলে সন্তান জন্ম নেয়া সম্পর্কে জানতে এসেছি। এমন প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) তাকে বললেন, পুরুষের বীর্য বা Semen সাদা, আর নারীর হলুদ। স্বামী-স্ত্রী যখন দৈহিক সম্পর্ক করে তখন পুরুষের বীর্য যদি নারীর বীর্যের ওপর ছেয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। আর যদি স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। এটি শুনে ইয়াহুদী বললো, আপনি সত্য বলেছেন। আপনি অবশ্যই একজন নাবী। এটি বলে সেই ইয়াহুদী চলে গেলো। অতঃপর রাসূল (স.) বললেন, এই লোকটি আমাকে যা জিজ্ঞেস করেছিলো সেই বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিলো না। আল্লাহ্ আমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।'

উপরোক্ত হাদীসটিকে গবেষণা করে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জানতে পারছে যে, পুরুষের বীর্য সাদা। নারীর বীর্য হলুদ। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৈহিক মিলনের সময় যখন বীর্য একত্রিত হয়ে স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যকে ঢেকে ফেললেই আল্লাহ্‌র হুকুমে ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। আর যদি স্ত্রীর বীর্য তার স্বামীর বীর্যকে ঢেকে ফেলে, তাহলে আল্লাহ্‌র হুকুমে মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়। এখানে পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যাপারে কারো কোনো হাত নেই। কেউ কাউকে সন্তানই দিতে পারবে না। পুত্র সন্তান দেয়া তো বাহুত দূর কী বাত!

তাই বলছিলাম, মাজারে গিয়ে নযর ও নিয়ায, চাদর ও চেরাগ, চামেলী ও গোলাপ, হালুয়া ও কাবাব নিয়ে বাবার কাছে গেলে বাবা কিছুই করতে পারবে না। কারণ বাবা মরে যাওয়ার পর কবরে যাওয়ার আগেই ভক্তদের দো'য়ার মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাই তারা তাকে কবরে পাঠানোর আগেই তার **'সালাতুল জানাযাহ্'** আদায় করে তার জন্য দো'য়াও করেছে। কবর পর্যন্ত সে নিজে হেঁটে যেতে পারলো না। তাকে চারজন কাঁধে করে নিয়ে রেখে এসেছে। অতএব যমীনের উপরে থাকতেই সে যখন কিছুই করতে পারলো না, এখন মাটির নীচে গিয়ে কী করে অন্যকে কিছু দিতে পারে? তার যদি কিছু করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে কাফন ছিঁড়ে খাট হতে লাফ দিয়ে ওঠে যেতো। আজরাঈলের থাবা হবে যখন সে নিজেকেই বাঁচাতে পারলো না আখেরাতে কঠিন আযাব হতে অন্যকে কী করে বাঁচাবে? এটি অবশ্যই চিন্তার বিষয়। লেখককে গাল-মন্দ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শির্‌ক মুক্ত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে মনে করবেন, আপনার তরী জান্নাতের ঘাটে গিয়ে ভিড়েছে।

মনে রাখবেন, এধরনের অসহায়দের মাযারে গিয়ে সেখানে গাছের সাথে সুতা লটকিয়ে বা পাথর বেঁধে রাখলে সন্তান হবে এটি পাগলও বিশ্বাস করে না। কারণ সেও বোঝে, এভাবে যদি সন্তান লাভ হতো তাহলে বিয়ে করার কী দরকার ছিলো? কারো সন্তানের প্রয়োজন হলে অদনা শাহ্ আর বদনা শাহ্, অল্লা শাহ্ আর কল্লা শাহ্, অঙ্গি শাহ্ আর জঙ্গি শাহ্, আলু শাহ্ আর কালু শাহ্, মালু শাহ্ আর ফালু শাহ্, অরিবুল্লাহ আর গরীবুল্লাহ, আকবর শাহ্ আর আসগর শাহ্, আমানাত শাহ্ আর খিয়ানাত শাহ্‌র দরগাহে সকালে সুতা বাঁধলো আর বিকালে সন্তান পেয়ে গেলো। কত সহজ

উপায়। যা অর্ডার হতো তাই হতো। সবার ঘরে ছেলেই জন্ম হতো। যেহেতু তারা কাউকে কিছু দিতে পারছেন না তাই যারা এসব করছে তারা উল্টো শির্ক করছে। যার পরিণতি জাহান্নাম। উপরোক্ত পীর-আওলিয়াগণ ক্বিয়ামাতের দিন এ সব অপকর্মের দায়িত্ব নেবেন না।

মনে রাখবেন, বাবারা মরে যাওয়ার পর যদি কাউকে সন্তান দিতে পারতো তাহলে বিয়ের নামে মা-বাবাদের কখনো লাখ টাকা খরচ হতো না। কেউ কারো বউ বা কারো জামাইও হতো না। সংসার নামক কোনো জোয়ালও কারো কাঁধে পড়তো না। কারো পেছনে অর্থও খরচ হতো না। অথবা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সীজারের নামে ডাক্তার নামক কসাইরা কারো পেট ও পকেট কাটারও সুযোগ পেতো না। অতঃপর নিজ সন্তানকে কাছে রাখার আবেদন জানিয়ে কেউ কারো বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করতে পারতো না। নারী নির্যাতন বা যৌতুকের মামলায় আদালতও কখনো কেঁদে উঠতো না। পরিশেষে সাংবাদিকরাও এধরনের সংবাদ ছেপে নিজেদের পত্রিকার কাটতি বাড়ানোরও সুযোগ পেতো না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। চাকরির সুবাদে চট্টগ্রাম আসার পর অনেক বাবার মাজারের কথা শুনেছি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, চট্টগ্রামেই সকল বাবার অবস্থান। এখানেই মাযার বেশী। এসব ভন্ডদের অনেকের কারামাতের কথাও শুনেছি। মূর্খরা এসব বলে সরল সোজা মানুষদেরকে বেকুফ বানায়। যেমন মোহ্সিন আউলিয়ার ওরশের দিন বৃষ্টি হবেই। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ষার ভরা মৌসূমে মুহ্সিন আওলিয়ার ওরশ হয়। আর বর্ষকালে বৃষ্টি হবেই। এটি প্রকৃতির দাবী। এ ধরনের লোকদের কাছে আমার প্রশ্ন বর্ষাকালে বৃষ্টি না হয়ে গ্রীষ্মকালে হবে? অতএব বৃষ্টি হলে এটিকে মুহ্সিনের কারামাত বলে চালিয়ে দেয়। তাদের মূর্খতার আরো নমুনা দেখুন। মুহ্সিন একজন মানুষের নাম। তাই একজন মানুষ কোনো দিন **'আওলিয়া'** হতে পারে না। কারণ **'আওলিয়া'** শব্দটি বহুবচন। তাই একজনকে 'আওলিয়া' বললে গ্রামাটিক্যাল ভুল হবে। এ কারণেই মুহ্সিন **'ওলী'** হতে পারে আওলিয়া হতে পারে না। এতেই বোঝা যায় যে, এসব মূর্খদের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরো অনেক বাবার কারামাতি শুনেছি। যেমন, আমানাত শাহ্র দরগাহে গিয়ে চাইলেই হলো, সব পাওয়া যাবে। বায়জিদ বুস্তামীতে গাছের সাথে

সুতো লটকালেই সন্তান হবে। সেখানের পুকুরের কছ্ছপের পিঠের ওপরের ময়লা মুখে মাখলে নারীরা সুন্দর হবে। এ ধরনের আরো কতো কী কু-সংস্কার এবং ঈমান বিধ্বংসী কথা প্রচলিত রয়েছে। যার কারণে সকাল-সন্ধ্যা মুসলমানদেরকে সেখানে গিয়ে সাজদাহ্ দিয়ে ঈমান হারাতেও দেখা যায়। আমি চট্টগ্রামে এসে সর্ব প্রথম হালি শহরের সবুজবাগের একতলা একটি বিশাল বাড়িতে ভাড়ায় উঠি।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমি ঢাকার উত্তরার ৬ নং সেক্টরের ২ নং বাড়িতে থাকতেই আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের আমার সহকর্মী প্রফেসর ড. মাহ্মুদুল হাসান যিনি পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ছিলেন, বর্তমানে লন্ডনে দা'ঈ হিসেবে কাজ করছেন, তার আব্বা জনাব ইলিয়াছ সাহেব আমার জন্য বাসাটি ভাড়া করে রেখেছিলেন। উক্ত বাসায় আমার প্রতিবেশী আমানাত শাহ্ এর একজন অন্ধ ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি আমাকে প্রতিনিয়ত আমানাত শাহ্র মাযারে নেয়ার জন্য দা'ওয়াত দিতে থাকলেন। কিন্তু আমি আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু বলে বলে সময় ক্ষেপণ করার পন্থা অবলম্বন করলাম।

লোকটি ছিলেন নাছোড়বান্দা। দেখা হলেই একই আবদার করতেন। তাই প্রতিনিয়ত একই দাবী করার কারণে পরিশেষে একদিন আমি তার সাথে যাবো বলে কথা দিলাম। যাওয়ার আগে আমি প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র কাছে আমার ঈমানের হিফাযাতের জন্য দো'য়া করতে লাগলাম। আর আমার শারীকে হায়াত নীলের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সেখানে গেলে তাদের দেয়া কোনো কিছুই খাবো না। কারণ খেলে আবার কী হতে কী হয়ে যায়। তাই এমন পরিকল্পনা করলাম। তাই হলো।

তবে মাযারের লোকেরা ভার্সিটির প্রফেসর হিসেবে আমার পরিচয় পেয়ে খুব সম্মান করলেন। মিষ্টি ও ফল-ফ্রুট খেতে দিলেন। কিন্তু আমি কোনো কিছুই খেলাম না। তারপর তারা চা খাওয়ার অনুরোধ করলেন। আর চায়ের প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে। নাদওয়ার ছাত্র থাকাকালে জুনিয়র ছাত্ররা এই চা খাইয়ে অনেকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য বক্তৃতা লিখিয়ে নিতো। আবার অনেকে ক্যান্টিনে চা খাওয়ার দা'ওয়াত দিয়ে নিয়ে মুনিরের ক্যান্টিনে চা খাওয়াইয়ে আসার পথে একটি লেখা হাতে তুলে

দিয়ে বলতো **'যরা ইসকো তাস্‌হীহ্‌ কর দী জীয়ে'**। তখন চা খাওয়ানোর উদ্দেশ্য বুঝতাম। এভাবে চায়ের প্রতি আমার দুর্বলতার কথা নাদওয়ার সবাই জানতো। আর একে অপরকে বলতো, তাকে কোনো ভাবে চা খাওয়াতে পারলে সব কিছুই করানো যাবে। কিতাব না বুঝলে তার কাছ থেকে বুঝে নেয়া যাবে। বক্তৃতার দরকার হলে তাকে দিয়ে লিখানো যাবে। এ ধরনের আরো কতো কী।

যেহেতু চায়ের প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে, তাই কিছু খাবো না বলে যে সংকল্প করেছিলাম তা ভুলে গিয়ে তাদের দেয়া চা খেয়ে ফেললাম। খাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়লো আমি ভুল করে ফেলেছি। তাই আমার মাঝে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য নিজে নিজেই মনে মনে বলতে লাগলাম দূর! মাযার টাজার সব ভুয়া। মাযার ওয়ালা কিছুই করতে পারবেন না। পারলে তো তিনি নিজেই না মরে জীবিত থাকতেন। অতএব যেই আক্বীদাহ্‌ ও বিশ্বাস পোষণ করতাম, মাযারে গিয়ে চা খাওয়ার পরও যখন সেই বিশ্বাস ও আক্বীদাহ্‌ অবিচল থাকলো তখন বলে উঠলাম, **আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌!**

মাযারের মাসজিদে সালাতুল এশা জামা'য়াতের সাথে আদায় করলাম। সালাতের পর সবাই বিশেষ করে যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি মাযারের কাছে গিয়ে আরো দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে মাযারের দিকে মুখ করে হাত তুলে অনেক্ষণ পর্যন্ত হাত নেড়ে কী যেন চাইতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পর পর আমাকেও ইশারায় মাযারের কাছে যাওয়ার জন্য ডাকতে লাগলেন। আমিও হাতের ইশারায় যাবো না বলে জানাতে লাগলাম। যাক এভাবে অনেক্ষণ ডাকাডাকি করেও যখন আমাকে মাযারের কাছে নিতে পারলেন না, তখন তিনিও বাবার কাছে তার চাওয়া পাওয়া শেষ করে চলে আসলেন।

বাসায় ফিরে আসার পথে গাড়িতে বসে তিনি আমাকে বললেন, প্রফেসর সাহেব অনেক বড় আশা নিয়ে আপনাকে বাবার দরবারে নিয়ে আসলাম আপনার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য। কিন্তু আপনি তার কাছে কিছুই চাইলেন না। তার মাযারে গিয়ে দুই রাক'আত সালাতও আদায় করলেন না। সালাত আদায় করে তার কাছে চাইলে এবং তিনি যদি আপনাকে গ্রহণ

করে নিতেন তাহলে আপনার জীবনে আর কোনো অভাবই থাকতো না। সব হয়ে যেতো। আমি বললাম, ভাই আমার তো কোনো অভাব নেই। ঢাকা ভার্সিটির মাস্টার্স পাশ মহা সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করে বউ বানিয়েছি। আল্লাহ্‌র রাহমাতে সেও আমাকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে উপহার দিয়ে আমার সংসার সাজিয়ে দিয়েছে। ভার্সিটির প্রফেসরও আল্লাহ্ বানিয়েছেন। অতএব আমার কোনো অভাব তো আর দেখছি না। বাবা এর বাইরে আমাকে আর কী দেবেন? আপনার দরকার হলে আপনি তার কাছে চান। আমার দরকার নেই। আমি আমার আল্লাহ্‌র কাছে চাইবো তিনিই দাতা। তিনি দিলে রাহমাত, না দিলে হিকমাত।

আল্লাহ্‌র রাহমাত, আমি জীবনে কখনো কোনো মাযারে যাইনি। কেন যেন মাযারের প্রতি আমার কোনো ভক্তিও নেই। তাই সেখানে যাওয়ার ইচ্ছেও কখনো মনে জাগেনি। ঢাকার **লালবাগ জামেয়া ক্বোরআনিয়া আরাবিয়াহ্‌র** ছাত্র থাকাকালে দারে জাদীদের চতুর্থ তলায় থাকার সময় আসরের পর লালবাগ কিল্লার মাঠে ঘুরতে গিয়ে মাঠের পূর্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত একটি মাযার হতে মোমবাতি নিয়ে চলে আসতাম। হোস্টেলে রাতে বিদ্যুত চলে গেলে সেই মোম জ্বালিয়ে তাকরার বা গ্রুপস্টাডি করতাম। নাদওয়ার ছাত্র থাকাকালে একবার দশ দিনের জন্য দিল্লীতে তাবলীগের মারকাযে গিয়েছিলাম। সে সুবাদে মারকাযের পাশে নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার মাযার দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শিরক্ ও বিদ'আহ্‌সহ যা দেখলাম তারপর হতে মাযারের প্রতি আমার ঘৃণা আরো বেড়ে গিয়েছে। ভারতে দীর্ঘ এগার বছর থাকার পরও আযমীরসহ খাজা বাবা আর গাঁজা বাবা কোনো বাবার দরগাহে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আমি মনে করিনি।

মাযারের প্রতি এমন অনিহা এবং সেখানের শির্‌ক ও বিদ্'আহর কারণে বায়েজিদ বোস্তামীতে নিজে না গিয়ে একবার আমার স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভীকে পাঠিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে বলেছিলাম, তুমি সেখানকার খুঁটি-নাটি সব কিছু দেখে আসবে। নারী-পুরুষ কোথায় কে কীভাবে শির্‌ক করছে এবং কোন্ বাবা কীভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে তাও লক্ষ্য করবে। কারণ তাদেরকে সেগুলো হতে বাঁচার আহবান জানানো প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। আমার স্ত্রী সেখান হতে দেখে এসে আমাকে

জানালো, যেসব নারীদের বাচ্চা হচ্ছে না তারা বাচ্চা লাভের আশায় মাযারের গাছের সাথে সুতা বাঁধছে। কেউ আবার গাছের সাথে পাথর ঝুলিয়ে বাবার মাযারে মান্নত মানছে। মাথার চুলে জটবাঁধা উলঙ্গ ও গায়ে গন্ধ এখানে সেখানে বসে থাকা ফকীরদের কাছে দো'য়াও চাচ্ছে। কারণ তারা মনে করছে এসব উলঙ্গ বাবাদের কাছে অনেক কিছুই আছে। তাই তাদের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে। আমি তখন বললাম, তাদের কাছে কী আছে? যা আছে তা তো তারা সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বামীর মুখে এটি শোনে স্ত্রীও লজ্জা পেয়ে গেলো। কিন্তু আমার আপনার মা-বোন ও ভাবীরা লজ্জা পাচ্ছে না।

অথচ মুসলমানের আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাস হতে হবে যা কিছু হবে সব আল্লাহ্র হুকুমে হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, ফায়সালাহ্ আসমানে হয়। যমীনে নয়। তাই আল্লাহ্র হুকুম এবং তার ইচ্ছায় মানুষের ধন-সম্পদ, ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু, বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি সবই হয়ে থাকে। তার ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার নেই। তিনি যার জন্য যা ভালো মনে করেন সেটিই করে থাকেন। অতএব মেয়ে জন্ম দেয়ার কারণে নিজ স্ত্রীকে গাল-মন্দ করা কোনো বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারে না। এটি অনৈসলামী কথাবার্তা, কুসংস্কার এবং একটি জঘণ্য শির্ক। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ সব গুনাহ্ মাফ করলেও শির্ক কখনো মাফ করবেন না বলে পবিত্র ক্বোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে জন্ম দেয়ার কারণে আপনি আজ একজন মেয়ের উপর অত্যাচার করছেন, আপনার মেয়ের সাথেও এমন হবে। যে যেমন করবে তার সাথেও তেমন হবে। একটি কথা শুনুন, আশা করি ঘুমন্ত বিবেক জেগে উঠবে। একবার একলোক যৌবনে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছিলো। তার শক্তি সামর্থ ও ক্ষমতার দাপটের কারণে সেদিন কেউ তাকে কিছু করতে পারেনি। ঐ মেয়ে কারো কাছে কোনো বিচারও পায়নি। দীর্ঘদিন পর ঐ লোকটি সেই মেয়ের কাছে গিয়ে বললো, আমাকে মাফ করে দাও। তখন ঐ ধর্ষিতা মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, এত দিন পর কেন মাফ চাইতে আসলে? তখন সে উত্তরে বললো আজ আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়েছে। কি বুঝলেন? সাবধান!

জাহেলী যুগের লোকেরা মেয়ে জন্ম হয়েছে শুনে নারায হতো। যার হয়েছে শুধু সে নয়, অন্যরাও খারাপ মনে করতো। অজ্ঞ এবং মূর্খ জাহেলী যুগের

লোকদের চরিত্র এখন আমাদের সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত এবং মডার্ন ঈমানদারদের মাঝেও পুরোদমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের চিত্র এখন নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদেরকে শিক্ষিত এবং মডার্ন হওয়ার দাবী করলেও মূলতঃ এ ধরনের লোকেরা জাহালাত ও মূর্খতা, খুরাফাত ও কু-সংস্কারের মধ্যে ডুবে আছে। তাই মেয়ে সন্তান জন্মের কথা শুনে নিজেদের বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছেলে-মেয়ে জন্মের জন্য শুধুমাত্র স্বামীই দায়ী, স্ত্রী নয়। কারণ স্ত্রী হলো চাষির যমীনের মত। চাষি তার যমীনে যা রোপন করে যমীনও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাই উৎপাদন করে। এর বাইরে অন্য কিছু করার যমীনের যেমন কোনো ক্ষমতা বা স্বাধীনতা নেই, স্ত্রীও ছেলে বা মেয়ে জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ ক্বোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

﴿لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾[২৭]

'যমীন ও আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ্। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম।'

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মওদূদী (রাহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল ক্বোরআন' এ লিখেছেন: 'এটা আল্লাহ্‌র বাদশাহীর নিরংকুশ (Absolute) হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেয়া তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্মদানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ্ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোনো ঔষধ, কোনো চিকিৎসা এবং কোনো তা'ভীয-কবজ দ্বারা

২৭- সূরাতুশ শুরা, আয়ত নং-৪৯

সন্তানওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ্ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনো ভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায় এমনকি সন্তান জন্মের পূর্বে কেউ একটুকু পর্যন্ত জানতে পারেনি যে মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান বেড়ে উঠছে না কন্যা সন্তান। এসব দেখে শুনেও যদি কেউ খোদার খোদায়ীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে সেটা তার নিজের অদূরদর্শিতা। যার পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোনো কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যে সামান্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।'[২৮]

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এসম্পর্কে বক্তব্য হলো, স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের প্রথমেই স্বামীর যে বীর্য বের হয় সেটি যদি Y হয়, তাহলে আল্লাহর রাহমাতে স্ত্রীর গর্ভে ছেলে সন্তান জন্ম নেবে। আর যদি স্বামীর বীর্য X হয় তাহলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় স্ত্রীর গর্ভে মেয়ে সন্তান জন্ম হবে। তাই আমরা মনে করি সমাজের বুড়ো-বুড়িদের বানানো কু-সংস্কারে বিশ্বাস না করে কন্যা সন্তানের জন্মের ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞান কী বলে তা বোঝা দরকার। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান যা বলছে তা ক্বোরআন পনেরশ বছর আগেই বলে দিয়েছে। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে প্রত্যেক নর-নারীর ডিএনএর মধ্যে এক জোড়া সেক্স-ক্রোমোজোম থাকে। যার একটি হলো X এবং অপরটি হলো Y। এই দু'টি একত্রিত হলে পুত্র সন্তান জন্ম হয়। অপরদিকে নারীর শরীরের দু'টোই হলো Y ক্রোমোজোম। তাই স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের পর সন্তানের যে ভ্রুণ তৈরী হয় সেখানে বাবার X ও মায়ের Y এর সাথে মিলে গেলে তখন পুত্র সন্তান জন্ম হয়। আর যদি বাবার Y মায়ের Y এর সাথে যুক্ত হয় তখন কন্যা সন্তান জন্ম হয়। তাই বিষয়টি সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখলে আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন, মায়ের শরীরে শুধুমাত্র Y ক্রোমোজোম থাকার কারণে তিনি কোনো ভাবেই কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য দায়ী হতে পারেন না। কারণ সন্তান কন্যা বা পুত্র যাই হোক না কেন, বাবাই এর জন্য দায়ী। মা নয়।

২৮- তাফহীমূল ক্বোরআন, খন্ড নং-১৪, পৃষ্ঠা নং-৯২।

সুতরাং পুরুষের বীর্যের মাধ্যমেই সন্তান ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ হয়। এখানে নারীর কোনো ভূমিকা নেই। তাই স্ত্রীকে দোষ দেয়া এবং তাকে গাল-মন্দ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। এমন করলে এক সময় আমও যাবে ছালাও যাবে। কীভাবে যাবে জানেন? না জানলে জেনে রাখুন, মেয়ে জন্ম দেয়ার কারণে গাল-মন্দ শুনিয়ে নারীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে স্ত্রী বানিয়ে রাতে নিজের বিছানায় নিয়ে আপনি তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করে চলছেন এটি সত্য, তবে সেও যে আপনার সাথে সমান তালে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে এটি আপনার ধারণা। বাকী জীবন এভাবেই কেটে যাবে কখনো বুঝতেও পারবেন না। আরো ভালো করে বোঝার জন্য বলছি। একবার এক শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলো, বাচ্চারা বলো, সত্য এবং ধারণার মাঝে পার্থক্য কী? সবচেয়ে বোকা যে ছেলেটি পেছনের সীটে বসে থাকে সে দাঁড়িয়ে বললো স্যার! আপনি আমাকে পড়াচ্ছেন এটি সত্য, আমি পড়তেছি এটি আপনার ধারণা। কী বুঝলেন?

তাই বলছিলাম, যে ছেলে জন্ম না দেয়ার কারণে মা গাল-মন্দ শুনেন, আর যে ছেলের জন্মে বাবা আনন্দে লাফিয়ে উঠেন এবং গর্ব করেন সেই ছেলেই কিন্তু আজ হেরোইন আর ইয়াবা খেয়ে গুন্ডাগিরি করছে। স্কুল-কলেজের মেয়েদেরকে ইভটিজিং করে ভ্রাম্যমান আদালতের সাজা মাথায় নিয়ে আপনার অজান্তেই জেলের ভাত খাচ্ছে। আপনার সেই ছেলে স্কুলে গিয়ে পড়া-শোনা না করলেও আপনার প্রতিবেশীর মেয়েটি ঠিকই পড়া-শোনা করছে। তেমনই এক ছেলের মা-বাবার আলোচনা শুনুন। এক নারী রান্নাঘর হতে উঠানে কর্মরত নিজ স্বামীকে ডেকে বলছে এই শোনছো? স্বামী দূর থেকে জিজ্ঞেস করলো কি? স্ত্রী তখন বললো: আমাদের প্রতিবেশী **মাসরুরাহ** আপার মেয়ে **মিদ্‌হা** একাউন্টিং এ ৯৯% পেয়েছে। স্বামী তখন অবাক হয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, এক নম্বর কোথায় গেলো। স্ত্রী খুব সহজভাবে উত্তর দিয়ে বললো সেটি তোমার ছেলে বল্টু নিয়ে এসেছে।

মনে রাখবেন এ ধরনের ছেলেরাই কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার সাথে সাথে চাচা ও মামাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে লাশ দাফন করতে আর কত দেরী? অতএব ছেলে-মেয়ে জন্ম নিয়ে অনর্থক নিজের জীবন ও পরিবারকে বিষাক্ত করে ফেলা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। তাই বলছিলাম, দুন্‌ইয়া আমাদেরকে ধোকা দিয়ে পরহেযগার হয়ে গেলো, আর

আমরা দুন্ইয়ার ওপর ভরসা করে গুনাহগার হয়ে গেলাম। এ কারণেই চার স্ত্রী রাখতে যারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাদের পরিবারে কিন্তু চার মেয়ে জন্ম হলে অশান্তি বিরাজ করে।

যেই মেয়ের জন্মকে আপনি অপছন্দ করে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতাকে উপেক্ষা করে এমআর করানোর জন্য নিজ স্ত্রীকে হাসপাতালের বেডে শুইয়ে দিয়েছেন, সে মেয়ে জন্ম নিয়ে বড় হয়ে কেমন হবে জানেন? সে কিন্তু আপনাকে অর্থাৎ পুরুষকে মনে প্রাণে ভালোবাসবে। এটি নারীর স্বভাব। তাই নারী যে সোসাইটিতে বড় হোক না কেন, সে যতই Educated যতই Liberal এবং Model ও Broad-mind হওয়ার দাবী করুক না কেন, সে যখন একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তখন অন্য নারীকে তার স্বামীর আঙ্গিনায় কখনো মেনে নিতে পারে না। তার সাথে হিংসা করে নিজ স্বামীর একাই মালিকানা দাবী করা তার স্বভাব। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলে তোমাকে বলতে পারছি না তোমার সাথে সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু। তবে শুধু একটুকু মনে রেখো আপনজন হাজার থাকার পরও তোমার কথাই কেবল মনে পড়ে। কি বুঝলেন? আবার অন্যদিকে সে যখন আপনার সন্তান জন্ম দিয়ে মা হয়ে যাবে তখন দেখবেন বাজারে সব কিছু পাওয়া গেলেও কিন্তু আপনার সন্তানের মায়ের মতো জান্নাত পাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, যাই কিছু হোক না কেন ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু মেয়েরাই। আপনাকে এটি মানতেই হবে।

তেমনই এক সুখী ও সুস্থ পরিবারের গল্প শুনুন। একলোক নিজের শততম জন্ম বার্ষিকী পালন করছে। চারপাশে তার নাতী-পুতিরা একত্রিত হয়ে দাদার এমন সুস্থতা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা আপনার এমন সুস্থতার গোপন রহস্য কী একটু জানাবেন? দাদা বললো আমি তোমাদের দাদীকে ৭৫ বছর আগে বিয়ে করেছি। বাসর রাত্রীতে আমরা দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, যে যেদিন ভুল করবে তাকে সেদিন পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, আমার প্রতিদিন ভুল হয়ে যেতো। আর সকালে উঠে আমাকে পাঁচ মাইল হাঁটতে হতো। এটি শুনে নাতিরা এবার জিজ্ঞেস করলো দাদা, দাদীও তো আপনার মত সুস্থ। এর কারণ কী? দাদা বললেন আমি যখন হাঁটতে বের হতাম তোমার দাদী গোপনে আমার পেছনে পেছনে গিয়ে আমি হাঁটছি, না কি কোনো পার্কে গিয়ে কারো সাথে বসে আছি পাহারা দিতো। কি বুঝলেন?

তারপরও সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে, নারীর কোনো ঘর নেই। সত্যিই কি নারীর কোনো ঘর নেই? বলা হয়ে থাকে জন্মের পরে নারী বাপের ঘরে থাকে। বিয়ের পরে স্বামী গৃহে তার অবস্থান। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেদের ঘরে কাটিয়ে দেয় বাকী জীবন। শুনতে খুব ভালো শোনায়। কিন্তু বাস্তবতা কতটুকু? জেনে রাখুন বাস্তবতা হলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তা হলো নারী ছাড়া কোনো ঘর ঘরই হতে পারে না। তাই আমরা দেখে আসছি, যে ঘরে শুধু পুরুষ আর পুরুষ থাকে, সে ঘরে কেউ কখনো যেতে চায় না। তাদের সাথে এলাকার কারো কোনো সম্পর্ক থাকে না। কেউ তাদের কোনো খোঁজও রাখে না। প্রতিবেশীরা তাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না। এখানেই শেষ নয়, তাদের বাসায় আত্মীয়-স্বজনও কখনো আসা-যাওয়া করে না। তারা কোনো ভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

বিবাহিত মেয়েরা যখন মায়ের বাড়ি গিয়ে সবাই একত্রিত হয়, তখন মায়ের বাসায় আনন্দের বন্যা বইতে থাকে। সেখানে চাঁদের হাট বসে। সব বান্ধবীরা পুরো রাত গল্প করে কাটিয়ে দেয়। কখনো নিজের আবার কখনো নিজের স্বামীর গল্প শোনায়। স্বামী তাকে এক মুহূর্ত না দেখলে কেমন অস্থির হয়ে উঠে, সেটি শুনিয়ে হাসাহাসি করে স্বামীর প্রশংসার মাধ্যমে সবাইকে নিজের স্বর্গীয় সুখের কথা জানান দেয়। তাছাড়া মেয়েরা যতক্ষণ পর্যন্ত গোপন কোনো কথা নিজের বান্ধবীকে না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত থেমে থেমে তাদের পেটে ব্যথা উঠে। এ সুযোগে বাচ্চারা নানা-নানীর কাছে এটি খাবে ঐটি খাবে বলে বায়না ধরে।

বিপদ হয় ছোট খালার। সবাই তার কাছে থাকতে চায় এবং তার কাছে ঘুমাতে চায়। ভায়েরা ভাইরাও কিন্তু আদর আপ্যায়নের মাধ্যমে এখানে জেনে নিতে চায় কার দাম বেশী। তবে মায়ের বাসার এমন আনন্দ খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। যখন স্বামী সকালে উঠে বলে, কাল আমার অফিস খোলা তাই আজই আমাদেরকে চলে যেতে হবে। এমন স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর সঙ্গ দেয়া। নিজের প্রয়োজনের কথা তাকে সুন্দর ভাবে বুঝানো। মায়া-মমতার সাথে তার কাছে নিজের চাহিদার কথা বলা। কারণ যে নারী শুধু স্বামীকে পাওয়ার জন্য নিজের মা-বাবাকে ছাড়তে পারে, সে নারী কি আপনার কথা শুনবে না?

পুরুষের প্রশান্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো তার স্ত্রী। তাই শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে মনে রাখতে হবে, আপনার কাছে যদি আপনার মেয়ে, মেয়ের স্বামী ও সন্তান প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে তার দাম্পত্য জীবনে নিজেদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হতে বিরত থাকুন। ছেলের মা-বাবা এবং বউয়ের মা-বাবা সম্পর্কে মন্তব্য করতে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারণ তার মা-বাবা নিজের মেয়েকে নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে সব কিছু দিয়ে থাকে। শুধুমাত্র নিজের মেয়ের সুখ আল্লাহ্‌র পরে তার স্বামীর কাছেই আশা করে। নিজের মেয়ের জন্য একটু ভালোবাসা তার স্বামীর কাছেই চায়। এটি চাওয়া তাদের অধিকার। এটি কোনো দয়া নয়।

তাই ছেলের মা-বাবাকে বলবো, আপনারা এমন সন্তানের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে পারেন, যে সন্তান আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ সন্তানের ব্যাপারে কেন ধৈর্য ধরতে পারেন না যে সন্তান তার স্ত্রীর প্রিয় হয়ে গেছে? এমন করতে না পারলে মনে রাখবেন নিজ রক্তের সম্পর্কের মাঝে যদি দূরত্ব সৃষ্টি হয় তখন নিজেদের খবর অন্যদের মুখে শুনতে হবে। এবার ভেবে দেখুন যারা একা একা থাকে, তাদের বাসাকে বাসা কখন মনে করা হয়? কার কারণে তারা সমাজে পরিচিতি লাভ করে। ইট-বালু এবং সিমেন্টের তৈরী ঘরের মাঝে মায়া-মমতা কে জন্ম দেয়। এখানে হাসি-তামাশা এবং আরাম ও আয়েশের ব্যবস্থা কে করে? এই সম্মান শুধুমাত্র নারীর ভাগ্যেই জোটে। এমন অবদান শুধু নারীই রাখতে পারে। নারীর ছোঁয়া ছাড়া কোনো বাসাকে বাসা বলা যায় না। বাগানের ফুটন্ত গোলাপ বা **'ওয়ারদাহ মাফতুহাহ'** যেমন দর্শনার্থীর চক্ষু শীতল করে তেমনিভাবে ঘরে নারীর অবস্থানও পুরুষের মনে প্রশান্তি দান করে শুধু তাই নয়; নারীর ঘ্রাণও ঘরে সব সময় Air freshener এর কাজ করে। তাই বসবাসের উপযোগী ঘর বানাতে হলে সেখানে নারীকে থাকতেই হবে। নারী ছাড়া ঘর-বাড়ি অসম্পূর্ণ।

মনে রাখবেন, নারীহীন ঘর কখনো ঘর হতে পারে না। তাই নারীর কোনো ঘর নেই বলার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা মনে করি না। বরং পুরুষেরই ঘর থাকার পরও সেই ঘর বসবাসের অনুপযুক্ত। আর তাই সে কোনো মেহমানকে দা'ওয়াতও যেমন দিতে চায় না তেমনি নিজের বাসার পরিচয়ও দিতে পারে না। যেই নারীর জন্মকে আমি আপনি ঘৃণা করছি,

সেই নারীকে রাসূল (স.) স্বামীর খেদমাত করলে সাদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে বলে সু-সংবাদ শুনিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করলে যেমন সাওয়াব পাওয়া যায়,স্বামীর খেদমাত করেও স্ত্রী তেমন সাওয়াব পাবেন বলে পুরুষের খেদমাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমন কি যেই পুরুষ নারীর জন্মকে অপছন্দ করে আসছে, সেই পুরুষকেই বিয়ের মাধ্যমে স্বামী বানিয়ে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলেও সাওয়াব পাবে বলে জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা বাত্‌লে দিয়েছেন। রাসুল (স.) বলেছেন:

(عن كَعْبِ بن عَجْرَة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُخبِرُكُم بِنِسَائِكُم فِي الجَنَّةِ ؟! كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ، إِذَا غَضِبَت أَو أُسِيءَ إِلَيهَا أَو غَضِبَ زَوجُهَا، قَالَت: هَذِه يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغُمضٍ حتّى تَرضَى)[২৯]

'কা'আব বিন 'আজরাহ হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের নারীদের মধ্য হতে কারা জান্নাতে থাকবে, আমি কি তা তোমাদেরকে বলবো না? (তখন তিনি বললেন) প্রত্যেক স্নেহপরায়ণ মা যিনি ঘন ঘন সন্তান জন্ম দেন তিনিও জান্নাতে থাকবেন। যখন তিনি রেগে যান বা তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয় অথবা তার স্বামী তার উপর রাগ করে, তখন তিনি স্বামীকে বলেন তোমার হাতে এটি আমার হাত। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবো না।'

আল্লাহু আকবার! যে নারী একজন পুরুষকে স্বামী বানিয়ে তার প্রশান্তির জন্য এক দুই রাত নয়, সারা জীবন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বলবে **'তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবো না'** তার চেয়ে উত্তম আছে কেউ এই পৃথিবীতে? এরপরও ভাবতে অবাক লাগে, সমাজে পুরুষ নামক কিছু অপদার্থ ও গর্দভ নারীর জন্মকে নিজের জন্য লজ্জা মনে করে। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে যে পুরুষের প্রশান্তি লাভের জন্য সেই পুরুষই তাকে জন্মের আগেই হত্যার পরিকল্পনা করে ভ্রুণ হত্যা চালিয়ে যায়। আর কোনো ভাবে জন্ম নিয়ে ফেললে লজ্জায় মুখ লুকায়। এ ধরনের পুরুষ

২৯- أخرجها النسائي في الكبرى (٣٦١/٥) والطبراني في الكبير (١٤/١٩) والأوسط (٣٠١/٦) (٢٤٢/٢) وأبو نعيم في الحلية (٣٠٣/٤) وقال الشيخ الألباني : إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن خلفا كان اختلط في الآخر ..لكن للحديث شواهد يتقوى بها " السلسلة الصحيحة " (٢٨٧، ٣٣٨٠)

পুরো মানব জাতির কলঙ্ক। নারী নির্যাতন এবং নারীদের সাথে বৈষম্য শুধু জাহেলী যুগের কাহিনী নয়। বর্তমান যুগেও এটি পুরোদমে চলছে। কোথাও থেমে নেই। উপরতলা আর নীচতলা, আমতলা আর জামতলা সব তলারই একই চিত্র। দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে নারীকে। কোথাও পরিবারের নিকটজনদের হাতে নারী লাঠি-সোটার আঘাতে নিজ শরীরের রক্ত ঝরাচ্ছে আবার কোথাও লাথি ও কিল-গুতো খেয়ে নিথর দেহে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকছে। আবার যেখানে এসব হতে নারী নিরাপদ সেখানে ইন্টেল্যাকচুয়াল টর্চারে প্রতিনিয়ত তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ চলছে।

কারণ সেখানে তাকে সকাল সন্ধ্যা শুনতে হচ্ছে, একটি ঈদ চলে গেলো তোমার বাপ-ভাইয়েরা তো আমাদের খবরও নিল না। ফল মূলের ভরা মৌসুম চলছে, আমাদের কথা বাদ দিলাম, তোমার বাপ-ভাইয়েরা তো তোমারও খবর নিল না। বাসায় তো কেউ আসছে না। জানো! আমার কলিগের শ্বশুর বাড়ি হতে গত রামাদ্বানে যে ইফতার এসেছে পুরো মাস তার আর ইফ্তার কিন্তে হয়নি। ক্বোরবাণীর ঈদে তার শ্বশুর গরুর যে রান পাঠিয়েছে সেটি তারা ছয় মাস খেয়েছে। এভাবে নারীকে প্রতি মৌসূম ও উৎসবে শ্বশুর বাড়ির লোক জনের কথা শুনতে হচ্ছে।

তাই বলছিলাম, এযুগেও ভালো ভালো ফ্যামিলি এবং নিজেকে ধার্মিক মনে করে এমন লোকজনও যখন মেয়ে জন্মের কথা শুনে তখন বলে ওঠে, মেয়ে হলো! আগেও তো তার মেয়ে আছে। একটা ছেলে হলে ভালো হতো। ভাবছিলাম এবার একটি ছেলে হবে। এধরনের আরো কত ঈমান বিরোধী কথা! শিক্ষিত হয়েও কু-সংস্কারে ডুবে আছে আজকের মুসলিম সমাজ ও তথাকথিত ধার্মিক পরিবার। যা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এরা সালাতও আদায় করে যাকাতও দেয়। সাউমও পালন করে আবার হাজ্জও আদায় করে এসে সমাজে নিজেকে দ্বীনদার হিসেবে পরিচয় দেয়। এমন মানুষের মাঝে কন্যা সন্তান জন্ম নিয়ে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্যদের কী অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

সম্প্রতিকালের কয়েকটি ঘটনা দেখলেই আমার দাবীর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য কীভাবে নারীদেরকে অপরাধের

কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। উঠতে বসতে স্বামীর পরিবারের কী সব কথা ও বাজে মন্তব্য শুনতে হচ্ছে নারীকে। কারণ সবাই মনে করে ছেলেই হলো পরিবারের সম্পদ, আর মেয়ে হলো বোঝা। মোটকথা, জাহেলী যুগ না হলেও জাহেলী মনোভাব ত্যাগ করে এখনো এরা মানুষ হতে পারেনি। এরা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধম। আল্লাহ্ হয়ত এধরনের লোকদের সম্পর্কেই বলেছেন:

﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾[৩০]

'তারা পশুর মত; বরং তার চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।'

মূলতঃ এর জন্য ইসলামী শিক্ষা এবং সঠিক আক্বীদাহ্র অভাব। ঈমান বিল্লাহ্ এবং ঈমান বিল্ কুফ্রের মাঝে পার্থক্য এখানেই। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কারণেই আজকের মুসলিম পরিবারে নারীর এই দুর্গতি। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে কনডমের জন্য কোনো ট্যাক্স দিতে না হলেও স্যানিটারী ন্যাপকিনের জন্য ১৫% ট্যাক্স দিতে হয়। এভাবে নিজ পরিবারসহ সমাজের চোখে নারী একটি বোঝা বোঝানোর অপচেষ্টা চলছে। ছেলে-মেয়ের মাঝে অর্থনৈতিক ভাবেও ব্যবধান তৈরী করে কন্যাকে সমাজ ও পরিবারের চোখে খরচের খাত দেখানো হচ্ছে। আর তাই কন্যা সন্তানের জন্ম আজকের সমাজে একটি ট্যাবুতে পরিণত হয়েছে। নারীদের ঋতুচক্র একটি স্বাভাবিক ও সহজাত প্রক্রিয়া, এসম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব থাকায় এখানেও নারী বৈষম্যের শিকার।

ভারতের হরিয়ানার সিরসা জেলার একটি গ্রামের এক নারীর তিনটি সন্তানই মেয়ে। চতুর্থ বার তার গর্ভে সন্তান আসার পর তার শাশুড়ি ভাবলো হয়ত এবারও মেয়ে হবে। তাই শাশুড়ি চার বছরের নাতনির যৌনাঙ্গ গরম খুন্তি দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানার মাহবুব নগরে এক মহিলা নিঃসন্তান এক দম্পতিকে তার গর্ভ ভাড়া দিয়েছিলো। আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ পরীক্ষা করে যখন জানা গেলো যে, অনাগত সন্তান মেয়ে তখন সেই দম্পতি সটকে পড়ে।

৩০- সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং-১৭৯

জাহেলী যুগ সম্পর্কে জানার জন্য কিতাব পড়তে হবে না। বর্তমান সমাজ সেই জাহেলী যুগের নতুন সংস্করণ বললে অতিরঞ্জিত হবে না। অতএব আজকের সমাজে নারী সম্পর্কে মানুষের মনোভাব জানার জন্য আরো কোনো উদাহরণ দিতে হবে বলে আমি মনে করি না। অথচ আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স.) কে পাঠিয়ে জাহেলী যুগের সেই বর্বরতা হতে নারীকে উদ্ধার করে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নারীর মর্যাদা ও রক্ষণাবেক্ষনের চিরস্থায়ী পয়গাম শুনিয়েছেন। চলুন হাদীসের ভান্ডারে এসম্পর্কীয় কিছু হাদীস দেখে সমাজে নারীর মর্যাদা রক্ষার্থে রাসূল (স.) মানব সম্প্রদায়কে কী পয়গাম শুনিয়েছেন তা খুঁজে বের করি। জন্ম হতে বিয়ে পর্যন্ত নারীর সার্বিক বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য মেয়ের বাবাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا ـ يَعْنِي اَلذكَرَ ـ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْـجَنَّةَ)[٣١]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন, যার একটি মেয়ে জন্ম হয়েছে, তাকে সে হত্যা করেনি এবং অপমানও করেনি। এমনকি তার ওপর ছেলেকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে তার কন্যার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

এখানেই শেষ নয়, নারী জাতির সম্মান রক্ষার্থে ইসলাম মায়ের অবাধ্য হওয়াকে সন্তানের জন্য হারাম করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنِ المُغِيْرَةَ بنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ، وَمَنْعاً وهاتِ، ووَأْدَ البَنَات)[٣٢]

'মুগীরাহ্ বিন শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ মায়ের অবাধ্যতা, হক্বদারের হক্ব আদায় না করা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন।'

---

[٣١] - رواه أحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ أحمد شاكر..

[٣٢] - رواه البخاري، رقم الحديث:٥٩٧٥

রাসূল (স.) কন্যা সন্তানের লালন-পালনের জন্য তাঁর উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যারা কন্যা সন্তানকে ভালোভাবে লালন-পালন করবে তারা তাঁর সাথে জান্নাতে থাকবে বলে সুসংবাদও শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ) [٣٣]

'আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করলো, সে ক্বিয়ামাতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্রিত থাকবো। তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।'

এমনকি রাসূল (স.) মেয়েদের লালন-পালনের জন্য তাঁর উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন, যারা মেয়েদের পালন করবে মেয়েরা তাদের মা-বাবাদের জন্য (ক্বিয়ামাতের দিন) জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেছেন:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ امرأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لهُ سِترًا مِنَ النَّارِ) [٣٤]

'আয়েশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে একজন মহিলা আসলো এবং তার সাথে দু'টি মেয়েও ছিলো। সে কিছু চাইলো কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমি খেজুরটা তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করলো, সে নিজে কিছু খেলো না, অতঃপর উঠে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটা অবহিত করলাম। তিনি বলেন, যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের

٣٣- رواه مسلم

٣٤- رواه البخاري.

সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'

এখানেই শেষ নয়, রাসূল (স.) শুধু মেয়ের কথা বলেননি। তিনি বোনের পালনের জন্য তাঁর উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দুইটি বা তিনটি মেয়ে অথবা দুইটি বা তিনটি বোনের লালন-পালনকারীরা জান্নাতে তাঁর সাথে থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَالَ ابنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى يَبِنَّ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيْهَا)[৩৫]

'আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা অথবা তিনটি কন্যা, অথবা দু'টি বোন অথবা তিনটি বোনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে, অথবা সে তাদেরকে রেখে মারা যাবে আমি ও সে জান্নাতে এরকম একত্রিত থাকবো। তিনি তাঁর মধ্যমি এবং শাহাদাহ আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন।'

যাদের তিনটি মেয়ে রয়েছে এবং তাদেরকে যারা খাইয়েছে এবং পরিয়েছে তারা (ক্বিয়ামাতের দিন) তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে বলেও ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حجاباً مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ)[৩৬]

'উক্ববাহ ইবনে 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন. যার তিনটি মেয়ে রয়েছে এবং সে ধৈর্য ধরেছে, তাদের ভরণ-পোষণ করেছে এবং তার সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে বস্ত্র পরিধান করিয়েছে তারা (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'

٣٥- رواه ابن ماجه وصححه الألباني .

٣٦- في رواية الترمذي

কোনো কোনো হাদীসে আমরা আরো দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) শুধু কন্যা সন্তানদের লালন-পালনের কথা বলেছেন। তিনি সংখ্যা নির্ধারণ করেননি। অর্থাৎ কন্যা যতই হোক না কেন সবার যত্ন নেয়ার কথা বলেছেন। তাই এক দুই বা তিন জনের লালন-পালন করলেই হবে বাকীদের করতে হবে না বিষয়টি এমন নয়। যার যতটি কন্যা সন্তান জন্ম নেবে সবার সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। যেমনটি আমরা আয়েশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يُحَدِّدِ النَّبِيَّ ﷺ عَدَدًا مِنَ الْبَنَاتِ، فَقَالَ : مَن ابتُلِي بِشَيءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ)[৩৭]

'আয়েশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) মেয়ের কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করেন নি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তিই কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'

মোটকথা, হাদীসে রাসূলে শুধু মানব জীবনে নারীর অধিকার এবং ইয্যাত ও সম্মান রক্ষার কথাই বলা হয়েছে। নারীদের গুরুত্ব অনুধাবন এবং তাদেরকে বাবা ও ভাই যেন বোঝা মনে না করে, তাই রাসূল (স.) এক একবার এক এক ভাবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য তাঁর উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةَ)[৩৮]

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন, অথবা দু'টি মেয়ে অথবা দু'টি বোন রয়েছে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদেরকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করেছেন, তিনি এর বিনিময়ে জান্নাত পাবেন।'

৩৭- رواه البخاري.

৩৮- رواه الترمذي .

আরো আশ্চর্যের বিষয়, আরেক হাদীসে কন্যা সন্তানের লালন-পালনকারী বাবার জন্য জান্নাত ওয়াজিব বলেও রাসূল (স.) ঘোষণা করেছেন। আমরা এই সম্পর্কে হাদীসের ভান্ডারে দেখতে পাই, তিনি বলেছেন:

(عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤَدِّبُهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ: فإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ؟، قَالَ: وإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، قَالَ: فَرأى بَعْضُ القَوْمِ أَنَّ لَوْ قَالَ: وَاحِدَةً، لَقَالَ: وَاحِدَةً)[৩৯]

'জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যার তিনটি মেয়ে রয়েছে তিনি তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। তখন তাকে বলা হলো, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** যদি দু'টি থাকে? রাসূল (স.) বললেন, দু'টি হলেও। তিনি বলেন, উপস্থিত কেউ কেউ মনে করছিলেন যদি একটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো তাহলে রাসূল (স.) অবশ্যই বলতেন একটি হলেও (জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে)।

কন্যা সন্তান তার লালন-পালনকারী বাবাকে এবং বোন তার সাথে ভালো ব্যবহারকারী ভাইকে ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাবে। এটি কারো অভিমত নয়; বরং এ ধরনের অনেকগুলো হাদীস আমরা দেখতে পাই। ঐসব হাদীসে রাসূল (স.) ভাইকেও তার বোনদের লালন-পালন করার জন্য বলেছেন। অতএব বাবা নেই বলে ভাই তার বোনকে ফেলে দিতে বা তার ভরণ-পোষণে অবহেলা করতে পারবে না। নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তার সাধ্যমত বোনের লালন-পালন করতে হবে। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، فيُحْسِنَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)[৪০]

৩৯- رواه أحمد وصححه الألباني.

৪০- رواها الطبراني وصححه الألباني .

'আয়েশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন,আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কেউ নেই, যেই তিনটি কন্যার দায়িত্ব পালন করবে অথবা তিনটি বোনের দায়িত্ব পালন করবে অতঃপর তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারা নিশ্চয়ই (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'

এখানে উল্লেখ্য যে, আরবের (Pagan) বা পৌত্তলিকরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করে ফেলতো বলেই আল্লাহ্ এই সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। ক্বোরআনের সূরা তাকভীরের এই আয়াতটি তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো। সাথে সাথে আবরদের অবস্থা পাল্টে গেলো। ঐ আয়াতটি তাদের চিন্তা-ধারার মধ্যে এক পরিবর্তন সৃষ্টি করলো। পরিণতিতে তারা কন্যা সন্তানের পরিবর্তে তাদের সেই জাহেলী কু-সংস্কারকেই চির দিনের জন্য আরবের মরুভূমিতে দাফন করে ফেললো। কিন্তু হিন্দু ধর্মে এখনও নারীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমাদের দেশের মুসলিম সমাজেও কন্যা সন্তানের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করা হচ্ছে। জীবিত কবর দেয়ার পরিবর্তে পদ্ধতির পরিবর্তন করে সর্ব সম্মতিক্রমে সন্তুষ্টচিত্তে কন্যার জন্মকে মেনে নেয়া হচ্ছে না। তাই স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ তৈরী হয়েছে শুনেই পবিরারের সবার মন খারাপ হচ্ছে। পরিণতিতে স্ত্রী হচ্ছে নির্যাতনের শিকার। কারণ এবারও সে কন্যা সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছে।

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান মেনে নিতে পারে না বলাতে যারা মন খারাপ করছেন তারা শুনুন, ১৯৩৪ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে এমন অনেকগুলো গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে একটিও মেয়ে নেই। ২০০৭ সালের ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী (Fetuses aborting female) সবচেয়ে বেশী। ১৯৮৪ সালের এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, মুম্বের ৮০০০ হাজার ভ্রূণ হত্যার মধ্যে ৭৯৯৯ টি কন্যা সন্তানের ভ্রূণ বা (Foetuses) ছিলো। টেকনোলোজী বা চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন উন্নতি লাভ করেছে। এর আগে কীভাবে এবং কোথায় কার সাহায্যে কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। ভারতে গত বিশ বছরে

দশ মিলিয়ন কন্যা সন্তানকে তাদের মা-বাবারা হত্যা করেছে। অর্থাৎ Abortion এর মাধ্যমে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলেছে।

বিশ্বব্যাপী ২০০০-২০১৪ পর্যন্ত ২৪ মিলিয়ন Female fetuses এর ভ্রূণ নষ্ট করা হয়েছে। এমন ঘটনা পাকিস্তানে প্রায় ১.২ এরও বেশী বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর বাংলাদেশের তথ্য এর কয়েকগুণ বেশী হবে। মোটকথা, সারা বিশ্বে গত ১৫ বছরে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ সৃষ্টি হওয়ার কারণে দৈনিক প্রায় ২১৯ টি ভ্রূণ নষ্ট বা terminate করা হয়েছে। চীন এবং ভারতে সবচেয়ে বেশী Sex-Selective Abortion হয়ে থাকে। আবার এরাই নিজেদেরকে নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা দাবী করে সকাল-সন্ধ্যা ইসলামকে গাল-মন্দ করেই চলছে। আর নির্বোধ নারী! কে তার বন্ধু এবং কে তার শত্রু তা বুঝতে এখনও ভুল করছে।

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস ও আমরা

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টিবোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ছাত্রদের মধ্যে নীতি ও নৈতিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি আরো কিছু বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আসছে। জ্ঞানের ইসলামী করণের উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম ছাত্রদের ঈমান ও আক্বীদায় দৃঢ়তা আনয়নসহ নন মুসলিম ছাত্রদের মাঝেও নিজ নিজ ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে নীতি-নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে অত্যন্ত ব্যয়বহুল Morality Development Program নামক একটি কার্যক্রমও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিজ খরচে মুসলিম-নন মুসলিম সব ছাত্রদেরকে এই প্রোগ্রামের আওতায় এনে সবাইকে নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে দেশের সু-নাগরিক বানিয়ে জাতিকে উপহার দেয়াই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং নিজেদের ঈমানী দায়িত্বও মনে করেছে।

উক্ত প্রোগ্রামের ডিরেক্টর আমার কলিগ ড. প্রফেসর মফিযুর রহমান আল্ আযহারী অনার্স ৫ম সেমিস্টারের সিলেবাস প্রণয়নের সময় **'ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি'** সক্রান্ত একটি লেখা দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। এই লেখাটি তার সেই অনুরোধেরই ফসল। যেহেতু আমার গবেষণা ও চিন্তা-চেতনায় যুগের চাহিদা ও পরিভাষাসহ পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে সেগুলোর প্রভাব ও বর্ণনা থাকে, তাই লেখাটি তৈরী করার পরও তাকে দেইনি। তাছাড়া ছাত্রদের উপযোগী করে লিখতে হলে তা নাতিদীর্ঘ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় ভাষা ও বর্ণনাগত বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সেটি করিনি।

কারণ আমি নিজেকে একজন সমাজ কর্মী মনে করি। সমাজ সংস্কারের বিষয়টি আমার লেখায় ফুটে ওঠে বেশী। ক্বোরআন-সুন্নাহ্ ও বাস্তবতার আলোকে সমাজে ঘটে যাওয়া বিষয়ের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আজকের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করাই আমার গবেষণার বিষয় বস্তু। এখানে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কলম ধরা আমার কাজ নয়।

তাই আমার গবেষণায় কে হারলো কে জিতলো এটি বিবেচ্য বিষয় নয়। আর ছাত্রদের বিষয়গুলো নির্ভর করে সংক্ষেপে লিখে পরীক্ষায় পাশ করা। বিস্তারিত বর্ণনাকে তারা ভয় যেমন পায়, পছন্দও করে কম। তাই তাদের উপযুক্ত এবং পরীক্ষায় পাশ করার মতো করে লেখাটি তৈরী করা হয়নি; বরং সমাজ কর্মীদের চিন্তা ও গবেষণার দ্বার খুলে দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এটি তৈরী করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমার কলিগরা শুধু নয়, বন্ধুরাও আমাকে যে যেখানে পান সেখানেই তাদের Requirement fulfill করার অনুরোধ করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তো প্রতিনিয়ত অনুরোধ করেই চলেছে। আমার প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং প্রকাশিত বইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নতুন বই পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশের ভাষা দেখে অনেক সময় নিজের অজান্তেই চোখের কোণ্ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কারো দাবী হলো স্যার **'বৃদ্ধাশ্রম'** নিয়ে একটি বই লেখা এখন সময়ের দাবী। আমি মনে করি এ বিষয়ে আপনি কলম ধরলে সবাই উপকৃত হবে। আবার কেউ বলেন স্যার, আপনার বই সবাই পড়ে তাই **'সালাত'** নিয়ে যদি একটি বই লিখতেন তাহলে আমাদের সালাত শুদ্ধ ও সুন্দর হতো। সালাত নিয়ে বড় বিব্রতকর অবস্থায় আছি। এক একজন এক একটি বলেন। কোন্টি করবো আর কোন্টি করবো না, কোন্টি সুন্নাহ্ আর কোন্টি গতানুগতিক তা বুঝে উঠতে পারছি না।

আবার অনেকে দেখলেই বলে উঠেন স্যার **'সন্তান'** নিয়ে না লিখলে হবে না। প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের চরিত্র গঠনের ওপর একটি বই আপনাকে লিখতেই হবে। আপনার পাঠক বেশী। সার্কেল বড়। আপনার বইতে সবাই নতুন কিছু পায়। আমার বিশ্বাস আপনি লিখলে সমাজ উপকৃত হবে। তাদের প্রশংসার উত্তরে আমি শুধু **আলহামদু লিল্লাহ্! আলহামদু লিল্লাহ্!** বলতে বলতে নিজেকে কন্ট্রোল করি। আর এ সব দাবী এবং বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে **ইন্ শা আল্লাহ্! ইন্শা আল্লাহ!** বলে তাদের আগ্রহের গভীরতা বোঝার চেষ্টা করি।

ভার্সিটিতে চলতে ফিরতে যে যেখানে আমাকে দেখেন সবার একই কথা স্যার আপনার সম্প্রতি প্রকাশিত বইটি চমৎকার লেগেছে। পরবর্তী বই কখন আসছে? অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু ব্যস্ততা ও সময়ের অভাবে

তাদের মূল্যবান আহবানে সময় মত সাড়া দিতে পারি না। তবে সবার অনুরোধ যে বর্তমান সময়ের চাহিদা তা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুভব করি।

কারণ মানব সমাজের এমন কিছু বিষয় এবং ধারণা সব সময় মানসপটে ভেসে উঠে যা নিয়ে ভাবতে এবং বুঝতে সমাজের ছোট বড় সবার মাঝে আগ্রহ জাগে। তাছাড়া সমাজের এমনও কিছু বিষয় আছে যা বোঝার জন্য কোনো শিক্ষার বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। সেগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো **'সভ্যতা'**। এটি সর্বস্তরের মানব ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখে। সভ্যতা বলতে রাষ্ট্র ও সমাজের নীতি ও নৈতিকতাসহ অর্থনৈতিক উন্নতিও বোঝায়। একটি দেশ ও জাতির সভ্যতা সে দেশের গণজাগরণে যেমন অবদান রাখে তেমনি রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেও উন্নয়নের এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। তাই বর্তমান বিশ্বের সব জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব একটি সভ্যতা রয়েছে। এসব সভ্যতা শুধু একটি জাতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেনা; বরং একটি রাষ্ট্রও বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিতি লাভ করে। অনুরূপ মুসলিম উম্মাহ্‌রও একটি সভ্যতা রয়েছে। সেই সভ্যতা শুধু মুসলমানদের জীবনে প্রভাব ফেলেনি; বরং অনেকাংশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও সেই সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

ইসলামী সভ্যতা ঃ

পৃথিবীর সূচনালগ্নেই সভ্যতা বা Civilization এর জন্ম হয়েছে। আর জন্মের পর হতেই সভ্যতার উত্থান-পতন শুরু হয়েছে। তাই সেদিনের সভ্যতা আজকের ইতিহাস। আজকের সভ্যতা আগামী দিনের ইতিহাস। অতঃপর যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষদের আগমন ও সাধনাসহ সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই সকল সভ্যতার আগমন ও প্রস্থান ঘটেছে। মোটকথা, সভ্যতা বলতেই দেশ ও জাতির রুচি এবং বিবেক বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। এসব কারণেই Old Greek Civilization হতে Western Civilization পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় প্রায় একশটি প্রসিদ্ধ সভ্যতার খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা ঐ সব সভ্যতা হতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম একটি সভ্যতা। কারণ পৃথিবীর সকল সভ্যতার জন্ম রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে হলেও কিন্তু Western Civilization এর জন্ম হয়েছে Scientific & Industrial revolution বা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প

বিপ্লবের মাধ্যমে। অতএব সকল সভ্যতার জন্মদাতা রাষ্ট্রপ্রধানরা হলেও এই সভ্যতার জন্মদাতারা হলেন শুধুমাত্র Scientists বা বিজ্ঞানীরা।

ইতিহাসের পাতায় অতীত বর্তমান সমৃদ্ধতম যত সভ্যতা বা Civilization এর অস্তিত্ব রয়েছে তার একটি হলো **ইসলামী সভ্যতা**। ইসলামী সভ্যতার মূল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এটি একমাত্র ইসলামী রীতি-নীতির ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে এর শেকড় গিয়ে মিশেছে। এই সভ্যতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানব ও মানবতার সেবা। ইসলামী সভ্যতা নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে মানব বিশ্বকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার রাস্তা দেখিয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আইনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ইসলামী সভ্যতা সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের দ্বীন ও দুন্‌ইয়ার সকল বিষয়ে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। ইসলামী সভ্যতার প্রতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার দুর্বলতা লক্ষণীয়।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী সভ্যতার একদিকে যেমন রয়েছে একটি আসমানী সনদ অন্যদিকে রয়েছে তার অতি প্রাচীন একটি ইতিহাস। অতএব এই সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং বৈধতার জন্য এটিই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। পৃথিবীর সকল প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার মাঝে এটিই একমাত্র শক্তিশালী সভ্যতা এবং মানব জীবনের সকল বাঁকে ও মোড়ে গঠনমূলক এবং যুক্তিযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মাঝে সাম্যের গান গেয়ে তার প্রতিফলন ঘটায় সকাল-বিকাল। এখানে কোনো ব্যবধান নেই। কারণ এটি উৎপন্ন হয়েছে ইসলামের আঙ্গিনায়। যার মূল সোর্সই হলো ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌। আর ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌ হলো মানব জীবনের জন্য একটি Complete code of life।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে মানব সমাজে ইসলামী সভ্যতার বিস্তার শুরু হয়েছে। ইসলাম যখন যে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে সেখানে ইসলামী সভ্যতাও একই গতি ও পথে পৌঁছেছে। এই একটি কারণেই ইসলামের দা'ওয়াতের সাথে সাথে সভ্যতার দা'ওয়াতও সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে। বিশেষ

করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নেতৃত্বে মাদীনায় যখন মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মাদীনাহ্কে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করা হয় তখন থেকেই ইসলামী সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে এই সভ্যতার শেকড়ও মানব সমাজে ও মননে গভীর হতে গভীরতম হতে থাকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস এখন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার মত একটি গৌরবান্বিত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অতএব ইসলামী সভ্যতা ছাড়া মানব সভ্যতাই অর্থহীন। কারণ এই সভ্যতার শুরু আদম (আ.) হতে, আর পূর্ণতা লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মাধ্যমে। এখন তাঁর উম্মাতের কাজ হলো, রাসূলের দেখানো মতে ও পথে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি জীবন হতে পারিবারিক জীবন, পারিবারিক জীবন হতে সামাজিক জীবন এবং সামাজিক জীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী সভ্যতার উত্থান ধীরে ধীরে হয়নি। প্রথম দিনই ইসলামী সভ্যতা পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনের গুরুত্ব অনুধান করে মানুষকে যুল্ম অত্যাচার পরিহারের মাধ্যমে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছে। মানব সমাজে ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল মযলুম ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়েছে। যেমনটি আমরা রাবঈ ইবনে 'আমের এর কণ্ঠে পারস্যের সম্রাট রুস্তমের দরবারে শুনতে পেয়েছি। গর্জে উঠে তিনি বলেছিলেন:

(اللهُ ابتعَثَنا لنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ من عبَادَة العبَاد إلى عبَادَة الله وَحْدَه، ومنْ ضيْق الدُنْيا إلى سعَتها، ومنْ جَوْر الأدْيَان إلى عَدْل الإسْلَام)[٤١]

'আল্লাহ মানুষকে মানুষের গোলামী হতে এক আল্লাহ্র গোলামীর দিকে ও দুন্ইয়ার সংকীর্ণতা হতে তার প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মীয় অত্যাচার হতে ইসলামের সাম্যের দিকে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।'

---

[٤١] - البداية والنهاية، ج/٧ ص: ٣٩-٤٠

এভাবে ইসলামী সভ্যতার পতাকাবাহীরা অবিচার ও অত্যাচারের হাতকে প্রকাশ্যে রুখে দিয়েছেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অন্যরা জেগে ওঠার ভয়ে গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দীরা খুব সতর্কতার সাথে চুপে চুপে পা রেখে চলে। এটি তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যালিমের বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ তুলে যে জাতি কখনো এক হতে পারে না সেই জাতির অযোগ্য নেতার নেতৃত্বই হলো তাদের শাস্তি। এ কারণেই ইসলামী সভ্যতার যেখানেই প্রসার ঘটেছে আগ্রাসী শক্তির সকল অপশক্তি সেখানেই বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার আলো যেখানেই প্রসারিত হয়েছে সেখানেই অন্ধকার দূর হয়েছে। মানব সমাজ ও পরিবেশ হয়েছে উজ্জল ও নিষ্কলুষ। পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী সকল অপশক্তির আগ্রাসী মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ইসলামী সভ্যতা যালিমদের যুল্‌ম ও শ্রেণী বৈষম্য হতে নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষকে রক্ষা করেছে।

এখানে আমরা হলফ করে বলতে পারি, সত্যিকার ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অবিচার ও অত্যাচার চিরতরে অপসৃত। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ পৃথিবীব্যাপী এই সভ্যতার পতাকাবাহী মুসলমানদেরকে যুলম অত্যাচারের টার্গেট করে তাদের রক্তের হোলি খেলা শুরু হয়েছে। তবে এটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহাবাদের সাথেও এমন করা হয়েছিলো। পার্থক্য হলো তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে দা'ওয়াতের কাজ করার কারণে আর আমাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে দা'ওয়াতের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণে। তাই কোনো এক আরব মনীষী যথার্থই বলেছেন:

نَحْنُ قومٌ أعَزَّنا اللهُ بالإسْلَام

فَمَهْمَا ابتَغَيْنَا الْعزَّة في غَيْره أذَلَّنا اللهُ

'আমরা এমন এক জাতি ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর যখনই আমরা ইসলাম ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র ইয্যাত খুঁজেছি তখনই আল্লাহ্ আমাদেরকে অপমান করেছেন।'

তাই বলছিলাম, আজকের মুসলিম উম্মাহ্‌র যুব সমাজ বড় ব্যস্ত সময় পার করছে। তারা সারাক্ষণ মোবাইলের উপর পড়ে আছে, আর মোবাইল পড়ে আছে চার্জের উপর। তারা আজ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে এত বেশী সজাগ সময়

পার করছে যে, মোবাইল বালিশের নীচে গভীর রাতে ভাইব্রেশনে থাকলেও টের পায়। আর লাউড স্পীকারে মহল্লা কাঁপিয়ে মুয়ায্যিন দিনে-দুপুরে আযান দিলেও তাদের কানে যায় না। অথচ আযান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুমধুর ধ্বনি। যে ধ্বনি পৃথিবীতে এক সেকেন্ডের জন্যও বন্ধ নেই। এক জায়গায় শেষ হলে আরেক জায়গায় শুরু। সূর্যের মত, এক জায়গায় ডুবলে আরেক জায়গায় উদিত হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবন এমন এক আযানের মাধ্যমে শুরু হয়, যে আযানের সালাত নেই। আবার সেই জীবন এমন এক সালাতের মাধ্যমে গিয়ে শেষ হয়, যেই সালাতের আযান নেই। এমন একটি সত্য ও বাস্তব ঘটনা প্রতিনিয়ত দেখার পরও আমরা সতর্ক হচ্ছি না। এরপরও বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্‌র নির্যাতনের কারণ জানার জন্য বাটিচালা দিতে হবে?

কারণ জানার জন্য কোনো কিছু না করে শুধু বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন তারা আসল ক্বোরবাণী ভুলে গিয়ে নকল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইসলামের নকলকে আসল আর আসলকে নকল বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অথচ আসল ক্বোরবাণী ছিলো বাপ-বেটা অর্থাৎ ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর সংলাপ। দুম্বা ক্বোরবাণী তো ছিলো শুধু সেই সংলাপের ফলাফল। দুঃখের বিষয় হলো, সেই দুম্বার কথা আজ উম্মাতের মনে আছে, কিন্তু পিতা-পুত্রের সংলাপ ভুলে গেছে। অতএব কেউ যদি আমাদের এই অবস্থা দেখে বলে তোমরা গোস্ত খাওয়ার মুসলমান, তা হলে মাইন্ড করার কী আছে?

তাই বলছিলাম, ন্যায় ইনসাফ হলো ইসলামী সভ্যতার মূল স্তম্ভ। মূলতঃ মানব সভ্যতার এটিই সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং মৌলিক উপাদান। যেই উপাদান সম্পর্কে ইসলামের আগমনের পূর্বে মানব সমাজ ছিলো গভীর এক অন্ধকারে। যুল্‌ম অত্যাচার ছিলো তাদের নিত্য সঙ্গি। তবে বিশৃঙ্খলার মাঝে কখনো কোনো সভ্যতা ও জাতি টিকে থাকতে পারে না এই সত্যটি মানব সমাজকে ইসলামী সভ্যতাই শিখিয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদাহ্‌র যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের যেমন বিস্তৃতি ঘটেছে তেমনি ইসলামী সভ্যতাও বিস্তৃতি লাভ করেছে। এভাবে ইসলামী মূল্যবোধের অনুভূতি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। এটিই ইসলামী সভ্যতার মেরুদন্ড।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাঁদের যুগে ন্যায় বিচার এবং আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র আইন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এখন কেন হচ্ছে না জানেন? শোনে ছিলাম পৃথিবীর পুরো যমীন আল্লাহ্‌র। অথচ দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে যত যালিম আছে সবাই শক্তির বাহাদুরী দেখিয়ে আল্লাহ্‌র সেই যমীনকে নিজের যমীন দাবী করে সেখানের অধিবাসীদেরকে গোলাম বানিয়ে মানব রচিত মতবাদ দিয়ে তাদের টুটিচেপে ধরে রেখেছে। তাই একজন ফাক্বীর যখন নিজের ঘর বাঁধার জন্য একখন্ড যমীন খুঁজতে লাগলো, তখন সে জানতে পারলো কোথাও এক ইঞ্চি যমীনও নেই, যেখানে কারো না কারো সাইবোর্ড নেই। ফাক্বীর কোথাও এমন বোর্ড দেখতে পেলো না, যেখানে লেখা রয়েছে, এটি আল্লাহ্‌র যমীন। যার ইচ্ছা সে এখানে ঘর বানিয়ে থাকতে পারবে।

অতঃপর উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের যুগ আসলো। তারাও ইসলামী সভ্যতার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করলো। সাথে সাথে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানেও বিশেষ অবদান রাখলো। ইসলামী সভ্যতার পাশাপাশি তারা তাদের শাসনামলে বৈজ্ঞানিক সভ্যতারও বীজ বপন করলো। তবে তাদের আন্তরিকতাও বিচক্ষণতা এবং একনিষ্ঠতার কারণে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা কখনো ইসলামী সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। না সেই যুগে না এই যুগে, কোনো যুগেই এমন দেখা যায়নি। আর তাই আব্বাসীয়দের সোনালী যুগ হতেই বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক বিপ্লব শুরু হওয়ার সূবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো। মোটকথা, আব্বাসীয় যুগে বিজ্ঞানের সাফল্য চোখে পড়ার মত ছিলো। সেই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেমন বহু শাখা প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছিলো ঠিক অনুরূপভাবে বহু বিজ্ঞানীরও আবির্ভাব ঘটেছিলো তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং সাহায্য সহযোগিতায়।

আব্বাসীয় যুগে যত্রতত্র নির্মাণ শিল্প ও কলা-কৌশলেরও বিকাশ ঘটেছে। আর এভাবে স্থাপত্য শৈলীর মাধ্যমেও ইসলামী সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে। বিশেষ করে উমাইয়া এবং আন্দলুসীয়দের নির্মাণ শিল্পের সৃজনশীলতার জন্য ইসলামী সভ্যতা বিশ্বের সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে শুধু তাই নয়, এসব Art sculpture এবং ক্যালিগ্রাফির অনুকরণও হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজও বর্তমান সৃজনশীল বিশ্ব তাদের শিল্পকলা, স্থাপত্যকর্ম এবং ক্যালিগ্রাফির অনুকরণ করে

আধুনিকতার ছাপ রেখে চলেছে। তাই আমরা বলতে পারি, ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য যেসব সভ্যতাকে টেকসই ও সত্যিকারের সভ্যতা বলে মেনে নিতে হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইসলামী সভ্যতা বা মুসলিম সভ্যতা। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, ইসলামী সভ্যতার বর্ণনা ছাড়া এই চ্যাপ্টারটি অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। আমার এমন দাবীর কারণে হয়ত কেউ কেউ আমাকে কট্টরপন্থী বলে গাল-মন্দ করে অপরাধী সাজিয়ে আমার চিন্তা-চেতনায় মৌলবাদের গন্ধ খুঁজে বের করার অপচেষ্টাও চালাবে। আর ইসলামী সভ্যতা বলতে কিছু নেই বললে তো আমার ঘরের লোকরাই মুহূর্তের মধ্যে আমাকে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের দালাল বানিয়ে ছাড়বে। কারণ এখন যখন তখন মানুষ যাকে তাকে নিজের মতের অমিল হলেই ফেসবুকের বদান্যতায় যাচ্ছে-তাই অতি সহজে বানিয়ে ফেলতে পারে।

এটি আমার দাবী নয়, এটিই বাস্তবতা। তাই আমরা দেখতে পাই আপনি চোখের সমস্যার কথা ইঞ্জিনিয়ারকে জানালে তিনি বলবেন, আমি ডাক্তার নই আপনি চোখের ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারের কাছে গিয়ে কোনো একটি আইন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলবেন ভাই আমি উকিল নই। ভালো একজন উকিলের সাথে দেখা করুন। কিন্তু যখন দ্বীন ও শারী'য়াত সম্পর্কে কোনো বিষয় আপনার জানার দরকার হয়, তখন যে কেউ ফাত্ওয়া দিতে থাকে। তখন কিন্তু কেউ বলে না, ভাই আমি আলেম নই। আপনি একজন আলেম এবং শারী'য়াতে বিশেষজ্ঞের কাছে যান।

তাই বিষয়টি খুবই নাযুক বা ভঙ্গুর। বহু সাবধানতা অবলম্বনের পরও এ বিষয়ে আমার গবেষণায় খুঁজে পাওয়া তথ্যগুলোকে অত্যন্ত আমানাতদারীর সাথে পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। সম্মানিত ওলামায়ে ইসলামের সমীপে সবিনয় আরজ করছি যে, বিষয়টি যেহেতু একটি এখতেলাফপূর্ণ বিষয়, সেহেতু সবাই হয়ত আমার সব আলোচনায় একমত নাও হতে পারেন। এই সুযোগটিও আমাদেরকে শারী'য়াত দিয়েছে। অতএব আমার কোনো বক্তব্য কারো কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হলে এখানে উত্তেজিত হয়ে **আলাফী ও সালাফী, হাদাসী ও লা-মাযহাবী, দেওবন্দী ও বেরলভী, সুন্নী ও বিদ্'আতী, সরকারী ও দরকারী, আলীয়া ও খালীয়া, দালাল ও এজেন্ট** পরিশেষে **শিয়া ও মাদখালী** বলে গালি দিয়ে নিজের যোগ্যতা বা ইসলামী সভ্যতার নিজেকে একজন খাঁটি প্রেমিক

প্রকাশ করা বা আমার ওপর ক্ষোভ মিটানোর প্রয়োজন নেই। দলীল বিহীন মানুষরা সব সময় গালি দিয়ে জিতে যেতে চায়। হ্যাঁ, আমার চিন্তা-ধারার সাথে দ্বিমত অবশ্যই করা যেতে পারে। কারণ 'ইলমের আরেক নাম হলো **ইখ্‌তেলাফ**। ইখ্‌তেলাফই 'ইলম বৃদ্ধি করে। মানুষের মাঝে প্রশস্ততা সৃষ্টি করে। তাই আমি মনে করি, যে দিন ইখ্‌তেলাফ উঠে যাবে সে দিন জ্ঞানের মধ্যে স্থবিরতা সৃষ্টি হবে। মানুষের মাঝে সংকীর্ণতা জন্ম নেবে। অতএব ইখ্‌তেলাফ শেষ করার পরিবর্তে ইখ্‌তেলাফের পদ্ধতিকে ভব্যতার চাদরে মুড়িয়ে চালু করা প্রয়োজন।

এর বিপরীত হলে মনে রাখবেন, এমন পন্থা অবলম্বনে আমরা সবাই অন্য ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিতে ফেরকাবাজ মুসলমান বলেই শুধু পরিচিতি লাভ করবো। আর অন্য মুসলমানকে কাফের মনে করে নিজেদের মধ্যে ফিত্‌না-ফাসাদের জন্ম দিয়ে যাবো। এ ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে কাফেররাসহ ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি কিন্তু আমাদের সবাইকে মুসলমান মনে করে সময় মত সবার মুলোৎপাটনের পুরো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যখন যাকে যেভাবে শায়েস্তা করার প্রয়োজন মনে হবে তখন তাকে ঠিকই সেভাবে শায়েস্তা করবে। কাউকে সনদের মান দিয়ে, চাকুরির লোভ দেখিয়ে, আর কাউকে জঙ্গিবাদের লেবেল লাগিয়ে অথবা মানবতা বিরোধী বলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কিস্‌সা খতম মনে করবে। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এটি যে কেউ খুব সহজেই বুঝতে পারে। অতএব কোনো আলেম বা ইসলামী আন্দোলনের কোনো কর্মীর ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির যুল্‌ম অত্যাচার হতে নিজেকে নিরাপদ ভাবার কোনো সুযোগ নেই। বায়তুল্লাহ্‌র আঙ্গিনা ও কা'বাতুল্লার মিম্বার হতে শুরু হয়ে তুর্কির সাউদী কনস্যুলেট পর্যন্ত পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাস তা-ই বলে।

তাই নিজেদের মধ্যে **ইখ্‌তেলাফি মাসায়েল** নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি শুধু ইসলামেরই ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি। আমাদেরকে বুঝতে হবে **ইখ্‌তেলাফ** বা অমিল ও মতানৈক্য, **তান্‌ক্বীদ** বা সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ, **তাযলীল** বা লাঞ্ছিতকরণ ও অবনতকরণ এই তিনটি জিনিস তিন মেরুর। ইখ্‌তেলাফ যে কেউ করতে পারে, তানক্বীদ করার অধিকার

সবার নেই, এবং তাযলীল করার হক্ব কারো নেই। তাই কারো সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আমাদেরকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে, আমার এই মন্তব্য কোন্ পর্যায়ের? তাছাড়া আমাদেরকে আরো মনে রাখতে হবে ইখ্তেলাফ হবে **নায্রিয়্যাত** বা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে **শাখ্ইছিয়্যাত** বা ব্যক্তিত্বের সাথে নয়। আর নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে হবে দলীলের মাধ্যমে। তাযলীল বা অপমান ও অপদস্থের মাধ্যমে নয়। আরো একটি কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তানক্বীদ করার জন্য ইল্ম বা জ্ঞান বিশেষ করে ক্বোরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। সমালোচনা করার জন্য জাহালাত বা অজ্ঞতা ও মূর্খতাই যথেষ্ট।

বাস্তবতার আলোকে আমি ইতিহাসের পাতা উল্টানোর পর যেখানে গিয়ে থেমে পড়েছি,সেখান হতেই কথাটি শুরু করতে চাই, তাহলো ইসলামী সভ্যতা বা মুসলিম সভ্যতা বলতে ইসলামের ইতিহাসে কিছুই পাওয়া যায়নি। আজ যেগুলোকে ইসলামী সভ্যতা বলে দাবী করা হচ্ছে সেগুলো মূলতঃ গ্রিক ও রোমান সভ্যতার বিস্তৃতি বা সম্প্রসারণ। একজন ইসলামিক স্কলার একথাটিকে এভাবে বলেছেন:

What is called Islamic civilization was in fact a modified version of Greco-Roman civilization.

সভ্যতা বুঝানোর জন্য ইংরেজিতে যেমন Civilization শব্দ ব্যবহার হচ্ছে তেমনিভাবে আরব বিশ্বে আধুনিক আরবীতে (اَلْحَضَارَةُ) আল্ হাদ্বারাহ শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু অবাক কান্ড হলো, ইসলামের মূল দু'টি সোর্স অর্থাৎ ক্বোরআন ও সুন্নাহ্র কোথাও এই শব্দটি ব্যবহার হয়নি। এই দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি ক্বোরআন ও হাদীসে ইসলামী সভ্যতা বলতে কিছুই নেই।আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন বা পূর্ববর্তী আলেম ও ইসলামী গবেষকদের গবেষণার ভান্ডারেও এই বিষয়ের ওপর লিখিত কোনো কিতাব কোনো ভাষায়ই পাওয়া যায় না।

অতএব (اَلْحَضَارَةُ الإسلامية) বা ইসলামী সভ্যতা নামক পরিভাষাটি গত শতাব্দির ইসলামিক স্কলারদের একটি নব আবিষ্কার বলাটা অযৌক্তিক হবে না। আল্ ক্বোরআনের সূরা তাওবাহ্র আয়াত নম্বর ত্রিশ এ উল্লেখিত শব্দ (اَلْمُضَاهَاةُ) 'আল্ মুদ্বাহা' বা 'সদৃশ ও সমকক্ষ' শব্দ হতে নেয়া হয়েছে বলে

এযুগের ইসলামিক স্কলারদের ধারণা। ইসলামী সভ্যতা নিয়ে আরো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আপনি কোনো ভাবেই ইসলামের ইতিহাসে এমন ধারণা খুঁজে পাবেন না। তবে হ্যাঁ ইসলামের ইতিহাসে সহযোগী সভ্যতা বা Supporting Civilization এর ধারণা অবশ্যই পাবেন। এই ধারণাটি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডার হতে নেয়া যেতে পারে বলে ইসলামিক স্কলাররা মত ব্যক্ত করেছেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بِقَوْمٍ لَا خَلَاقَ لَـهُمْ) (وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ)[٤٢]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ অনেক সময় চরিত্রহীন জাতিকে দিয়ে দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন। এবং আল্লাহ্ অনেক সময় ফাসেক বা পাপাসক্ত, ফাজের বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মাধ্যমেও দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন।'

উল্লেখিত হাদীসটি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে পরিপূর্ণ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তারপরও যদি এযুগের মুসলমান এটি বুঝতে সক্ষম না হয় তাহলে মনে করতে হবে, এর মূল কারণ হলো শুধুমাত্র Nomenclature বা পরিভাষার পার্থক্য। অর্থাৎ রাসূল (স.) উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি খ্রিষ্টীয় ৭ম শতকের ভাষায় করেছিলেন। আজ এটি আমাদের যুগের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাষাগত এই পার্থক্য বুঝতে পারলে অবশ্যই বুঝা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর যুগে যে জিনিসটি ভবিষ্যতের সীগা বা রূপ মনে করা হয়েছিলো এখন বর্তমানের ঘটনা হিসেবে সেই রূপাটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আল্লাহ্র রাসূলের এই কথাটি ছিলো একটি ভবিষ্যদ্বাণী। যা তিনি সপ্তম শতাব্দীতে করেছিলেন। এরপর মানব সমাজের প্রায় চৌদ্দশত বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়টি আমাদের বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট যে, তিনি যা বলেছিলেন তার ষোলআনাই পূরণ হয়েছে। এখন

٤٢- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: 3062، أخرج الإمام أحمد في المُسند (٢٠٤٥٤) والطبراني من طريق حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، فِي آخَرِينَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللهَ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ."

প্রয়োজন শুধু বিষয়টি বুঝে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে কর্মসুচি প্রণয়ন করা। অর্থাৎ ফাসেক ও ফাজিররা যে সব আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করছে সেগুলো ক্বোরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে বাস্তবতা খুঁজে বের করে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরার কাজে ঐ সব প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টি পাঠকদের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য আমি এখানে কিছু উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আল্লাহ্‌র রাসূলের ওপর যে ক্বোরআন নাযিল হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে:

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾[৪৩]

'আকাশ ও যমীনের মধ্যে কোনো অণু পরিমাণ বস্তুও এমন নেই এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোনো জিনিসও নেই, যা তোমাদের রাব্বের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।'

উপরোক্ত আয়াতটি সপ্তম শতাব্দীতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ওপর নাযিল হয়েছিলো। তখনও মানুষরা শুধু জানতো পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট জিনিস হলো অণু। কিন্তু ১৯১১ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী Ernest Rutherford গবেষণা করে বের করেছেন যে, পৃথিবীতে অণুর চেয়েও আরো ছোট একটি জিনিস রয়েছে। বিশ্ব সেটিকে এখন sub-atomic particle হিসেবে জানতে পারছে।

আমাদেরকে এখানে মনে রাখতে হবে, ইসলামী সভ্যতা এবং সভ্যতার সহযোগিতার বিষয়টি খুব বেশী সহজ নয়। এটি সরাসরি মানুষের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। ইসলামী সভ্যতার ধারণা আগেকার যুগে ছিলো না। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এটি এখন বর্তমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সবার কাছে বিবেচিত শুধু তাই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহ্‌র গর্বের বিষয়ও মনে করা হচ্ছে। আমরা মনে করি বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য দা'ওয়াতের

৪৩- সূরাতু ইউনুছ, আয়াত নং- ৬১

উপযোগী হলো পশ্চিমা সভ্যতার উত্থান। কারণ এই উত্থানের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের সত্যতা প্রমাণ এবং মুসলিম উম্মাহ্ নিজেকে এই পৃথিবীতে **'খায়রু উম্মাহ'** বা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উপস্থাপনের পুনরায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে তিক্ত হলেও সত্য, আমরা আমাদের সভ্যতার মর্ম এবং ধর্মের গুরুত্ব ও মূল্য বুঝতে না পারলেও অমুসলিমরা অবশ্যই বুঝতে পারছে। হয়ত এই কারণেই আজকের পশ্চিমা জগতের নারী-পুরুষ ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার সত্যতা উপলব্দি করে ইসলামের ঝান্ডা তলে দলে দলে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। আর যারা অপদার্থ তারা এই নি'য়ামাতটির গুরুত্ব না বোঝে প্রতিনিয়ত শুধু গুনাহের সাগরে ডুবেই যাচ্ছে না; বরং অতীতের গুনাহও প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেও লজ্জা করছে না। এসব দেখে অমুসলিমরা লজ্জায় মুখ লুকাচ্ছে। কারণ **খায়রা উম্মাতিনের** এক কন্যা আধুনিক প্রযুক্তির এই প্রচার মাধ্যমকে দা'ওয়াতের কাজে ব্যবহার না করে উল্টো তার ফেসবুকে লিখছে ' **.....কিশোর বয়সে কতই না হেঁটেছি এই পথে। বই কিনে যাওয়ার পথে মার্কেটের দোতলায় চলে যেতাম। গান রেকর্ড করতে। তখন তো আর ইউটিউব ছিল না। ভারতীয় বাংলা গান, কখনো জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার গান। শহরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতাম.....।'**

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে বয়সের একটি মেয়ের প্রতি সমাজের বাদাইম্মারা অলি-গলিতে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত কাকের মত চেয়ে থেকে চোখের তৃপ্তি মেটায়, এবং শরীরে শিহরণ জাগায় সে বয়সে **খায়রা উম্মাতিন** এর এই কন্যা আগুনের মধ্যে পেট্রোল ঢেলে দেয়ার মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে যে গুনাহ্ করেছে সেই গুনাহের কথা তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে **ফাসাদবুকের** কাছে সোপর্দ করে প্রকাশ্যে দুন্ইয়াবাসীকে জানান দিয়ে সে মডার্ন সাজছে। অর্থাৎ সে দিনের গুনাহের কথা কেউ না জানলেও আজ সবাই জানছে। এরাই আবার ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে নিজ স্টুডেন্টের মাঝে মোরালিটি এন্ড কোয়ালিটি সৃষ্টির শপথ করে আখেরাতে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে বলে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে!

তবে ভাবনার বিষয় হলো, মোরালিটি সৃষ্টির কারিগরের চরিত্র যদি এই হয়, তা হলে তার অনুগতদের কী হতে পারে? শিষ্যদের মাঝে কোন্ জাতের

মোরালিটি সৃষ্টি হবে তা জানার জন্য কি কিতাব দেখতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আমার কলমে আর আসছে না। কালী শুকিয়ে গেল। আকাশ-বাতাস হু হু করে কেঁদে উঠছে বলে এখানেই থেমে গেলাম। বিচার বুদ্ধি ও বিবেচনার এহেন ইন্‌হেত্বাত্ব বা অধঃপতনে নদ-নদীও শুকিয়ে যায়। বিবেকহীন স্ট্যাটাস বা এক গুঁয়েমির কারণে এধরনের নব্য ইসলামিষ্টদের টাইম লাইন এমনই অপ্রকাশিত অনেক কথায় ভরপুর। প্রতিটি স্ট্যাটাস অতীত জীবনের অনেক দুর্গন্ধ মিশ্রিত এবং বর্তমান সময়ে অন্তরে লালিত চিন্তা-চেতনার আয়না বললে ভুল হবে না। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে:

(كُلُّ إِنَاء بِمَا فِيْه يَنْضَحُ)[৪৪]

'পাত্রে যা থাকে তাই নির্গত হয়।'

আমার উপরোক্ত দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য নিম্নে আরো একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। এক বোন একবার তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখলো '২২ শে শ্রাবণ আসলেই মা বলতেন রবীন্দ্রনাথ মারা গেছে গো এই শাওন মাসে। এই দিনটি তাই খুব চেনা চেনা লাগছে। ছোট গল্প, গান, কবিতা উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং চিত্রশিল্পী, সাহিত্যের সব শাখায় ছিল দীপ্ত পদচারণা। একজন সফল Polymath সেজন্য নয়, কবিগুরুকে ভালোবাসি তার একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসের জন্য। শুধু বিশ্বাস নয়, স্রষ্টা প্রেমে বিগলিত চিত্ত বরাবরই আমাকে টানে। টি এস মুর বলেছেন: ah you see, he is absorbed in God.'

'২২ শে শ্রাবণ আসলেই মা বলতেন রবীন্দ্রনাথ মারা গেছে গো এই শাওন মাসে। এই দিনটি তাই খুব চেনা চেনা লাগছে।' পাঠক লক্ষ্য করলে একথাটির মধ্যে একজন অমুসলিমের মৃত্যুতে লেখকের মনের ব্যথার গভীরতা বুঝতে পারবেন। এমন ভাষা প্রকাশে মনের ব্যথা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাই রবিঠাকুরের মরে যাওয়াতে এধরনের লোকদের ব্যথার গভীরতা না বলে শুধু এই টুকুই বলছি, এই হলো **খাইরা উম্মাতিন** উপাধি প্রাপ্ত বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা। যারা নিজেরা ধর্ম-কর্ম করে এবং প্রচন্ড রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান বলে যেমন প্রচার করে তেমনি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের খাদেম হয়েছাত্র-ছাত্রীদের

---

[৪৪] - مجمع الأمثال للميداني (رقم : ٣١٥٩)

মাঝে তথাকথিত মোরালিটি সৃষ্টিরও দাবী করে। অতঃপর এমন অপরিপক্ক স্ট্যাটাসে স্বগোত্রীয়দের বাহ্‌বা পেয়ে অনেকে আবার নিজেকে সাহিত্যের জনক দাবী না করলেও পন্ডিত দাবী করতে আর দেরী করে না।

এ ধরনের মানুষদের সম্পর্কে বেশী কিছু না বলে শুধু বলতে চাই, এরা নিজের অন্তরে লালন করে এক সভ্যতা, আর মজা লুটতে চায় অন্য সভ্যতার। বেশভূষা এক রকম, পরিচয় দিতে চায় অন্য রকম। তথাকথিত মডার্ন সভ্যতার দাবী নিয়ে এরা পর্দা না করে অশালীন কাপড়ে বেশামাল শরীর দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায়। তবে ইচ্ছা পোষণ করে তার দিকে কোনো পুরুষ যেন তৃষ্ণার্ত কাকের মত না তাকায়। নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় কোটিপতির কাছে, কিন্তু বিয়ে পড়ানোর জন্য চায় একজন (আলেম) ফক্বীর। দশ হাজার টাকার শেরওয়ানী, পাঁচ হাজার টাকার পাগড়ি, তিন হাজার টাকার জুতা ও পায়জামা পরিধান করে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার মোবাইল পকেটে রেখে ফিতা কাটতে গিয়ে শালীদের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও দুলা মিয়ার চেষ্টা থাকে যে, নিজের বিয়েটি যেন মৌলভী সাহেব ফ্রিতে পড়াক। তাই তাকে সম্মানী দেয়ার সময় সামান্য কিছু দেয়াকে যথেষ্ট মনে করে।

বড় বেতনের চাকুরিজীবী পাত্রের পক্ষ হতে নিজের মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসলে তখন ইস্তেখারা করার জন্য কোনো ইমামের প্রয়োজন হয়না। নিজে দেখলেও 'হ্যাঁ' দেখা যায়। ধনী লোকের শরাবী ও বাদাইম্মা ছেলের হাতেও হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্‌ বলে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের নমূনা পেশ করা যায়। কিন্তু গরীবের ছেলে দ্বীনদার হলেও রিয্‌ক্বের মালিক আল্লাহ্‌ এটি বলে তার কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা যায় না। আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাকে বলছেন তোমরা বিয়ে করো। আমি রিয্‌ক দেবো এবং বাড়িয়ে দেবো। আর বান্দা বলছে আগে ইস্টাবলিষ্ট হও এবং রিয্‌ক জমা করো পরে বিয়ে করো। অপচয়ের টার্গেট নিয়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের বিয়েকে কঠিন করে তাদের জন্য যেনাকে সহজ করে দিয়েছে। ইসলামী সভ্যতার দাবী হলো বিয়েকে সহজ করুন। গহনা যৌতুক এবং গায়ে (মরিচের) হলুদের প্রথা বন্ধ করুন। বিয়ের খরচ শুধু এই টুকু হওয়া উচিৎ যে আপনি এক মাসের বেতন দিয়ে অতি সহজে বিয়ে করে ফেলতে পারেন। এখন এক দিনের

বিয়েতে লক্ষ টাকা খরচ করে প্রয়োজনে পুরো বছর ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে ঘুরবে, তবুও বিধর্মীদের কৃষ্টি কালচারের অনুকরণ করবে। এটি হলো বর্তমান খায়রা উম্মাতিন এর ঈমানের Temperature বা তাপমাত্রা।

পুরোজীবন 'তারে নারে বন্ধুরে কুমড়া খেলো ইঁন্দুরে' বলে গান গেয়ে হারাম কামাই করে বাড়ি বানিয়ে লিখে রাখে **'হাযা মিন ফাদ্‌লে রাব্বী'** বা 'এটি আমার রাব্বের অনুগ্রহ'। মা-বাবার প্রতি প্রতিনিয়ত চোখ রাঙ্গিয়ে সকাল-বিকাল ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসে নিজ গাড়ির ওপর লিখে রাখে **'মা-বাবার দো'য়া'**। শিখতে চায় ইংরেজী, গোলামী করতে চায় ইউরোপের, ঘুরে বেড়াতে চায় প্যারিসে আর দেখতে চায় দুবাইয়ের **'বুরজ খালীফাহ'**। দাদাদের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে কথায় কথায় কবিগুরুর কথা মনে করে গুনগুন করে তার গান গেয়ে উঠে, আর আখেরাতে শাফায়াত চায় রাসূলের। মরতে চায় মাসজিদে নাববীর **'ক্বুব্বাহ খাদ্বরা'** বা সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে আর দাফন হতে চায় **'মাক্বারাতুল বাক্বী'** বা বাক্বী গোরস্থান মাদীনাতে। প্রতারণা আর কাকে বলে? মহল্লার মাসজিদে সালাত আদায় করতে না গিয়ে মাদীনার মাসজিদে সাজদাহ্‌রত অবস্থায় মৃত্যু কামনা করে দো'য়া করে। এরপরও রাশী দেখে প্রতারক বোঝার জন্য কিতাবের পাতা উল্টাতে হবে?

মূলতঃ এরা হীনমণ্যতা এবং আস্থাহীনতায় ভোগে। কারণে অকারণে ফেসবুকে অনর্থক স্ট্যাটাস দেয়। বোকার স্বর্গে এদের বাস। ঈমানের মূল্য বুঝতে এরা অক্ষম। তাই নিজেদের ফেসবুক ইংরেজী সাহিত্যের সাহিত্যিকদের উপন্যাসের আলোকে বিবস্ত্র নারীদের আর্টকৃত শিহরণ সৃষ্টিকারী ছবিতে ভরে সেটিকে ফাসাদ বুক বানিয়ে দু'নৌকায় পা রেখে তথাকথিত মডার্ন হওয়ার অপচেষ্টা করে। আকাশের রং, বৃষ্টির ফোঁটা দেখে এবং গাছের ডালে কোকিলের ডাক শুনে প্রতিনিয়ত হিন্দু কবিদের কথা এদের মনে পড়ে। তাদের সাহিত্য ও কবিতার পঙতি গুনগুন করে গেয়ে উঠে আবেগে আপ্লুত হয়ে তাদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে নিজেকে তথাকথিত মডার্ন হিসেবে পরিচয় দিয়ে সমাজে বেঁচে থাকতে চায়। অর্থাৎ গাছের উপরের টাও খেতে চায় আবার নীচেরটাতেও ভাগ বসায়। কথায় কথায় যেই সব হিন্দু কবিদের কথা তাদের মনে পড়ে, সেই সব কবিদের অনুগামীদের মধ্য হতে নর-নারীদের শত শত নয়; বরং হাজার হাজার

ইসলামের সুধা পান করে চলছে। এই লেখাটি যখন লিখছিলাম তখন ভারতের ২০০ হিন্দু পবিরারের ইসলাম গ্রহণের খবরটি পাকিস্তানের করাচির টিভি চ্যালেন ৯২ খুব ফলাও করে প্রচার করছে। এ সব নও মুসলিমরা টিভির ভাষ্যকারকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে যে, তারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছে। মুসলমান হয়ে এখন তারা তাদের হৃদয়ে মহা এক প্রশান্তি অনুভব করছে। অতএব ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম এটি বুঝতে তাদের আর বাকী থাকলো না।

বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য এখানে কিছু উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই ঈমান ও কুফ্‌র এর চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের পরও অমুসলিমরা ইসলামের সকল বৈশিষ্ট্যকে অকপটে স্বীকার করে গেছেন। আমরা দেখতে পাই সেদিন আল্লাহ্‌র রাসূলকে মাক্কার কাফেররাই **'আল্ আমীন'** উপাধি দিয়েছিলো। আরবের কাফের বেদুঈনরাই তাঁকে সেদিন বায়তুল্লাহ্‌য় **'হাজরে আসওয়াদ'** স্থাপনের বিষয়টি মীমাংসার দায়িত্ব দিয়ে তাঁর ফায়সালাকে সঠিক ফায়সালা বলে মেনে নিয়েছিলো।

এই যুগেও যদি আমরা একটু ভালো করে তাকলে দেখতে পাই, ভারত স্বাধীনের অনেক আগে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা ভারত স্বাধীন হলে তার চিত্র কেমন হবে এবং ভারতের উন্নয়নের পলিসি কী হবে এই নিয়ে বহুজন বহু মত প্রকাশ করেছেন। আমার স্বল্প জ্ঞানে যাকে সবার আগে এবং উত্তম পরামর্শদাতা হিসেবে দেখেছি তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। তিনি ১৮৯৮ সালে লিখিত একটি চিঠিতে স্বাধীন ভারতের চিত্র ও উন্নয়নের পলিসি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে লিখেছেন:

`For our own motherland a junction of the two great system, Hinduism and Islam, is the only hope. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body' [45]

45- Letter of Swami Vivekananda, p. 380

'আমাদের মাতৃভূমি দু'টি বড় ধর্মের (হিন্দু-ইসলাম) মিলন কেন্দ্র। এই দুই ধর্মের মাধ্যমেই ভারত সকল সমস্যা ও দুর্যোগ মোকাবেলা করে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবে বলে আমি মনে করি।'

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য। তা হলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে মানব ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যত হয়েছে তার ১০% দাঙ্গাও পৃথিবীর কোনো জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে হয়নি। তারপরও ভারতের হিন্দুরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। তাদের নেতারা নিজ দেশ ও জাতিকে বারবার ইসলামের খালীফাহ্দের জীবন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জাওয়াহার লাল নেহরু (14 November 1889 – 27 May 1964) তার Discovery of India নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইসলাম ও মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'আরবের মুসলমানরা ভারত আগমনের সময় Brilliant culture নিয়ে এসেছেন।' [৪৬]

ভারতের কংগ্রেস পার্টি ১৯৩৬ সালে সর্বপ্রথম অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের সুযোগ পেয়েছিলো। এরপর মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) তার পরিচালনাধীন 'হরিজন' পত্রিকার ১৯৩৭ সালের ২৭ জুলাইয়ের সংখ্যায় তাঁর দলের মন্ত্রীদের সহজ সরল জীবন যাপনের পরামর্শ দিতে গিয়ে পরিষ্কার লিখেছেন, 'সহজ জীবন যাপনের বাস্তব নমুনা হিসেবে আমি রাম অথবা কৃষ্ণের জীবনকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারছি না। কারণ তারা কোনো Historical Personalities ছিলেন না। তাই আমি এখানে ইসলামের প্রথম দুই খালীফাহ্র উদাহরণ দিতে বাধ্য হচ্ছি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা বিশাল এক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরও সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি তার দলের মন্ত্রীদেরকে বলেছেন:

We have to follow the example of Abu Bakr and Omar। [৪৭]

---

[46]- Jawaharlal Nehru, Discovery of India, P.227

৪৭- বিস্তারিত দেখুন: 'হরিজন' ২৭ জুলাই ১৯৩৭। আরো দেখুন লেখকের প্রবন্ধ 'ইসলাম পন্থীদের ঐক্য এখন সময়ের দাবী' জাতীয় দৈনিক ১৪ জুলাই ২০১০

উল্লেখিত অমুসলিমরা শুধুমাত্র নিজেদের দুন্ইয়াবী ফায়দার জন্যও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে ইসলামের মনীষীদের উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন। আর আমরা মুসলমান হয়েও নিজেদের ঈমানের পরিচয় এবং আখেরাতে লাভবান হওয়ার জন্যও আমাদের এসবের কিছুই মনে পড়ে না, মনে পড়ে দাদাদের ও কবিগুরুদের কথা। গানের কলি আমাদেরকে সেই বাল্য কালের রুপকথার জগতে নিয়ে যায়। তাই বলছিলাম, যারা কথায় কথায় সাম্প্রদায়িক হিন্দু কবিদের কবিতার পঙতি দিয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে পরিচয় দেয়, খবর নিয়ে দেখুন, তারা ডিগ্রী লাভের জন্যও কিন্তু হিন্দুদের জীবনী ও সাহিত্যকেই বেছে নিয়ে থাকে। আর এ কারণেই হিন্দু কবিদের প্রেমে ডুবে থাকে সারাক্ষণ।

তথাকথিত প্রাক্টিসিং মুসলমানের দাবীদারদের এহেন চিন্তা চেতনা দেখে খুব কষ্ট হয়। তারা এসব বলে বেড়াতেও ভালোবাসে। তেমনই একজন তার ফেসবুকে লিখলেন 'নব্বইয়ের দশক এ নিতান্ত ই বালিকা আমি। প্রচন্ড রক্ষণশীল পরিবার। দেশাত্মবোধক কিংবা ভারতীয় বাংলাগান ছাড়া আর কিছুই এলাউড না।' ভাবতে অবাক লাগে পারিবারিক ভাবে গান শোনার অনুমতি প্রাপ্তরা নিজেদেরকে আবার **'প্রচন্ড রক্ষণশীল পরিবার'** ও দাবী করে। মূলতঃ ভালো মন্দ বোঝার শক্তি এরা হারিয়ে ফেলেছে। এ ধরনের 'প্রচন্ড রক্ষণশীল পরিবার' এর লোকেরা নিজেদের গবেষণা এবং ডিগ্রী অর্জনের জন্য চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু কবিদের ছাড়া আর কিছু পায় না। হিন্দু কবিকে গবেষণার শিরোনাম অথবা কথায় কথায় তাদের উক্তি ও কবিতার পঙতিকে রেফারেন্স বানিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে। তারপরও আমি মনে করি তাদের এখানে এসে থেমে যাওয়া উচিৎ। ডিগ্রী অর্জনকেই Last Destination মনে করাই শ্রেয়। হিন্দুদের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া একজন মুসলমানের জন্য কখনো শোভা পায় না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে। একবার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাউদী আরবের কিছু ইসলামিক স্কলার্স এসেছিলেন। তাদের অনেকে আবার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ওৎপ্রোতভাবে জড়িতও রয়েছেন। ঐ সব স্কলারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাউদী আবরের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ্ আল্ মোসলেহ্। তিনি বড়

একজন দাঈ ইলাল্লাহ্। দা'ওয়াতে ইসলামের কাজে পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ভিসি ও প্রো-ভিসিকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীয়াহ্ ফ্যাকাল্টির শিক্ষকদের সাথে তিনি মতবিনিময় করার জন্য ভার্সিটির সেমিনার হলে একত্রিত হলেন। শুরুতেই পরিচিতি পর্বে তিনি সবার নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তাই শিক্ষকগণ এক এক করে নিজের পরিচয় দিয়ে কোথায় পড়েছেন এবং কী ডিগ্রী অর্জন করেছেন তাও বলে যাচ্ছেন। তখন শিক্ষকদের একজন কী ডিগ্রী অর্জন করেছে তা উল্লেখ করলেও কিন্তু সে তার গবেষণা কর্মের শিরোনাম বলতে চাচ্ছে না।

ড. মুসলেহ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি বার বার তার কাছে জানতে চাচ্ছেন তার পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম কী ছিলো? কোন্ ভাষা ও কোন্ বিষয়ে এবং কোথা হতে সে পিএইচডি করেছে। তারপরও সে যখন বলছে না, তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সতের বছর পর্যন্ত প্রো-ভিসির আসনে অধিষ্ঠিত থাকা উপস্থিত প্রো-ভিসি বলে উঠলেন **'নাজীব মাহ্ফুয'**। এটি শোনা মাত্র ড. মুস্লেহ **লা হাওলা ওয়া লা ক্বোউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্** বলে নিজের ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। অতঃপর সবাই হেসে উঠলো। নাজীব মাহফুযের নাম শুনতেই ড. মোসলেহ খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, একজন আলেম এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শারীয়াহ্ ফ্যাকাল্টির শিক্ষক কী করে একজন নাস্তিকের উপর গবেষণা করে? ইসলাম ও শারী'য়াতের কোনো বিষয় পাওয়া গেলো না? একজন আলেমের ডিগ্রীর এতই দরকার? আলেমের জন্য নাস্তিকের নোংরামির প্রশংসা করে ডিগ্রী লাভের কথা কল্পনাও করা যায় না।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের অনেকে শুধু ডিগ্রী এবং অন্যের বাহ্বা পাওয়াকেই জীবনের সব কিছু মনে করে। তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হলো পৃথিবীব্যাপী অমুসলিম গবেষকরা যেখানে ইসলামের সালাত ও সাউম, দাড়ি ও মিসওয়াক্ব, টাখনুর ওপর প্যান্ট পরা, পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম এবং হাঁচি দিয়ে আল্হামদু লিল্লাহ্ বলার কারণসহ ত্বালাকপ্রাপ্তা নারীর তিন হায়েয এবং বিধবা নারীর চারমাস দশদিন ইদ্দাত পালনের পার্থক্যের কারণ নিয়ে গবেষণা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে শুধু নিজেরাই ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে না; বরং বিশ্বকেও জানিয়ে

দিচ্ছে যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। ইসলামের বিধি-বিধানই অথেন্টিক। সেখানে কী করে একজন মুসলমান নাস্তিকদের নাস্তিকতা ও নোংরামীর প্রশংসার মাধ্যমে ডিগ্রী অর্জন করে?

তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে বললেন, যারা যখন যে কোনো বিষয়ে গবেষণায় একবার ঢুকে পড়ে তখন সেখান হতে আর ফিরে আসতে পারে না, **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বী**। তার প্রমাণ হলো বর্তমান পৃথিবীতে অনেক অমুসলিম ইসলামের দোষ খুঁজে বের করার জন্য ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু দেখা গেছে যারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে তারাও পরিশেষে ইসলামের সৌন্দর্য খুঁজে পেয়ে মুসলমান হয়ে যায়। যেমনটি হয়েছিলো খালীফাহ্তুল মুসলেমীন উমার ইবনুল খাত্তাবের বেলায়। তিনি তলোয়ার নিয়ে বের হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মাথা নিয়ে আসতে। কিন্তু রাসূলের দরবারে গিয়ে তাঁর মাথা আনার পরিবের্ত রাসূলের হাতে নিজের মাথা দিয়ে বলে উঠলেন: **আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ্**।

ড. মুসলেহ যা বলেছেন তা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই। আমি ভার্সিটির এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর থাকাকালে তার যথেষ্ট প্রমাণও পেয়েছি। আরবী ডিপ্লোমা কোর্সের সিলেবাস প্রণয়নের সময় সহযোগিতার জন্য আমি তাকে ডেকেছিলাম। সে এটি সেটি বলে নাজীব মাহফুযের সাহিত্যকে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলো। আমি বললাম না, এটি কোনো ভাবেই করা যাবে না। বরং ড. আব্দুর রাহমান রাফাত পাশার **'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ'** সিরিজটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ এর মধ্যে সাহিত্য ও ঈমান দু'টিই আছে। যে সাহিত্যে ঈমান নেই এমন সাহিত্যের মাধ্যমে আমি ছাত্রদেরকে আরবী শেখাতে চাই না। সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির কেউ তার কথাকে আমলে নিতে এবং তার যুক্তিকে গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় সে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেনি। এ ধরনের লোকেরা বাম-রাম সেক্যুলার ও নাস্তিক ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের অনুকরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কথায় কথায় তাদের রেফারেন্স দেয়। নাস্তিকদের পত্রিকা এবং বই হাতে নিয়ে ঘুরতেও গর্ববোধ করে।

এরা সব সময় নিজেকে অনেক সৎ, অনেক বড় গবেষকও ও নিয়ম নীতির পন্ডিত বুঝাতে চায়। তবে অন্যের গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে নিজের পান্ডিত্য দেখালেও তারা নিজেরা যত প্রবন্ধ লিখেছে সবগুলো নিয়ে এখান সেখান থেকে অনেক কথা তাদেরকে শুনতে হয়েছে। সেগুলোর ওপর ভরসা করে উন্নতির উচ্চ শেখরে পৌঁছতে গিয়ে বার বার ধাক্কা খেতে হয়েছে। তারপরও তারা অন্যের বই হতে নকল করে নিজের নামে ছাপিয়ে দেয়ার জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জমা দেয়ার পর রিভিউর জন্য পাঠালে সেখান হতেও এসব স্বঘোষিত গবেষকদের অপকর্মের প্রচন্ড দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে ছাপতে নিষেধ করেছে। অতএব ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে নিজেকে নিয়োজিত না করলে এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ক্বোরআন-সুন্নাহ্সহ ফিক্বহে ইসলামির বিষয়কে বাদ দিয়ে নাস্তিকদেরকে গবেষণার বিষয় বানালে যা হওয়ার কথা এখানেও তাই হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। আমি নাদওয়া হতে ডিগ্রী নিয়ে যখন দেশে ফিরে আসলাম, তখন আমার চাকরির প্রয়োজন হলো। ঢাকায় চাকরি খুঁজতে লাগলাম। পরিচিত লোকজনকে এ সম্পর্কে জানালাম। অতঃপর দুই এক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সচিবালয় মাসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী **'কারিতাস'** নামক একটি এনজিও হতে আমার কাছে চাকরির অফার নিয়ে আসলেন। আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কারিতাসে আমার কী কাজ? কারণ কারিতাস হলো এমন একটি এনজিও যেটি নারীদেরকে ঘর ছাড়া যেমন করছে, তেমনিভাবে তাদেরকে রাস্তা-ঘাটে বেপর্দা হওয়ারও শিক্ষা দিচ্ছে। পারিবারিক জীবন তো দূর কী বাত, তাদের ব্যক্তি জীবনেও ইসলাম অনুপস্থিত। আমি দ্বীন শিক্ষা করে এসে ইসলাম বিরোধী এমন একটি এনজিওতে গিয়ে কী কাজ করবো? তখন আমাকে বলা হলো, কারিতাসের কর্ম-কান্ডগুলোর সংবাদ এবং তাদের তৎপরতাকে আরবীতে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রচার করার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে। এটি শুনে আমি তৎক্ষণাত বলে উঠলাম, ঢাকায় না খেয়ে মারা যাবো, তবুও ইসলাম বিরোধী এনজিওতে চাকরি করবো না। এই জন্যই কি আমি **ক্বালাল্লাহু ওয়া ক্বালার রাসূল** শিখেছি?

তাই আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে তা হলো, মানুষ যা করতে চায় তা করার পুরো সুযোগ আছে এই দুন্ইয়াতে। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে এমন সুযোগের কথা যেমন বলেছেন তেমনি তাদের পরিণতির কথাও বলেছেন। আল্লাহ্র সেই কথাটিকে পবিত্র ক্বোরআন এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[48]

'আমি তাকে সেদিকেই চালাবো যেদিকে সে চলে গেছে, এবং তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিবো, যা নিকৃষ্টতম আবাস।'

আমার ভাবতে কষ্ট লাগে যে, যারা জন্মই নিয়েছে মুসলিম পরিবারে, বড় হয়েছে মুসলিম সমাজে। পড়া-শোনা করেছে ইসলামী পরিবেশে। সকাল-সন্ধ্যা আযানের আওয়ায ভেসে এসেছে কানে। মুসলিম দেশে তাদের বাস এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানের দস্তরখানে তাদের রুটি-রুজি। তারপরও কী করে তারা হিন্দু কবিদের প্রেমে ডুবে থাকে? এখানেই শেষ নয়, এদের অনেকে শুধু মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি নিজের ঘৃণা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয় না, নিজেও অমুসলিম হতে চেয়েছে বলে মিডিয়ার মাধ্যমে নিজ অন্তরের গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে তথাকথিত দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটানোর অপচেষ্টা চালায়। এরাই নাকি আবার নিজ দেশে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো এমন পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত ঈমান নিয়ে এরা আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামনের সারির সৈনিক হওয়ার সনদও লাভ করে। অতএব এমন জাতির কপালে দুঃখ ছাড়া আর কি থাকতে পারে, যে জাতি তারই ধর্মের ভাইকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে অপছন্দ করে। তাদের পতন কামনা করে। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে ঘৃণা করে। বিষয়টা যেন এমন তাদের কাছে ইসলামিক শব্দ **'শহীদ'** কাঙ্খিত। কিন্তু **'জিহাদ'** অনাকাঙ্খিত। অথচ জিহাদ ছাড়া 'শহীদ' হওয়ার কল্পনা করা উলুবনে মুক্তা ছাড়ানোর শামিল।

৪৮- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-১১৫

তাই বলছিলাম, ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসন কায়েমের আন্দোলনের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীদেরকে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হলো, কৃষক যদি ক্ষেতের মাটি এবং মওসূম সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে সেই ক্ষেতে যমযমের পানি দিয়ে সেচ করলেও ফসল কখনো ঘরে উঠাতে পারবে না। হয়ত এই কারণেই এদেশে ইসলামী সূর্যের কিরণ বিকশিত হওয়ার পূর্বেই ঘন একটি কালো মেঘ এসে সেটিকে বার বার চেপে ধরে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমার আপনার কাছে আশ্চর্য মনে হলেও তারা কিন্তু অমুসলিমদের চলা-ফেরা, উঠা-বসা, হাসি-কান্না, উলঙ্গপনা-বেহায়াপনা, খেলা-ধূলাসহ জশ ও খ্যাতি অর্জনের খুশীতে আজ গদগদ। রাজনীতি বা খেলাধূলাসহ কোনো নীতিতেই তারা মুসলমান বা মুসলিম রাষ্ট্রকে পছন্দ করে না। মুসলিম রাষ্ট্রের উন্নতি এবং মুসলমাদের ক্ষমতার মসনদে বসাকে কখনোই তারা মেনে নিতে পারে না। কারণে অকারণে তারা মুসলিম রাষ্ট্র ও জাতিকে গাল-মন্দ করার মাঝে দেশপ্রেম খুঁজে বেড়ায়। ছোটবেলা হতেই এমন Syndrome বা মনের সাধ ছিলো বলে তারা জাতিকে জানিয়ে নিজের বাহাদূরি প্রকাশ করে। খেলার মাঠে আজীবন তারা মার্ক টেইলর কিংবা স্টিভ ওয়াহ হতে চেয়েছে। যদিও এসব লোক যাদের মত হতে চেয়েছে, তারাও কিন্তু খেলার মাঠে সেই মুসলমান খেলোয়াড়ের ভয়ে কেঁপেছে পুরো জীবন। তারপরও কেন যেন আমাদের এসব সুবিধাভোগীরা কখনো বিশ্ব কাঁপানো সেই মুসলমান খেলোয়াড় হতে চায়নি।

অথচ যাকে এরা অপছন্দ করে এবং যে কারণে তার রাষ্ট্রকে গালি দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে ঐ সব অভিযোগ সৃষ্টির সময় হয়ত এদের জন্মও হয়নি। যে মুসলিম খেলোয়াড়কে তারা অপছন্দ করে বলে ঘোষণা দিচ্ছে সে সব খেলোয়াড়রা খেলার মাঠেও প্রকাশ্যে আযান দিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঈমানের পরিচয়ই তাদের বড় পরিচয় বলে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে খেলোয়াড় হিসেবে নয়। তারপরও এসব ফেরেশ্‌তা সূলভ চরিত্রের দেশ প্রেমের চেতনার ঠিকাদাররা পরবর্তীতে শোনা শোনা কথা ও রাজনৈতিক বক্তব্যের ওপর ঈমান এনে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের খপ্পরে পড়ে তোতা পাখির মতো তাদের শেখানো বুলি আওড়িয়ে

মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রকে গাল-মন্দ করে তাদের দলভুক্ত হতে পারাকে জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া মনে করেছে। অথচ রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: كَفَى بِالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)[٤٩]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন: একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।'

উপরোক্ত হাদীস হতে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, শোনা কথা কোনো ধরণের তাহক্বীক ও যাচাই-বাছাই ছাড়া কখনো বলা যাবে না। যদি এটি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় তাহলে তো অবশ্যই যাচাই বাছাই করতে হবে। অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তাহলেও এসব বলার পেছনে যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এমন কথা বললে অবশ্যই গুনাহ হবে। কারণ এখানে কথা সত্য, তবে উদ্দেশ্য খারাপ। আর মিথ্যা হলে তো কাবীরাহ্ গুনাহ।

তাই রাজনৈতিক ব্যক্তি যা বলে বেড়ায় তা একজন মু'মিন কখনো বলে বেড়াতে পারে না। কারণ রাজনৈতিক লোকেরা শুধু মিথ্যা বলে না, অন্যকে অপমান ও অপদস্থ করাও তাদের কাম্য হয়ে থাকে। সকালে একটি বললে বিকেলে আরেকটি বলে। এরা সুযোগ বুঝে কথা বলে। তাই জনগণও তাদেরকে মিথ্যুক মনে করে। তারা মেঘ যে দিকে ছাতাও সে দিকে ধরে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেরাও নিজেদেরকে মিথ্যুক মনে করে। আখেরাতে আল্লাহ্র কাছেও তারা মিথ্যুক হয়ে দাঁড়াবে। তাদের এহেন চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। আমি অতিরঞ্জিত করছি বলে যারা আমার প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করবে, তাদের অবগতির জন্য এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করার প্রয়োজন মনে করছি।

একবার এক গ্রামের জনৈক কৃষকের ছেলে পড়া-শোনা করে শিক্ষিত হয়ে গেলো। দেশে যখন নির্বাচনের সময় হলো তখন সে নিজেকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করলো। কৃষকের ছেলের এমন স্পর্ধা দেখে গ্রামের

---

[٤٩] - رواه مسلم في " مقدمة صحيحه " (١ / ١٠٧) ،وأبو داود (٤ /٢٩٨ / ٤٩٩٢) ابن حبان (١ / ٢١٣ / ٣٠) ، وأبو نعيم في "المستخرج " (١ / ٩٥ / ٦٧) والحاكم في " المدخل " (ص ١٠٧ ، ١٠٨)

চৌধুরী সাহেব পুরো গ্রামবাসীর উপর তার পালিত কুকুর লেলিয়ে দিলো। কুকুর বহু মানুষকে কাটলো অনেকে মারা গেলো এবং অনেকে আহত হলো। অতঃপর অসুস্থরা সুস্থ হয়ে এসে চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রামের পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থী হলো। বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শোনে পঞ্চায়েত বললো, চৌধুরী সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী নেই। যেহেতু আক্রমণ করেছে কুকুর তাই মামলা চলবে কুকুরের বিরুদ্ধে। সুতরাং চৌধুরী ও তার পরিবার বে-কসুর খালাস পেয়ে গেলো। গ্রামের এমন পঞ্চায়েত এবং শহরের দালান-কোঠায় অবস্থিত বিচারালয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا [৫০]

'আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন: সত্য মানুষকে পূণ্যের দিকে নিয়ে আসে। আর পূণ্য মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়। মানুষ যখন নিয়মিত সত্য বলতে থাকে তখন তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আর মিথ্যা মানুষকে অন্যায় ও পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। মানুষ যখন নিয়মিত মিথ্যা বলতে থাকে তখন সে মিথ্যুক বলে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।'

এই জন্যই আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [৫১]

'হে ঈমান গ্রহণকারীগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে,

---

৫০- سنن الترمذي، كتاب البر والصلة والآداب، باب قُبْحِ الْكَذِبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ، رقم: ١٩٧١

৫১- সূরাতুল হুজুরাত, আয়াত নং-৬

না জেনে শুনেই তোমরা কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'

সীরাতে নাববীর পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই যে, মাক্কার কাফেররা আল্লাহ্‌র রাসূলকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিলো। আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি মাদীনায় হিজরাত করলেন। হিজরাতের পূর্বে মাক্কার কাফেররা সালাতে সাজদাহরত অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র আঙ্গিনায় রাসূলুল্লাহ্‌র মাথার ওপর উটের নাড়ী-ভুড়ী রেখে দিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিলো।

এখানেই শেষ নয়, তায়েফের ময়দানেও রাসূলুল্লাহ্‌কে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করা হয়েছিলো। অথচ সেই ফাতেহ্ মাক্কা বা মাক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল একজন সম্মানিত নাবী ও রাসূল হিসেবেই প্রবেশ করেছেন। **'রাহমাতুল্ লিল্ 'আলামীন'** হিসেবে সেই ভূমিতেই তাঁর আগমন ঘটেছে যেই ভূমি হতে তাকে একদিন বের করে দেয়া হয়েছিলো। আজ সেই মাক্কার কাফেরদের সাথে রক্তপাতহীন যুদ্ধে জয় লাভ করে তিনি বিজয়ীর বেশে রাজা-বাদশাদের মত ঢোল-তবলা বাজিয়ে আনন্দ মিছিল নিয়ে মাক্কায় প্রবেশ করেননি। শত্রুদের থেকে কোনো বদলা নেননি; বরং সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা বা (General Amnesty) ঘোষণা করেছিলেন।

এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে পাহাড়ের ফেরেশ্‌তা এসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন: আপনি হুকুম দিলে দুই দিকের দুই পাহাড় দিয়ে ঐ সব অত্যাচারি যালিম ও কাফেরদেরকে পিষে ফেলবো। আল্লাহ্‌র পাঠানো ফেরেশ্‌তার এমন আবেদনের জাওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন:

(عَنِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي

فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)[৫২]

'উরওয়াহ্ ইবনে যুবায়ের হতে বর্ণিত। আয়েশাহ (রা.) বলেছেন: একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট আরয করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্**! উহুদের দিনের চেয়ে কি কোনো কঠিন দিন আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন: তোমার ক্বাওমের পক্ষ হতে আমি যে সকল সংকটের সম্মুখীন হয়েছি তা তো হয়েছিই। তবে যেদিন আমি সর্বাধিক কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই সেদিন ছিলো আক্বাবার দিন। সেদিন আমি স্বয়ং ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সম্মুখে উপস্থিত হই। তখন আমি যা চেয়েছিলাম তার কোনো সদুত্তর সে দেয়নি। সুতরাং আমি মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলাম। আমার সম্বিৎ ফিরে আসেনি। এমন অবস্থায় আমি **'কারনুস সা'আলাব'** এ এসে পৌঁছলাম। আমি মাথা তুলে হঠাৎ দেখতে পেলাম, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সেদিকে তাকিয়েই তার অভ্যন্তরে জিবরাঈল (আ.) কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আপনার সাথে আপনার জাতির যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রতি উত্তর হয়েছে আল্লাহ্ অবশ্যই সে সকল কথা শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। এ সকল লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন।

রাসূল (স.) বলেন, তখন পাহাড়ের ফেরেশ্তা আমাকে ডেকে সালাম করলো এবং বললো: হে মুহাম্মাদ! এ সকল ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা

৫২- صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، الرقم: 3231

করবেন তাই হবে। আপনি চাইলে আখশাবাইন অর্থাৎ দু'দিকের দু'টি পাহাড় তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। এটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন: না, তা কখনো হতে পারে না; বরং আমি আশা করি আল্লাহ্ তাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শারীক করবে না।'

আর তাই হয়েছে। আজ একংশি শতাব্দীতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই মাক্কায় একজন কাফেরও নেই। এমনকি সেখানে বাইরের কাফেররাও প্রবেশ করতে পারছে না। এমন এক ঐতিহাসিক বিজয়ের সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) পরাজিত বাহিনী অর্থাৎ সেই আত্মসমর্পনকারী কাফেরদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, তোমরা কী মনে কর? আজ আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করবো? তোমাদের সাথে আমার কেমন আচরণ হওয়া উচিৎ? উত্তরে তারা বলেছিলো: .

(قَالُوا: خَيْراً، أَخٌ كَرِيْمٌ، وَابنُ أخ كَرِيْم، فَقَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ أخي يُوسُفُ)﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (اذْهَبُوا فَأَنْتُم الطُّلَقَاءُ)[৫৩]

'তোমরা কী মনে কর? আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করবো? উত্তরে তারা বললো: আমরা ভালো আচরণ আশা করি। একজন সম্মানিত ভাই এবং একজন সম্মানিত ভাইয়ের ছেলের মত আচরণ আশা করি। অতঃপর রাসূল (স.) বললেন: আমি তাই বলবো: যেমন বলেছিলেন আমার ভাই ইউসুফ (আ.)। 'তিনি বললেন: আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবান হতে অধিক মেহেরবান।' চলে যাও তোমরা এখন মুক্ত-স্বাধীন।'

তাই বলছিলাম, মুসলমানদের কাছে এমন সভ্যতা ও উত্তম আচরণের নমুনা থাকার পরও তারা রাজনৈতিক নেতাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অন্য মুসলমানকে গাল-মন্দ করে দেশপ্রেম বলে চালিয়ে দিয়ে নিজেও গুনাহ্ করে অন্যকেও গুনাহে লিপ্ত করে। অন্যদিকে এধরনের তথাকথিত

---

[৫৩] - سورة يوسف، الآية : ٩٢، ورواه البيهقي

দেশপ্রেমিক ধান্ধাবাজরা কাফেরদের প্রতি তাদের অন্তরে গভীর প্রেম লালন করেই শুধু চলছে না; বরং বলেও বেড়াচ্ছে। তাই বাঘ ও সিংহকে শিয়ালের কাছে মাফ চাওয়ার আবদার রাখে। স্বাদ কত! এরা সাময়িক পরিস্থিতির স্রোতে বা দু'দিনের মসনদ টিকিয়ে রাখার লোভে ঈমান বিরোধী কথা বলতে একটুও চিন্তা করছে না।

এমন হঠকারিতা এবং নিজ ঈমান আমলের সাথে প্রতারণাকে দেশপ্রেম বলে চালিয়ে দিয়ে জাতিকেও বেকুফ বানানোর অপচেষ্টা চালায়। অথচ তারা যাদের অনুসারী বলে ইসলামী প্রতিষ্ঠানের দস্তরখানে রুটি রুজির ব্যবস্থা করেছে তারাই কিন্তু সব কিছু ত্যাগ করে শুধুমাত্র ইসলাম ও সত্যের জন্য হাসি মুখে জীবন বিলিয়ে দিয়ে ঘাতকের চোখে চোখ রেখে কবির ভাষায় বলে উঠেছে:

জান দী, দি তো উস্‌হী কী থী /
হক্ব তো ইহ্ হায় কেহ্ হক্ব আদা না হুয়া।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ দিয়েছি, আর সেই প্রাণ তো আমাকে তিনিই (আল্লাহ্) দিয়েছেন। তবে সত্য কথা হলো তারপরও হক্ব আদায় করতে পারিনি।

তাই বলছিলাম, এধরনের চেতনার ফেরিওয়ালা এবং ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থকারীরা উভয় নৌকার যাত্রী হয়ে নিজেদের মুনাফেক্বি চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। তবে তারা এটি বুঝতে না পারলেও তাদের ফলোয়াররা ঠিকই বোঝে। তারপরও কিন্তু তারা দুন্‌ইয়া-আখেরাত উভয়ের সমান ভাগিদার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এসব দেখে কী বলবো তা বুঝে উঠতে পারি না। তবে এটুকু বুঝি যে, এরা হয় মুনাফেক্ব না হয় ভালো মন্দ পার্থক্য করার শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলেছে। ঈমান বিল্লাহের দাবী করলেও এরা ঈমান বিল কুফ্‌র্ এর প্রভাব হতে এখনো মুক্ত হতে পারেনি। আর তারা যা লিখে চলেছে এবং নিজের মনের মাঝে লুকানো বিষয়গুলো তাদের অজান্তেই প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে।

তবে চিন্তার বিষয় হলো, এমন ঈমান নিয়ে যদি কেউ দুন্‌ইয়া হতে বিদায় নেয়, তাহলে অবশ্যই তার হাশর হবে যাদের প্রেমে দুন্‌ইয়াতে হাবুডুবু খেয়েছে এবং তাদের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে তাদের সাথে। এটি

আমার কথা নয়, রাসূলের কথা। আমি শুধু অনুবাদক বা Interpreter। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ، وَلاَ صَوْمٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)[٥٥]

'আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একজন লোক রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন **ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** ক্বিয়ামাত কখন হবে? আল্লাহ্র রাসূল (স.) তাকে উল্টা প্রশ্ন করলেন ক্বিয়ামাতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? তখন লোকটি রাসূল (স.) কে বললো: ক্বিয়ামাতের জন্য খুব বেশী সালাত, সাউম এবং সাদাক্বাহ করে প্রস্তুতি নেই নি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। অতঃপর রাসূল (স.) তাকে বললেন: **তুমি যাকে পছন্দ কর তার সাথে থাকবে।**'

ইসলামী আন্দোলনের ভাই-বোনেদের মাঝে সম্প্রতি একটি জিনিস খুব বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা হলো বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তিকে হাতের কাছে পেয়ে তারা যা খুশী এবং যেভাবে খুশী ব্যবহার করে চলেছে। না নিজের শিক্ষা-দীক্ষাকে আমলে নিচ্ছে, না নিজের বয়স এবং পজিশনকে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন মনে করছে। প্রতিনিয়ত নিজের টাইম লাইনে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় স্ট্যাটাস দিয়ে চলেছে। খেলা-ধূলা হতে শুরু করে সিনেমা-নাটক সব কিছুতে নিজেকে জড়িয়ে স্ট্যাটাস দেয়াকে প্রয়োজন মনে করে তথাকথিত মডার্নিজমের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার আনন্দে মেঘলা ভোরের ময়ূরের মত নৃত্য করছে। প্রতিনিয়ত ফেসবুকে বউ-বাচ্চার ছবি দেয়াতো কোনো বিষয়ই নয়। তারা একবারও ভাবে না যে, এমন স্ট্যাটাস দেয়াতে কী লাভ? আখেরাত তো তার নষ্ট হচ্ছেই, দুন্ইয়াতেও মানুষ তার এসবকে বিবেক বিবর্জিত কর্মকান্ড বলে উপহাস করছে। এসব আল্লাহ্র সামনে পড়তে হবে। বলা হবে, তোমার রেকর্ড তুমি পড়। তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আজ এটিই যথেষ্ট।

٥٥- أخرجه البخاري في: ٧٨ كتاب الأدب: ٩٦ باب علامة حب الله عز وجل

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি ঢাকার দারুল আরাবিয়ায় চাকরি করার সময় অফিসের ইবাদাত খানায় সালাতুয্ যোহ্রের পর সপ্তাহে একদিন দার্সুল হাদীস দিতাম। মাওলানা এ কে এম ইউসুফ (মৃত্যু ০৯. ০২. ২০১৪) (রাহ.) ও সেই দারসে উপস্থিত থাকতেন। একদিন দারসের ফাঁকে তিনি তাক্বওয়া সম্পর্কীয় একটি ঘটনা শুনালেন। তা হলো খুলনার এক আলেম একবার বাজার হতে ছয়আনা দিয়ে বিশাল একটি রুই মাছ কিনে নিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছেন। বাড়ি ফেরার পথে যে-ই মাছটি দেখে সে-ই জিজ্ঞেস করে, মাছটি কত দিয়ে কিনেছেন? উত্তরে তিনি ছয়আনা ছয়আনা বলেই চলছেন। হঠাৎ তার মনে হলো, আমি যতবার ছয়আনা বলছি ততবার আমার আমলনামায় ফেরেশ্তা ছয়আনা লিখে চলছে। আখেরাতে আমার ডায়েরীতে শুধু ছয়আনা ছয়আনা লিখা থাকবে আর আমাকে আল্লাহ্র কাছে তা পড়ে শুনাতেও হবে। কিন্তু এই ছয়আনার কোনো অর্থ নেই। এটি মনে করতেই তিনি গায়ের পাঞ্জাবী খুলে মাছটিকে প্যাচিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। এখন যেহেতু কেউ মাছটি দেখছে না তাই তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করছে না।

বাড়ি গিয়ে তিনি ছেলের বউকে বললেন: মা এখানে একটি মাছ এনেছি তুমি সেটি রান্না কর আমি সালাত আদায় করে এসে ভাত খাবো ইন্ শা আল্লাহ্। এই বলে তিনি মাসজিদে চলে গেলেন। কিন্তু পুত্রবধূ মাছ খুঁজে পাঁয়নি। তাই সেই মাছ রান্নাও করতে পারেনি। সালাত শেষে বাড়ি এসে তিনি যখন ভাত খেতে বসলেন, তখন মাছ না দেখে বউকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি মাছটি রান্না করোনি? বউ বললো: আব্বা মাছ কোথায়? তখন তিনি বললেন: কেন আমার পাঞ্জাবীর মধ্যে অনেক বড় একটি মাছ দেখতে পাওনি? এটি শুনে বউ দরজার সামনে গিয়ে দেখে হ্যাঁ শ্বশুরের পাঞ্জাবীর মধ্যে বিশাল এক রুই মাছ। তখন সে বললো: আব্বা আপনি এত সুন্দর জামাটি কেন নষ্ট করে ফেললেন? শ্বশুর বললেন আমার জামা নষ্ট হলেও কিন্তু আমার জীবন ডায়েরীটি পরিষ্কার রয়েছে।

তাই বলছিলাম, মু'মিন অনর্থক কোনো কাজ করতে পারে না। সে তার সকল কাজে আখেরাত নিয়ে ভাবে। তার ব্যক্তিগত মতামত বলতে কিছু নেই। তার সকল কথা ও কাজ হবে শারী'য়াহ্র আলোকে। তার পছন্দ

অপছন্দও হবে ইসলামের বাতলানো মতে ও পথে। এসব কারণেই ইসলামী আন্দোলনের কোনো ভাই যখন নিজের মতামত ও জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, তখন আমাদের হাসি পায়। মূলতঃ এরা বানী ইসরাঈলের মত। শনিবারে মাছ না ধরে আটকিয়ে রেখে রোববারে ধরাকে বৈধ বলার অপচেষ্টা চালায়। একটি মত ইসলামিক আর অন্যটি ব্যক্তিগত মতামত বলে বাঁচার জন্য প্রতারণা করে।

তেমনই একজনের ফেসবুকের একটি স্ট্যটাস আমাকে অবাক করেছে। তিনি লিখেছেন 'আমার কাছে ম্যাককেইন একজন যুদ্ধবাজ রিপাবলিকান। তাই তাকে আমি আমার অপছন্দের তালিকায় রাখতাম। কিন্তু মৃত্যুর আগে একটি ভালো কাজ করে গেছেন তিনি। তিনি ওসিয়ত করে গেছেন-তার নিজের দলেরই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প যাতে তার ফিউনারেলে উপস্থিত না থাকেন। শুধু এই কারণেই উইশ করছি রেস্ট ইন পিস ম্যাককেইন।' এভাবে আরো অনেকে 'ভালো থাকবেন আপনারা ওপারে' লিখে বিধর্মীদের মৃত্যুর পর নিজের প্রেম-ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়।

অথচ যাদের ছত্রছায়ায় ম্যাককেইন একজন যুদ্ধবাজ রিপাবলিকান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলো তাদের তুলনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনো যুদ্ধ-বিগ্রহের মত কিছুই করেনি। অথচ মানুষ ক্লিন্টনের নারী কেলেঙ্কারীর ঘটনা এবং বুশের যুদ্ধনীতি এখনো ভুলতে পারেনি। বুশ ও ক্লিন্টনকে মানুষ ভালো করে চেনে। কেন তা পাঠকদের অবগতির জন্য বলতে হয়, 'মায়েরা সন্তানদেরকে বুশের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতো। অবুঝ শিশুও তার ভয়ে ঘুমিয়ে পড়তো এবং প্লেটের ভাত খেয়ে ফেলতো। মুসলিম দেশের মা-বোনেরা তার ভয়ে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্থ থাকতো। মা কখন কোন্ মুহূর্তে তার সন্তান হারাবেন সেই ভয়ে বিমর্ষ থাকতেন। যুবতি মেয়েরা কখন তার হিংস্র বাহিনীর হাতে লুণ্ঠিত হবে সে ভয়ে মাতা-পিতার ঘুম হয়েছে হারাম। যুবক সন্তান কখন কোন্ মুহূর্তে কি অপরাধে কোন্ অন্ধকার জেলে আবদ্ধ হবে, সে অজানা ভয়ে কাটিয়েছে জীবন।'[৫৫]

---

[৫৫]- বিস্তারিত দেখুন: লেখকের প্রবন্ধ **'বুশের ক্রুসেড পরিকল্পনা ও মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা'** দৈনিক ইনকিলাব, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪

তাই আমরা মনে করি ম্যাককেইন তার ব্যক্তিগত কারেণেই নিজের ফিউনারেলে ট্রাম্পের উপস্থিতি পছন্দ করেনি। আমাদের ইসলামপন্থীদের বিচার দেখলেন? সম্প্রতিকালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন যুদ্ধবাজ ম্যাককেইন (২৯ আগষ্ট ১৯৩৬-২৫ আগষ্ট ১৯১৮) কে কত সহজেই মাফ করে দিয়ে অপছন্দের তালিকা হতে পছন্দের তালিকায় এনে স্থান করে দিলো। কোন্ নেক আমলের কারণে তিনি এত সহজে মাফ পেয়ে গেলেন তা জানেন? সেই নেক আমলটি হলো একটি হাস্যকর 'আমল। 'তিনি ওসিয়ত করে গেছেন-তার নিজের দলেরই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প যাতে তার ফিউনারেলে উপস্থিত না থাকেন।'

একজন ইসলামিষ্টের কাছে এটি অনেক বড় সাওয়াবের কাজ মনে হয়েছে এবং আখেরাতে মুক্তির উপায় হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে বলে উঠেছেন **রেস্ট ইন পিস ম্যাককেইন**। এই হলো আজকের মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অবস্থা। আপনি যেখানেই যান না কেন, যার সাথেই আলাপ-আলোচনা করুন না কেন, তাদের ব্যক্তি জীবন হতে পারিবারিক জীবন পুরোটাই এমন ধাঁধাঁর মধ্যেই কেটে যাচ্ছে। বুঝেই উঠতে পারছে না কী করবে আর কী বলবে? আখেরাতে কে মুক্তি পাবে আর কে পাবে না। এ সম্পর্কে ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ কী বলে? এটি বোঝার প্রয়োজনও মনে করছে না।

আমাদের উপরোক্ত দাবীর যৌক্তিকতা অনুধাবনের জন্য একটি গল্প শুনুন। আমেরিকার বুশ আর ট্রাম্প একবার মুসলমানদের একটি প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য গেলো। কিন্তু সেখানে তাদের পরিচিত কেউ না থাকায় তারা ভেতরে ঢুকতে পারলো না। গেইটের সিকিউরিটিরা তাদের জন্য ভিজিটর কার্ডের ব্যবস্থা করতেই দুপুর গড়িয়ে গেলো। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থা দেখে তারা গেইটের বাইরে বটতলায় বসে গল্প করছে। ততক্ষণে প্রক্টরের কাছে এ সংবাদ গিয়ে পৌঁছলো। প্রক্টর এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কারা এবং এখানে কেন এসেছেন? তাদের একজন বললেন আমি বুশ এবং উনি আমার বন্ধু ট্রাম্প। আমরা মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান দেখতে এসেছি। প্রক্টর জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখলেন?

তারা তখন দুঃখ করে বললো, তাদের ব্যবস্থাপনা এত দুর্বল, ভিজিটর কার্ড দিতেই দিন পার করে দিলো। উন্নয়নের গতি এমন, দশ মিনিট গড়লে এক ঘন্টা ভাঙে। মনে হয় পৃথিবীতে সর্ব প্রথম তারাই এই কাজ করছে। আগে আর কোথাও এটি হয়নি। তাই অভিজ্ঞতার অভাবে ভাঙা-গড়া চলছে। যেন অভিভাবকহীন একটি প্রতিষ্ঠান। এইসব দেখে এখানে বসে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করছি। এটি শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ? এবং কেন? এখানে কার কী লাভ কী ক্ষতি? বুশ বললো এই যুদ্ধে আমরা ১৪০ মিলিয়ন মুসলমানসহ একজন বিশ্বসুন্দরীকে হত্যা করবো।

এটি শুনে প্রক্টর লাফ দিয়ে উঠলেন। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুদ্ধে একজন বিশ্বসুন্দরীকে হত্যার প্রয়োজন কেন হলো? এসব প্রশ্ন-উত্তর শোনার জন্য ততক্ষণে প্রক্টরের পাশে বহু ছাত্র-ছাত্রীও এসে একত্রিত হয়ে গেলো। বুশ তখন ট্রাম্পকে বললো দেখছেন, মুসলমানদের অবস্থা? আপনাকে বলছিলাম না এরা কত নির্বোধ? ১৪০ মিলিয়ন মুসলমানকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানার পরও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু একজন বিশ্বসুন্দরীকে হত্যা করা হবে এটি শুনেই তারা উদ্বিগ্ন। অতএব এই যুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের জন্য কেউ সামনে এসে দাঁড়াবে না। যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা কী হতে পারে আমরা জেনে ফেলেছি। তাই পরিকল্পনা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীব্যাপী আজ মুসলমানরা এমন অযৌক্তিক চিন্তায় বিভোর।[৫৬]

আসলেও তাই। পুরো দুন্ইয়ার মুসলমানদের আজ এই দুরবস্থা। তাই এরা একজন যুদ্ধবাজের জন্য **রেস্ট ইন পিস ম্যাককেইন** বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। এবার একটু ভেবে দেখি একজন কাফেরের মৃত্যুর পর এভাবে একজন মুসলমান **রেস্ট ইন পিস ম্যাককেইন** বলে দো'য়া করতে পারে কিনা? শারী'য়াত এ সম্পর্কে কী বলে?

এখানে উল্লেখ্য যে, শারী'য়াতের সোর্স যেহেতু ক্বোরআন এন্ড সুন্নাহ্, তাই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে ক্বোরআন এন্ড সুন্নাহ্ হতেই খুঁজে বের

৫৬- বিস্তারিত দেখুন: লেখকের বই, **'দাম্পত্য জীবন'** পৃষ্ঠা নং-৮০-৮১

করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত বলে নিজের অপরিপক্কতাকে ঢেকে রাখার শায়ত্বানী পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হবে। কারণ এদেরকে কিছু বললে এরা উত্তরে বলে এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। কাফেরদের জন্য দো'য়া সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾[৫৭]

'হে নাবী! আপনি এ ধরনের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা নাই করুন, আপনি যদি এদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে মুক্তির পথ দেখান না।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তাঁর নাবী (স.) কে কাফেরদের জন্য ইস্তেগফার করাকে পবিত্র ক্বোরআনে হারাম করে দিয়ে বলেছেন:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ*وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾[৫৮]

'নাবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষে মুশরিক-দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয়, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হলেই বা কি আসে যায়। যখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তারা জাহান্নামেরই উপযুক্ত। ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো তা তো সে ওয়াদার কারণে ছিলো যা সে তার পিতার সাথে করেছিলো। কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তার পিতা আল্লাহ্র দুশমন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। ইব্রাহীম যথার্থই কোমল হৃদয়, আল্লাহ্ভীরু ও ধৈর্যশীল ছিলো।'

৫৭- সূরাতুত্ তাওবাহ, আয়াত নং- ৮০

৫৮- সূরাতুত্ তাওবাহ, আয়াত নং- ১১৩-১১৪

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসে দেখতে পাই ইয়াহুদীদের বেলায় তিনি কী বলেছেন সেটিও আমাদের স্মরণে রাখা উচিৎ। এখানে উল্লেখ্য যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দো'য়া পাওয়ার আশায় তাঁর সামনে হাঁচি দিত। এ সম্পর্কে হাদীসের ভান্ডারে আমরা একটি হাদীস দেখতে পাই:

(عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)[৫৯]

'আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। ইয়াহুদীরা রাসূল (স.) এর সামনে এই আশায় হাঁচি দিত যে, রাসূল (স.)তাদের জন্য **'ইয়ারহামু কুমুল্লাহ্'** (আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন) বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন: **'ইয়াহদী কুমুল্লাহু ওয়া ইউসলেহু বালাকুম'** (আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করে দিন)।'

ইমাম বায়হাক্বী (রাহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আশ্শু'আব'** এ এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই হাদীসটিতেও আমরা দেখতে পাই, রাসূল (স.) কাফেরদের জন্য এমন দো'য়া করেন নি।

(عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَهُ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: " يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَيَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ " وَقَالَ لِلْيَهُودِ: " يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)[৬০]

'ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। মুসলমানরা এবং ইয়াহুদীরা একসাথে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে উপস্থিত হলো। অতঃপর উভয়ে হাঁচি দিল। এরপর রাসূল (স.) মুসলমানদের জন্য বললেন: ইয়াগফেরুল্লাহু লাকুম ওয়া ইয়ারহামুনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম' (আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের ও তোমাদের ওপর রহম করুন)। আর ইয়াহুদীদের জন্য তিনি

٥٩- أحمد (٣٤ / ٣٥٦)، وأبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

٦٠- أخرجه البيهقي في "الشعب" (٩٣٥٢). وقال: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، وهو ضعيف

(স.) বললেন: 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলেহু বালাকুম' (আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করে দিন)।

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) তাঁর মায়ের হিদায়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ্কে অনুরোধ করলে তিনি তাঁর মায়ের হিদায়াতের জন্য দো'য়া করেছেন। ঘটনাটি ইমাম মুসলিম (রাহ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلَبَ منَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَ لأُمِّه بالهدَاية للإسلَام، فَدَعا لَـهَا وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اهدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ) فَاسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَهُ[٦١])

'ইমাম মুসলিম (রাহ.) বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রাহ্ (রা.) একবার রাসূল (স.) এর নিকট তাঁর মায়ের হিদায়াতের জন্য দো'য়ার আবেদন করলেন। রাসূল (স.) আবু হুরায়রার মায়ের জন্য দো'য়া করলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহ্ আবু হুরায়রার মাকে তুমি হিদায়াত দান কর। আল্লাহ্ তাঁর দো'য়া কবুল করলেন।'

অন্যদিকে রাসূল (স.) নিজ মায়ের জন্য দো'য়া করার জন্য যখন আল্লাহ্র কাছে অনুমতি চাইলেন তখন তাকে এমন করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এখানে পার্থক্য হলো আবু হুরায়রাহ্ (রা.) এর মা জীবিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মা মৃত। হাদীসটি ইমাম মুসলিম এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي)[٦٢]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল বলেছেন, আমি আল্লাহ্র কাছে আমার মায়ের জন্য ইস্তেগফার করার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর আমি তাঁর কবর যিয়ারাতের অনুমতি চাইলে আমাকে তাঁর কবর যিয়ারাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।'

রাসূল (স.) নিজ মায়ের জন্য দো'য়া করার যখন অনুমতি পাননি তখন তিনি মায়ের ভালোবাসায় এবং নিজের কষ্টে কেঁদে ফেলেছেন। এই

---

٦١ - رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدَّوسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٦٢- هذا الحديث رواه مسلم (٩٧٦)

ঘটনাটিও আমরা বিস্তারিত হাদীসের ভান্ডারে দেখতে পাই। ইমাম আহমাদ পুরো ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي اسْتِغْفَارٍ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ[٦٣])

'বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (স.) এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে এক জায়গায় অবস্থান করলেন। আমরা প্রায় এক হাজারের মত যাত্রী ছিলাম। তিনি (স.) দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন। আর তাঁর দু'চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এরপর উমার (রা.) তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন: আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। **ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** আপনার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ (স.) জানালেন, আমি আমার রাবের কাছে আমার মায়ের জন্য ইস্তেগফার করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আর তাই তাকে জাহান্নাম হতে বাঁচানোর মায়া ও চিন্তায় আমার দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়েছে।'

উপরোক্ত হাদীসগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, রাসূল (স.) উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দো'য়া করলেন। উভয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত থাকা অবস্থায় এমন দো'য়া করে একজন মুসলমান কাফেরের জন্য কি দো'য়া করবে তিনি তা উম্মাতকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আবু হুরায়রাহ্ (রা.) এর মায়ের হিদায়াতের জন্য দো'য়াও করলেন এবং সেই দো'য়া কবুলও হলো। অর্থাৎ তাঁর মা মুসলমান হয়ে গেলেন। আর নিজের মায়ের জন্য দো'য়া করার অনুমতিও পাননি। যেই কষ্টে নিজের দু'চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তারপরও মুখ দিয়ে নিজের মায়ের জন্য দো'য়ার একটি শব্দও বের হয়নি। কারণ এটিই হলো মূলতঃ ইসলামী সভ্যতা।

٦٣- فروى الإمام أحمد (٢٣٠٠٣)صححه محققو المسند، وكذا الألباني في "الإرواء" (٣/٢٢٤)

এখন আমরা নিজেরা আধুনিক সভ্যতা ও উদারতার নামে অতি মডার্ন সেজে সবাইকে খুশি করার প্রজেক্ট হাতে নিয়ে নব্য ইসলামিক সেজে বসেছি। এসব নব্য ইসলামিকদের আচরণে কী বলবো বা তাদেরকে কীভাবে বুঝাবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে অশালীন মনে হলেও একটি গল্প না বলে পারছি না। পাঠকরা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি শুধু এখানে বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য গল্পটি বলছি। কাউকে উপহাস করার জন্য নয়। একবার এক লোকের একটি অন্ডকোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কারণে নতুন একটি অন্ডকোষ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়েছিলো। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন অন্ডকোষ প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে যথা সময়ে পাঠানো হলো।

ডাক্তার Operation Theatre এ প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে নতুন কোনো অন্ডকোষ রাখা হয়নি। তাই তিনি কম্পাউন্ডারকে ডেকে বললেন এখনই একটি নতুন অন্ডকোষের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে রোগীকে কোনো ভাবেই বাঁচানো যাবে না। সময় মাত্র এক ঘন্টা। যে ভাবেই হোক তোমাকে নতুন একটি অন্ডকোষের ব্যবস্থা করতেই হবে। তা করতে না পারলে তোমারও চাকরি যাবে লোকটিও মারা যাবে। এমন কথা শোনে কম্পাউন্ডার তাড়াতাড়ি অফিস হতে বের হলো। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। কী করবে এবং কী হবে এটি ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো। চাকরি চলে গেলে বউ বাচ্চার কী হবে, আর অন্ডকোষ পাওয়া না গেলে রোগীর কী হবে ভেবে কুল পাচ্ছে না। সময়ও দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। এমন সময় একটি কুকুর তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে সে নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য কুকুটিকে ধরে যবাই করে তার একটি অন্ডকোষ নিয়ে অপারেশনের টেবিলে রেখে দিলো। ডাক্তার কোনো প্রশ্ন না করেই সেটিকে প্রতিস্থাপন করে নিলো। রোগী কয়েক দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেলো।

অনেক দিন পর ডাক্তার তার কম্পাউন্ডারের সাথে বসে খোশ আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। এসময় তিনি তাকে কোথা হতে অন্ডকোষের ব্যবস্থা করেছে তা জিজ্ঞেস করলেন। কম্পাউন্ডার পুরো ঘটনা জানালো। ঘটনা শুনে তো ডাক্তার অবাক। আর মনে মনে ভাবতে লাগলো রোগীর কী হলো। বেঁচে

আছে না মরে গেছে। কোনো অসুবিধার কথাও জানাতে আসলো না। তাহলে কি কুকুরের অন্ডকোষ মানুষের অন্ডকোষের কাজ করে। এই বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে তুললো। তাই সারাক্ষণ তিনি এটি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। হঠাৎ করে একদিন ঐ রোগীর সাথে তার রাস্তায় দেখা হলো। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে কেমন আছে এবং এখন তার কী অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ডাক্তার যেমন মূল রহস্য জানতেন না রোগীও তেমন কিছুই জানতো না। লোকটি বললো স্যার সব কিছুই ঠিক আছে তবে প্রশ্রাব করার সময় বাম পা-টি Automatically একটু উপরে উঠে যায়। কী বুঝলেন? এদের অবস্থাও তাই। ঈমান বিল কুফ্‌র তাদের অজান্তে ঈমান বিল্লাহ্‌র উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। আর তাই এরা কখন কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারে না। সাগর পাড়ে বা সমুদ্র সৈকতে উথাল পাতাল পাহাড় সমান পানির ঢেউ এবং বহু দূর হতে ভেসে আসা কোমল বাতাস, শোঁশোঁ শব্দ ও কলতান, সাগরের মাদ্দ ও জায্‌র বা জোয়ার ভাটা, অমাবশ্যার অন্ধকার রাতে আকাশের রা'আদ ও বার্‌ক্ব তর্জন-গর্জন, নিজের টাইম লাইনে হাওয়ারিয়্যীন ও হাওয়াশিয়্যীন অনুচর ও সহচরদের বাহ্‌বা দেওয়া ও মুগ্ধ হওয়া, টিনের চালে রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টির আওয়াজ, জানালার ফাঁক দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর গাছের পাতার দোল খাওয়ার দৃশ্য, সকাল বেলা শিশিরে ভেজা ফুলের আভা-প্রভা, শোভা-সৌন্দর্য এবং রাতের অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কোনো এক অজানা স্থান হতে হাস্নাহেনার ঘ্রাণ মন ও শরীরকে তাজা করে দেয়ার সেই মনোরম পরিবেশে আল্লাহ্‌র কথা যাদের মনে পড়ে না, মনে পড়ে দাদাদের এবং কবিগুরুদের কথা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি যে, আপনারা অবশ্যই ঈমানের স্বাদ ও মূল্য বুঝতে অপারগ।

আপনারা যেই গুরুদের প্রেমে মজে আছেন তাদের ধর্মের দিদিরা ও দাদারা কিন্তু ঈমানের খঁজে ব্যস্ত সময় কাটচ্ছেন। তারা যেখানে যা দেখেন সেখানেই এক স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে সময় পার করেন। পরিশেষে তারা সেই স্রষ্টাকে খুঁজেও পান। এমন সৌভাগ্যবান দিদিদের একজন হলেন, সুনিতা উইলিয়ামস। তিনি ভারতীয় দ্বিতীয় নারী। যিনি ৯.৭.২০১১ তে মহাকাশ গমন করেন। মহাকাশ ভ্রমন শেষে ফিরে এসে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণ হিসেবে তিনি প্রকাশ্যে যা

বলেছেন তা হলো, মহাকাশ হতে তিনি যখন টেলিস্কোপের মাধ্যমে নিচের দিকে তাকিয়েছেন তখন মাক্কা ও মাদীনাহ্ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। পুরো দুন্ইয়া তার কাছে তখন অন্ধকার মনে হয়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন, পৃথিবীর সকল ইন্দ্রিয় যন্ত্র বিচ্ছিন্ন থাকার পরও মহাকাশেও আযানের ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের এটিই একমাত্র কারণ বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে যারা জন্মেছে মুসলিম পরিবারে এবং বড় হয়েছে ইসলামী পরিবেশে হয়ত তাদের জন্মের পরে কানে আযানও দেয়া হয়েছে কারণ তাদের পরিবারের অনেকে পুরো জীবন কাটিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনে। নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন ইসলামের খেদমাতে তাদেরও কিন্তু বড় হওয়ার পর শিশুকালে শোনা আযানের সেই ধ্বনি এখন আর কানে বাজে না। কর্মজীবনে এসে মাসজিদের পাশে থেকেও আযান শুনতে পান না। এতে লজ্জিত না হয়ে উল্টো তৃপ্তির ঢেকুর তুলে নিজেই জগদ্বাসীকে ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়েছেন এই বলে: '.... **মা-ছেলে মিলে রাত তিনটে পর্যন্ত শিশুতোষ মুভি দেখলাম। যাই দেখি তাই ভালো লাগে। অনেক বেলা করে ঘুম ভাংলো.....।**' আরো সামনে গিয়ে লিখলেন **..... মাঝে মাঝে মনে হয় বেড়াল, কুকুর কিংবা কাক হয়ে যদি জন্মাতাম।**'

তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না যে, আল্লাহ্র রাহমাতে তার ঘুম ভাঙলে সকাল আর না ভাঙলে পরকাল। তখন কী হবে? কী নিয়ে হাযির হবেন সেখানে? **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক!** হয়ত তিনি এসব লিখে তার মানসিক কষ্টের কথা জানান দিয়েছেন। তবে মু'মিনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হাজার সমস্যা ও বিপদে থাকার পরও সময়ের পূর্বে কারো জীবন ও রিয্ক্ব কখনো শেষ হবে না। আর লক্ষ বার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের পর কারো জীবন আর অবশিষ্ট থাকবে না। রেসিং এ ফার্স্ট পজিশন অর্জনকারী ঘোড়া জানেই না যে কামিয়াবী কাকে বলে? সে তো তার মালিকের চাবুকের আঘাতে কষ্ট পাওয়ার কারণে শুধু দৌড়ায়। অতএব আপনিও যদি কখনো কষ্টের মধ্যে পড়েন তাহলে মনে করবেন আপনার মালিক আল্লাহ্ চান জয় শুধু আপনারই হোক।

আমি মনে করি ভালো মেয়েরা নিজেদের অস্থিরতাকে গান গেয়ে বা নাটক সিনেমা এবং মুভি দেখে দূর করার চেষ্টা করে না। তারা রাত জেগে

সালাত ও তেলাওয়াত এবং দো'য়ার মাধ্যমে নিজের মনের অশান্তিকে দূর করার সংগ্রাম করে। তাই মানসিক কষ্টের মধ্যে থাকা বোনদেরকে বলবো, নিজের কষ্টের সময় সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। দেখবেন ভেঙ্গে যাওয়া সকল সম্পর্ক মুহূর্তের মধ্যে জোড়া লেগে যাবে। যখনই আপনার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে চান, তখনই সালাতে দাঁড়িয়ে গিয়ে পরিবর্তনের সূচনা করুন। নিজের জীবন ও কর্ম নিয়ে কখনো অস্থির হওয়া যাবে না। কারণ সব ফায়সালা উপরেই হয় যমীনে নয়। আর মনে রাখবেন, কিছু মানুষ স্পঞ্জের স্যান্ডেলের মত পায়ে পায়ে লেগে থাকার পরও পেছনে কাপড় নষ্ট করে ফেলে।

অথচ তিনি যখন মুভি দেখে সময় পার করছেন, তখন কিন্তু ভারতের ভুপালের অধিবাসী একভাই ডাক্তার মোহাম্মাদ সেলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজ স্ত্রী মানসী আগ্রাওয়ালকে এই সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তিনি তার নন মুসলিম স্ত্রীকে বলতেন তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তাহাজ্জুদের সময় চেয়ে নাও। এটি অনেক মূল্যবান সময়। এসময়ে আল্লাহ্ সবার দো'য়া কাবুল করেন। তাই তিনি তার স্ত্রীকে একটি দো'য়া শিখিয়ে দিলেন: **'আয় মেরে রব! আগার মেরা হাজবেন্ড গলত রাস্তে পর হ্যাঁয়, তো উনকো সাহী রাস্তে পর লে আও। আওর আগার মাই গলত রাস্তে পর হুঁ, তো মুঝহে সাহী রাস্তা দেখা দো।'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার স্বামী যদি ভুল পথে থাকে তাহলে তাকে সঠিক পথ দেখাও। আর আমি যদি ভুল পথে থাকি তাহলে আমাকে সঠিক পথ দেখাও।

অতঃপর তার স্ত্রী মানসি আগ্রাওয়াল প্রতিরাতে উঠে এসময়ে কন্টিনিউ এই দো'য়া করতে লাগলেন। তাহাজ্জুদের সময় নিয়মিত উঠে সাজদায় পড়ে থাকতেন। আর দীর্ঘ সাজদাহ্ দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সব কিছু চেয়ে নিতেন। তখন তার কাছে মনে হতো, আল্লাহ্ যেন তার প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিচ্ছেন এবং তার সাথে কথা বলছেন। তখনও কিন্তু তিনি শাহাদাহ্ পড়ে ঈমান গ্রহণ করেন নি। তারপরও স্বামীর দেখানো পথে গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সময় উঠে সাজদায় পড়ে গিয়েছেন। এভাবেই তার কাছে মনে হয়েছে যে, ইসলামই হক্ব আর অন্য সব বাতিল। পরিশেষে স্বামীর

দেখানো পথে ভারতের প্রসিদ্ধ দা'ঈ শায়খ কালীম সিদ্দিকীর কাছে গিয়ে শাহাদাহ্ পড়ে ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেলেন। আর খায়রা উম্মাতিনের এই কন্যা **'অনেক বেলা করে ঘুম ভাংলো'** বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন।

এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো মোবাইল ভাইব্রেশন এ থাকা অবস্থায় তার আওয়ায আমাদের কানে আসলেও লাউড স্পীকারে মহল্লা কাঁপিয়ে মোয়ায্যিন আযান দিলোও কিন্তু আজ আমাদের কানে আসে না। তাই আমরা যখন **'অনেক বেলা করে ঘুম ভাংলো'** বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি তখন যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক ৪ লাখ ৩৩ হাজার মানুষের ওপর দীর্ঘদিন জরিপ চালিয়ে বিশ্ববাসীকে জানাচ্ছেন যে, যারা রাতে দেরী করে ঘুমায় এবং সকালে দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে, তাদের হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি। এছাড়াও আরো অনেক সমস্যার কথা উক্ত গবেষণায় গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন বলেও নিজেদের গবেষণায় জানিয়েছেন।[৬৪]

হয়ত একারণেই আমরা ছোটবেলায় মায়ের মুখে প্রবাদ শুনেছি:

Early to bed and early to rise
Make a man Healthy, wealthy and wise.

এটি শুধু নিছক একটি প্রবাদই নয়, চিরন্তণ একটি সত্য কথাও বটে। এ সত্যটিকে বৃটিশ গবেষকরা জোরালো করে আমাদেরকে আজ পুনরায় জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) চৌদ্দশ উনচল্লিশ বছর পূর্বে বলেছেন:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ)[৬৫]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে বলা হলো, লোকটি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলো। সালাতের জন্য উঠেনি। এটি শুনে রাসূল (স.) বললেন: সে এমন একজন লোক যার কানে শায়ত্বান প্রস্রাব করে দিয়েছে।'

৬৪- বিস্তরিত দেখুন: 26th August-18, bbarta24 Net.

٦٥- روى البخاري (١١٤٤) ومسلم (٧٧٤) والنسائي (١٦٠٨) وابن حبان (٢٥٦٢)

এখানে উল্লেখ্য যে, সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়া এবং সকাল সকাল ঘুম হতে জেগে উঠা রাসূল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ্ও বটে। আল্লাহ্ নিজেও রাতকে ঘুমানোর জন্য এবং দিনকে কাজ করার জন্য বানিয়েছেন বলে ক্বোরআনে বলেছেন। একবার একজন জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, সকাল বেলার বাতাস এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ কেন? উত্তরে তিনি বললেন: সকালে মুনাফেক্বরা ঘুমিয়ে থাকে তাই। আমি এখানে কাউকে মুনাফিক্ব বলছি না। আমি এখানে বুঝাতে চেয়েছি যে, কেউ যদি কোনো গুনাহ করে ফেলে তা প্রকাশ করা কোনো ভাবেই উচিৎ নয়। কারণ অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যাওয়া বা করে ফেলা নিজের অপরাধ এভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে বলে বেড়ালে অন্যরাও এটিকে সহজ ভাবে নিয়ে তারাও এমন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া মানুষের মনে খারাপ ধারণাও জন্ম নিতে পারে। তাই অপবাদের সুযোগ হতে বেঁচে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। যুগ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন' এ এমন একটি উপদেশ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীস বিশারদগণ এটিকে হাদীস বলেননি। মূলতঃ এটি একটি ভালো উপদেশ। তা হলো:

(اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ)[٦٦]

'তোমরা অপবাদের জায়গা হতে বেঁচে থাকো।'

তাই বলছিলাম, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এমন কথা বা ধারণা সৃষ্টি হওয়াটা অমূলক নয়। কারণ এমন একটি ঘটনা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে দেখতে পাই। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَنْ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا

[٦٦] - أورده الغزالي في "الإحياء" (٣ / ٣١) وقال مخرجه الحافظ العراقي، لم أجد له أصلا. وكذا قال السبكي في "الطبقات" (٤ / ١٦٢) وقد روي موقوفا نحوه فانظر " شرح الإحياء " للزبيدي (٧ / ٢٨٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة... للألباني/المجلد الأول: حديث رقم(١١٣).

بَلَغَتْ باب المَسْجِدِ عِنْدَ باب أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنْصار، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقال لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقالا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئاً)[৬৭]

'আলী ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর স্ত্রী সাফিয়্যাহ্ (রা.) বলেছেন: তিনি রামাদ্বানের শেষ দশ দিনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে মাসজিদে এ'তেকাফ অবস্থায় দেখতে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় এক ঘন্টা তাঁর সাথে কথা বললেন। এরপর তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাকে বিদায় দেয়ার জন্য তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি যখন মাসজিদের দরজা **বাবু উম্মে সালামাহ্** পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন আনসারদের দুইজন লোক যাচ্ছিলো। তারা দুইজনেই রাসূলুল্লাহ্কে সালাম করলেন। রাসূল (স.) তাদের দুইজনকে বললেন: তোমাদের অবগতির জন্য বলছি ইনি সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই। এটি শোনে তারা দুই জনেই বলে উঠলেন **সুবহানাল্লাহ্ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** এই কথাটি তাদের কাছে অনেক বড় লেগেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: শায়ত্বান মানুষের মাঝে রক্তের মত চলাচল করে। তাই আমি ভয় করছিলাম সে তোমাদের অন্তরে কোনো সন্দেহ না সৃষ্টি করে দেয়।'

উপরোক্ত হাদীসটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই, ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং আনসারদের মাঝের ঘটনা। আকাশের নীচে যমীনের উপরে এর চেয়ে পবিত্র অন্তরের অধিকারী আর কেউ নেই। তারপরও সেখানে আল্লাহ্র রাসূল (স.) নিজ স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে সন্দেহ সৃষ্টির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এছাড়াও আল্লাহ্র রাসূল (স.) বলেছেন: গুনাহ্ করে যে প্রকাশ করে সে আল্লাহ্র ক্ষমা হতে বঞ্চিত হবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন:

---

[৬৭] - البخاري، كتاب الإعتكاف، باب المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، رقم الحديث: ٢٠٣٥

(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ) [৬৮]

'সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: আমার উম্মাতের গুনাহ্ মাফ হবে। তবে যে প্রকাশ্য গুনাহ্ করে অথবা গুনাহ্ করে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় তার গুনাহ্ মাফ হবে না। প্রকাশ্যে গুনাহ্ অথবা গুনাহ করে বলে বেড়ানো হলো, একজন লোক রাতে কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা গোপন রেখেছেন; কিন্তু সকালে লোকটি নিজেই বলে বেড়ায় যে, হে অমুক অমুক! শোন, গত রাতে আমি এমন এমন কাজ করেছি। রাতে তো মহান আল্লাহ্ তার গুনাহ্ আবরণের আড়ালে গোপন করে রাখলেন। আর সকালে সে নিজেই আল্লাহ্র আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে নিজের অন্যায় কাজের কথা ফাঁস করে দিল।

আল্লাহ্ দয়া করে মানুষকে আশরাফুল মাখলুক্বাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর এখন সেই সৃষ্টি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে উল্টো হায়ওয়ান ও জানোয়ার হওয়ার কামনা করছে। তাও আবার সেই সৃষ্টি একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মাঝে **'কোয়ালিটি এন্ড মোরালিটি'** তৈরীর কাজে মগ্ন। কাপড়ে চোপড়ে মানুষ না হয়ে সৎচরিত্রের গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে সত্যিকারের মানুষ হয়ে আল্লাহ্কে চেনার ও জানার রাস্তা যার দেখানোর কথা, সে নিজেই এখন নিজের টাইমলাইনে **'মাঝে মাঝে মনে হয় বেড়াল, কুকুর কিংবা কাক হয়ে যদি জন্মাতাম'** লিখে নিজের মানুষ হওয়াকে অপছন্দ করছে। এরা পাগল না ছাগল? তবে মানুষ হলেও হয়ত এদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ বলেছেন **'উলাইকা কাল্ আন্'আম বাল হুম আদ্বাল্ল'** অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও অধম। এ

৬৮- رواه البخاري، رقم الحديث: ٦٠٦٩

প্রসংগে একটি কথা মনে পড়েছে, কোথায় যেন পড়েছিলাম, নারী জীবনের সকল মোড়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতে জানে। এটি তার একটি মহৎ গুণ। কারণ নারী যদি গোপনীয়তা রক্ষা না করে তাহলে সমাজে একজন পুরুষও মুখ দেখাতে পারবে না। পারিবারিক জীবন হোক বা সামাজিক জীবন, পুরুষের কোনো জীবনের গোপনীয়তাই নারীর কাছে গোপন থাকে না। কিন্তু এই বোনটি আমার সেই বিশ্বাসের প্রাচীর প্রকাশ্যে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। মানুষের মনে অনেক কিছুই করার এবং অনেক মনোবাসনা পূরণের স্বপ্ন থাকে। এসব মনোবাসনা যদি সবার চেহারায় ভেসে উঠতো তাহলে সমাজের কেউ লজ্জায় ঘর হতে বের হতো না। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষের মনে অনেক কিছুই আসতে পারে তবে সব বলা যাবে না। কারণ বলার আগে নিজের বয়স এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানসহ কর্মস্থল সম্পর্কে ভাবতে হয়।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এরা নিজের ভুল শুধরে না নিয়ে উল্টো এটিকে সাহিত্য বলে চালিয়ে দেয়ার দুঃসাহস এবং মূর্খতাও দেখায়। এসব দেখে আমার একটি কথা মনে পড়েছে। তা হলো, মানুষকে কখনো তার দুর্বলতা বা বিনীত মনোভাব সাগরে ডুবায়নি; বরং তার অহংকারই তাকে শুধু সাগরে নয়, শুকনো উঠোনেও ডুবিয়েছে। তাই আমি মনে করি যে সাহিত্য মানুষের মনে **'বেড়াল, কুকুর কিংবা কাক হয়ে জন্মানোর'** আকাঙ্খা সৃষ্টি করে এবং সেটিকে প্রতীকী অর্থে ফেরেশ্‌তা হওয়ার তামান্না বোঝার পথ দেখিয়ে রাস্তা-ঘাটের মানুষকে মুগ্ধ করে সেটি সাহিত্য নয়, সেটি চরম মূর্খতা ও খোদা বিমুখতা।

যে সাহিত্য মানুষের মনে **বেড়াল, কুকুর কিংবা কাক হয়ে জন্মানোর** আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং পাঠকদের মাঝেও এসব বন্য পশু হয়ে জন্মানোর জন্য ওকালতি করে সেটি কোনো শিক্ষা নয়, সেটি সম্পূর্ণ কু-শিক্ষা। যে সাহিত্য তার পাঠকদেরকে **বেড়াল, কুকুর কিংবা কাক হওয়ার** জন্য প্ররোচণা দেয় সেটি সাহিত্য নয়, সেটি নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতা। কারণ মানুষ হয়ে জন্ম নেয়া এটি মানুষের চয়েজ নয়। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।

তবে নিজের মধ্যে মানবীয় গুণ সৃষ্টি করা মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আরো বোধগম্য করে এবং পরিশীলিত করে বললে আল্লামা ইক্ববালের ভাষায় বলতে হয়:

اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ/ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ
نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ/ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ

'আল্লাহ ছে করে দূর তো তা'লীম ভী ফিত্না,
ইমলাক ভী আওলাদ ভী জাগীর ভী ফিত্না।
না হক্ব কে লিয়ে উঠ্হে তো শমশের ভী ফিত্না,
শমশের হী কেয়া না'রায়ে তাকবীর ভী ফিত্না।

'অর্থাৎ যে শিক্ষা আল্লাহ্ হতে দূর করে সেটি শিক্ষা নয় সেটি ফিত্না। ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও ফিত্না। অন্যায়ভাবে তলোয়ার উঠনোও ফিতনা। তলোয়ার কেন অন্যায়ভাবে না'রায়ে তাকভীর দেয়াও ফিত্না।'

তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, যারা এসব সাহিত্য পড়ে ও পড়ায় এবং এর পক্ষে ওকালতি করে তারা উভয়ে স্বগোত্রীয়। এসব অনর্থক বর্ণনা ও কল্পনায় যারা আজ অদ্ভুত রকমের প্রশান্তি পাচ্ছে বলে কমেন্ট করে দিনের পর দিন ঘুমিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করছে তারা নিজের জীবনের মূল্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই দুন্ইয়ার জীবনে তাদের কমেন্টে খুশীতে গদগদ হলেও এরা যখন সাহিত্য নামের এসব আবর্জনা পড়ে পথভ্রষ্ট হবে তখন তারাই আখেরাতে আল্লাহ্র ট্রাইবুন্যালে তাদের এসব তথাকথিত দার্শনিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠবে:

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾[৬৯]

'হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লা'নাত বর্ষণ করো।'

৬৯- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৬৭-৬৮

মুসলিম উম্মাহ্‌র তথাকথিত মডার্নদের মাঝে এই রোগের Symptom বা লক্ষণ বহু আগেই উম্মাহ্‌র কর্ণধাররা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সাহিত্যের নামে আবর্জনা সৃষ্টির রাস্তা বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌর **নাদওয়াতুল ওলামার ক্যাম্পাসে** সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইসলামিক স্কলারদেরকে নিয়ে আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী **'আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'** প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রথম একটি ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজন করেন। আল্লামা নাদভী **'আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'** প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখবেন না কেন? এটি তো নাদওয়ার কাজ। আর তাই পুরো বিশ্বে নাদওয়া এবং নাদভীদের প্রসিদ্ধ একটি পরিচিতিও রয়েছে। তা হলো, **'ফার্‌য কি পাবন্দী, সুনান কা ইহ্‌তেমাম, জায়েয দায়েরে মে রাহ্‌ কর, কিস ওয়াক্ত কিস চীজ কি কেতনি জরুরাত, উসকো সামঝনে কা নাম নাদওয়া। আউর জো সামঝতা হ্যা উহ্‌ নাদভী হ্যায়।'**

অর্থাৎ ফার্‌যের বাধ্যবাধকতা সুন্নাতের গুরুত্ব ও পুরো বন্দোবস্ত, জায়েয গন্ডির মধ্যে থেকে কখন কোন্‌ জিনিসের কতটুকু প্রয়োজন সেটি বোঝার নাম হলো নাদওয়া। আর যারা এটি বুঝতে পারে তারাই নাদভী। এই ১৯৮২ সালের মে মাসে সাউদী আরবের মাদীনাহ্‌ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আল্লামা নাদভীর আহবানে দ্বিতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় আলোচনা সভাটিও তাঁর আহবানে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে সাউদী আরবের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী স্কলারদের প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালের ২৪ নভেম্বর আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভীকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে **'আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'** প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়।

তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, গুনাহ্‌ মানুষ করে। তবে বলে বেড়ানোর মত বোকামী এবং মনের সব কথা প্রকাশ করাটা কোনো ভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। শায়ত্বানের প্ররোচনায় অনেক কথাই মানুষের মনে আসতে পারে। মানুষ হওয়ার কারণে অনেক পাপ কাজ হয়েও যেতে পারে। কিন্তু নিজেকে শুধুমাত্র মডার্ন বোঝানোর জন্য নিজের জীবনের অপকর্ম প্রচার

করাকে আধুনিকতা মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব করে নিজেকে মডার্ন পরিচয় দিলেও মানুষ কিন্তু ঠিকই এদেরকে গর্দভ বলে। পরিশেষে আমও যাবে ছালাও যাবে। আল্লাহ্ ক্বোরআনে নিজেদের অপকর্মকে বলে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পরিষ্কার বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾[৭০]

'যারা চায় মু'মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা দুন্ইয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ্ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ)।'

আল্লামা মওদুদী (রাহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "আয়াতের শব্দাবলী অশ্লীলতা ছড়াবার যাবতীয় অবস্থার অর্থবোধক। কার্যতঃ ব্যভিচারের আড্ডা কায়েম করার উপরও এগুলো প্রযুক্ত হয়। আবার চরিত্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সে জন্য আবেগ-অনুভূতিকে উদ্দীপিত ও উত্তেজনাকারী কিস্সা-কাহিনী, কবিতা, গান, ছবি ও খেলাধূলার উপরও প্রযুক্ত হয়। তাছাড়া এধরণের ক্লাব, হোটেল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এর আওতায় এসে যায়, যেখানে নারী-পুরুষের মিলিত নৃত্য ও মিলিত আমোদ ফুর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ক্বোরআন পরিষ্কার বলেছে, এরা সবাই অপরাধী। কেবল আখেরাতেই নয়, দুন্ইয়ায়ও এদের শাস্তি পাওয়া উচিৎ।" [৭১]

পাঠকরা মনে করতে পারেন, লেখক এখানে অনেক বেশী বলেছেন। অনেকেই এমন মন্তব্য এবং এমন স্ট্যাটাস প্রতিনিয়ত নিজের টাইমলাইনে দিয়েই চলছে। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো, যারা এসব করছে তারা না বুঝেই করছে। তাই এখানে তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে,

---

৭০- সুরাতুন নূর, আয়াত নং- ১৯-২০
৭১- তাফহীমুল ক্বোরআন, খন্ড - ৯, পৃষ্ঠা - ১৩৮

মুসলমানদের জন্য হাদীসের ভাষায় সহযোগী দ্বীন ও সভ্যতা হিসেবে পশ্চিমা সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে পশ্চিমা সভ্যতার উত্থান পৃথিবী ব্যাপী মুসলমানদের দা'ওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য Great opportinity বা বিশাল একটি সুযোগ মনে করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। যেটিকে ব্যবহার করে মুসলমানরা আধুনিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ভাষায় বিশ্বব্যাপী ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ খুব সহজেই করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দা'ওয়াত ও তাবলীগের চেয়ে বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামের সোনালী যুগ নিয়ে গর্ব করার মানসিকতা কাজ করছে বেশী। মুসলিম পরিবারে জন্ম, ইসলামী প্রতিষ্ঠানে চাকরি। মুসলিম সমাজে বাস এবং মুসলিম ফ্যামিলিতে বিয়ে। মৃত্যুর পর মুসলমানদের কবরস্তানে কবর এবং পরিশেষে সবাই উচ্চস্বরে বলে উঠবে:

(بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)[৭২]

'বিসমিল্লাহে ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ।' এবং

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾[৭৩]

'এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এই থেকেই আবার তোমাদেরকে বের করবো।'

ব্যাস আর কী লাগে। অথচ এসব না পড়লেও কিছু হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সহীহ্ কোনো হাদীসে মাটি দেয়ার সময় এই আয়াত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ফুক্বাহাদের কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন।[৭৪]

٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ.

৭৩- সূরা ত্বাহা, আয়াত নং-৫৫

৭৪- বিস্তারিত দেখুন:(١٠٣ /١) "أحكام الجنائز *

* مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (١٨٥ /١٧)

তবে প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, নিজের ঈমান ও আমল ঠিক না থাকলে পড়লেও কোনো কাজে আসবে না। তাই আমরা বলতে পারি এমন অদ্ভুত মানসিকতাই আজ মুসলমানদেরকে যুগের ধারা থেকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পেছনের সারিতেই স্থান করে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছে। আমরা এই ছিলাম সেই ছিলাম **'পেদারম সুলতান বুদ'** বা আমার বাবা রাজা ছিলেন বলে অনর্থক সময় নষ্ট করছে। এসব দেখে অনেক সময় আমার মনে হয় মুসলিম উম্মাহ্ বাস্তবতা বুঝতে শুধু অক্ষমই হয়নি; বরং পশ্চিমা সভ্যতা যে বর্তমান বিশ্বে দা'ওয়াতের ক্ষেত্র তৈরী করেছে এটি বোঝার প্রয়োজনও মনে করেনি। তাই পশ্চিমা সভ্যতাকে শুধু গাল মন্দ করে নিজের সোনালী অতীতের কাহিনী শুনাচ্ছে। আমি মনে করি আপনি সঠিক হলে প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। সঠিকই থাকুন। একদিন জামানা বলে উঠবে আপনি সঠিক। তবে মনে রাখবেন এমন অন্ধের চিকিৎসা কখনো হবে না যে অন্ধ প্রতি কদমে কদমে হোঁচট খায়, তারপরও কিন্তু সে নিজেকে অন্ধ হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমা সভ্যতাকে ইসলামের সমর্থন করার পজিশনে ছিলো। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলমানদের মাঝে বাস্তবতা অনুধাবনের মানসিকতার অনুপস্থিতি পশ্চিমা সভ্যতাকে ইসলাম বিরোধী বানিয়ে ফেলেছে। লাভের বেলায় সমগ্র বিশ্বের মুসলমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অথচ পশ্চিমা সভ্যতা ছিলো ইসলামের আনুগত্যের সভ্যতা। কারণ যেই সভ্যতা মানুষকে মানুষ রাখছে না এবং নারীকে নারী রাখছে না, তাই সেখানে প্রকৃতিগতভাবে নিজেদের চাহিদা অপূরণীয় থেকেই যায়। তাই নিজেদের স্বভাবগত চাহিদা পূরণের একমাত্র জায়গা হিসেবে তারা ইসলামকেই খুঁজে পাচ্ছে। তাদের এই মনোভাবটিই সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের জন্য ইসলাম প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এটিকে ব্যবহার করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামের বিশ্বময় পয়গামের সকল অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের পথ দেখিয়ে চলেছে। আর এখানেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছোট-বড় সবার ঘরে ঘরে ইসলামের আলোর মশাল জ্বালানোর সুযোগ

ছিলো বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলমানরা এমন একটি বাস্তবতা অনুধাবনে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। কারণ ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই Violent Activism অবলম্বন করে কখনো কেউ জয়ের মুখ দেখেনি। যার প্রমাণ ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে পাঞ্জাবের শিখেরা Violent Activism এর মাধ্যমে খালিস্তান নামে তাদের জন্য পৃথক একটি স্বাধীন ভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তারা শুধু পরাজিতই হয়নি; বরং বর্তমান পাঞ্জাবের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কেউ আর এখন এমন স্বপ্ন দেখার ইচ্ছাও পোষণ করে না। অথচ অন্য দিকে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ এর পূর্বে সাধারণ নাগরিকদের মাঝে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য Non-Violent Activism এর পন্থা অবলম্বন করে ছিলেন। তিনি Public Agitation এর মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে বৃটিশ সরকারকে চাপের মধ্যে রাখতে পেরেছেন এবং তিনি জয়ীও হয়েছেন। শেষ পন্থাটি হলো Political Activism যা নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব। তবে এই যুদ্ধে কখনো সরকারী দলের পতন ঘটে আবার কখনো বিরোধী দলের উত্থান ঘটে। কিন্তু এ গুলোর কোনোটিকেই আমরা Islamic Activism বলতে পারছি না। কারণ ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে Da`wah Activism হলো সর্বোত্তম পন্থা। এই কাজের জন্য এখন বিশ্বব্যাপী বহু Da`wah Center স্থাপন হয়েছে। এই পথে কোনো দরাদরি নেই। নেই মন কষাকষি। আনন্দঘন ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে এই কাজ চলে।

এখানে কাউকে 'বাধা' বা 'প্রভাবিত' করার পরিবর্তে তার মন জয়ের টার্গেট নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। তার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় নয়; বরং তাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই তার আঙ্গিনায় দা'ঈদের আগমন ঘটে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী-শত্রু, প্রতিপক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টির পরিবর্তে সহানুভূতিশীল, উপদেশ ও পরামর্শদাতা এবং শুভাকাঙ্খি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে। পরস্পরের সাথে বিষণ্নতা ও বিমুখতার পরিবর্তে প্রেম-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-অনুরাগ, আদর-স্নেহের জন্ম হয় সমাজে। পরিবেশ হয়ে উঠে সর্বত্র একটি কাঙ্খিত ও জান্নাতি পরিবেশ। অতএব সকল পরিবেশের চাবি-কাঠি আমাদের হাতে।

শুধু শুধু পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে বলে চেঁচামেচি করলে কোনো লাভ হবে না। তাই একজন পশ্চিমা মনীষী বলেছেন :

You can meet friends every where but you cannot meet enemies every where, you have to make them.

'আপনি সব জায়গায় বন্ধু পাবেন কিন্তু শত্রু পাবেন না। শত্রু আপনাকে বানাতে হবে।'

কত চমৎকার ও মূল্যবান কথা। মানবীয় সমাজ ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই প্রত্যেক মানুষকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়। মানব সমাজের এমন পরিবেশই হলো স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম হওয়াটাই হলো অস্বাভাবিক। এমন কাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া বা হলেও তা হাত ছাড়া হওয়ার মূল কারণ হলো ধৈর্য। আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। অথচ ধৈর্য হলো একটি বড় ইবাদাত। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। ধৈর্য ধারণ করতে পারলেই আল্লাহ্ তার সাথে থাকবেন বলে ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন। ধৈর্য ধারণ করে মানুষ আখেরাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করে জান্নাত পাবে শুধু তা নয়; এই দুন্ইয়াতেও তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে হলে জাপানের দিকে তাকান সূর্যের চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পাবেন তাদের অবস্থান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার হাতে মার খাওয়া জাপান Science & Technology এর রাস্তা অবলম্বন করার কারণে কোথায় আজ তাদের অবস্থান। বর্তমান বিশ্বের কেউ জাপানের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা স্বপ্নেও তাদের সমান হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলো আজকের জাপান। ১৯৪৫ সালে আমেরিকান সৈন্যরা জাপানে ঢুকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সেখানে বীর দর্পে অবস্থান করে নিজের ইচ্ছেমত যা খুশী তা করেছিলো। সেদিন তাদের জন্য এমন একটি সংবিধান রচনা করা হয়েছিলো যেখানে লিখা ছিলো:

Land, Sea and air froces, as well as other war potential,
will vever bi maintained.

এমন সংবিধান রচনায় যে কোনো দেশ ও জাতির অপমৃত্যু ঘটে। এটি বলার ও বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই।
অনুরূপভাবে আমেরিকার সেনা জেনারেল Douglas Mac Arthur আফগানিস্তানে কারযাই এবং ইরাকে আলভীর মাধ্যমেও এটি করেছে। এটি আমেরিকার পুরাতন অভ্যাস। তবে এই অপমৃত্যুকে জাপানীরা মেনে নিয়ে যুদ্ধের রাস্তা বন্ধ পেয়ে Science & Technology এর খোলা রাস্তায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভাঙ্গা চুরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনের গাড়ি দৌড়াতে লাগলো। মাত্র চল্লিশ বছর পর পৃথিবীর সুপার পাওয়ারদেরকে ডিঙ্গিয়ে উন্নতির চুড়ায় পৌঁছে গেলো। আর বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা মাথায় হাত রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে চুড়ান্ত সীমায় তাদের দৃষ্টি পৌঁছার আগে ঘাড়ে ব্যথা শুরু হওয়ার কারণে দৃষ্টি নীচু করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে।

তাই তাদের ইতিহাসবিদদের Ezra F. Vogel নামক একজন ইতিহাসবিদ Japan As Number One : Lessons for America নামে একটি বই লিখে তাদের উন্নতিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। উক্ত বইতে তিনি নির্দ্বিধায় লিখে ফেলেছেন:

Defeated in World War II (1945). Japan emerged from the ruins of war as one of the major economic power in the world.[75]

জাপানীরা বিশ্বকে শিখিয়ে দিলো সংকটময় বর্তমানকে ধৈর্যের সাথে অলিঙ্গন করতে পারলে ভবিষ্যতের সুন্দরতম জীবন শুরু করা সম্ভব। অন্যের প্রভাবে নিজের অস্তিত্ব হারানোর পরিবর্তে তারা এখন পরিবর্তনের প্রভূতে পরিণত হলো। বহিরাগত আক্রমণে যেখানে অন্যান্য রাষ্ট্র ধ্বংস হতে বাধ্য হয়েছে সেখানে জাপান শক্তি লাভ করেছে। অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং ভালো করে বুঝতে হবে, যারা বর্তমানকে অস্বীকার করবে তারা আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ হতে বঞ্চিত হবে। পরিশেষে মনীষীদের ভাষায় বলবো:

75- Ezra F. Vogel, Japan As Number One : Lessons for America, Harvard University press. May 1979.

Starve the problems, feed the opportunities.

সংকটের সময় আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সকল সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের আজকের চেয়ে আগামী কাল অবশ্যই ভালো হবে। এটি সেদিন সম্ভব যে দিন আমরা একবাক্যে বলতে পারবো:

I never lose, winning team is my team.

সে দিন দেশে বিদেশে সর্বত্র আমাদের সভ্যতার জয়ের বিউগল বেজে উঠবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সত্যটি উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন। আ-মী-ন।[৭৬]

৭৬- বিস্তারিত দেখুন: লেখকের প্রবন্ধ 'ওআইসিতে বাংলাদেশের পরাজয় হলেও ভবিষ্যৎ ভাল' ৫ জুলাই ২০০৪ দৈনিক ইনকিলাব।

ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আগমনের পর পৃথিবীতে যে সভ্যতা জন্ম নিয়েছিলো সেই সভ্যতার মৌলিক মূল্য নিরূপণ ছিলো ধর্মাচরণ। সেই সভ্যতার শেকড় যুক্ত ছিলো ঐশিগ্রন্থ আল্ ক্বোরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্র সাথে। এর অর্থ ছিলো মানব সমাজ এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে এবং তার সাথে কোনো শারীক করা যাবে না। তাই আক্বীদাহ্ ও ইবাদাহ্ সম্পর্কীয় সকল বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্র সাথে সম্পৃক্ততাকে মানব সমাজের মেরুদন্ড মনে করা হতো। মানব জীবনের সব কিছুকে ঈমান বিল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট করে রাসূলের বাত্লানো মত ও পথকে অনুসরণ ও অনুকরণ করাই ছিলো ইসলামী সভ্যতার মৌলিক পরিচয়। মোটকথা, **ইসলামী সভ্যতায় রাব্বুল 'আলামীনকে পেতে হলে রাহ্মাতুল লিল্'আলামীনের আনুগত্য করতে হবে।**

তাই সকল মানুষের স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করা ইসলামী সভ্যতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তবে কোনো মানুষই ইবাদাত হতে মুক্ত থাকতো না। সবাই ইবাদাত করতো। এ সব কারণে ইসলামী সভ্যতার নৈতিক চরিত্র নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন যেমন ছিলো না, তেমনি কেউ কোনো সন্দেহও করতো না। কারণ তারা জাহেলী যুগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলো। রাসূলের প্রতি আল্লাহ্র ওহী এবং সমাজ সংস্কারকের প্রতি তাঁর ইলহামের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এই সভ্যতার শুদ্ধকরণ হতো। তাই উক্ত সভ্যতার কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ মূলতঃ সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন যে, নিজেদের সকল চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার এই সভ্যতার আলোকেই উপস্থাপন করতে হবে। অতঃপর তাদের চিন্তার ফসল হিসেবে তদানীন্তন সামাজিক যে রীতি-নীতি জন্ম নিয়েছিলো সেটি প্রায় হাজার বছর পর্যন্ত মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ও পৃথক একটি মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করছিলো। উক্ত সভ্যতা যে তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তা হলো:

(ক) লজ্জাস্থানের হিফাযাত
(খ) বংশ-মর্যাদার হিফাযাত
(গ) সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ।

লজ্জাস্থানের হিফাযাতের কথা বলে সমাজে ব্যভিচার ও পাপাচারকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। তাই ইসলামী সভ্যতায় যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। নারী-নারীর সাথে অথবা পুরুষ-পুরুষের সাথে কোনো ধরণের যৌন সম্পর্ক করতে পারবে না শুধু তাই নয়; বিয়ে বহির্ভূত নারী-পুরুষের সকল সম্পর্ক ইসলামী সভ্যতায় অত্যন্ত ঘৃণিত। তাই একে অপরের সামনে নিজ শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো প্রকাশ করতে এবং স্বামী-স্ত্রী নিজেদের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে কখনো অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারবে না বলে তদানীন্তন সমাজের মানুষরা ঐক্যমত পোষণ করেছিলো। এ সবই হলো ইসলামী সভ্যতার পরিচয়।

বংশ-মর্যাদার হিফাযাতের অর্থ হলো জন্মসূত্রে সকল মানব সন্তান এক। সবাই এক আদমের সন্তান। তাই মানবাধিকারও সবার সমান। কিন্তু আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্কের দিক দিয়ে সবাই ভিন্ন। ছোটদের জন্য বড়, সন্তানের জন্য মা-বাবা, ছাত্রের জন্য শিক্ষক এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। অতএব ইসলামী সভ্যতায় এসব ব্যক্তিরা অন্যদেরকে শাসন, সংশোধনসহ শৃঙ্খলা ও শুদ্ধিকরণের অধিকার রাখেন। তাদের ইয্যাত ও সম্মান সর্ব মহলে সর্বদা স্বীকৃত বলেও মেনে নেয়া হয়।

সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাঁধা দানের অর্থ হলো সমাজ ভালো-মন্দ হতে সম্পর্কহীন থাকতে পারবে না। যার যা খুশী তা করতে পারবে না। মানব স্বভাব যে জিনিসকে খারাপ, গর্হিত ও কৃৎসিত মনে করবে এবং পুরো মানবতা যেটিকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে সে সব কথা ও কাজ হতে অবশ্যই অন্যদেরকে বিরত রাখতে হবে। ইসলামী সভ্যতার এই ধারাবাহিকতা মানব সমাজের সৌন্দর্য এবং সভ্য সমাজের পরিচয় দানকারী বলে সর্ব মহলে স্বীকৃত ছিলো। অতএব এখানে কোনো ধরনের বিকৃতি বা পতন ঘটলে পুরো মানব সমাজ আক্রান্ত হবে এবং অধঃপতনের গহবরে হারিয়ে যাবে বলে মনে রাখতে হবে।

মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আজকের মানুষরা যেভাবে উদগ্রীব যদি তারা উল্লেখিত সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঠিক তেমনিভাবে উদগ্রীব হতো তাহলে মানব সমাজ এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্বর্গীয় জীবন উপভোগের সুযোগ পেয়ে যেতো। বর্তমান পৃথিবীতে যতো সব সভ্যতা ও সংস্কৃতি রয়েছে সব সভ্যতার মাঝে কিছু কিছু বিষয়ে কোনো

পার্থক্য নেই। আবার অনেক বিষয়ে একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত। মানব সমাজের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে যা সব সভ্যতায় এক। যেমন ইনসাফ, আমানাতদারী, সততা সব সভ্যতায় একক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অনুরূপ সকল সভ্যতায় ঘাতক, খুনী, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, আক্রমণকারী, প্রতারক, ধোকাবাজ, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, অনৈতিকতা, অসততা, ব্যভিচার, পাপাচার, অনাচার, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা এবং আমানাতের খেয়ানাতকারীসহ সকল অপরাধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করার দাবী বয়েছে সকল সভ্যতা ও সকল সমাজে।

কিছু বিষয় এমনও রয়েছে, যা নিয়ে বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে শুধু তাই নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানও দেখা যায়। এমন কিছু বিষয়ে ইসলামী সভ্যতা এবং পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে এক বিশাল পার্থক্য ও ব্যবধান রয়েছে। ইসলামী সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এই সভ্যতার সকল মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র ইবাদাত অত্যন্ত সু-স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যা অন্য সভ্যতায় সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক অনুপস্থিত। অন্য সভ্যতায় যে সবের পূজা দেয়া হয় তা অনেকের কাছে বিবেক বিবর্জিত ও অনর্থক বলে মনে হয়।

কারণ মুসলমানের প্রতিটি আচরণসহ কথা ও কাজে তার সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পাই কোনো মুসলমান যখন অন্য কোনো মুসলমানের সাথে মিলিত হয় তখনই সে সর্ব প্রথম সালামের মাধ্যমে কালাম শুরু করে। সঠিক অর্থে ইসলামী পরিবারের লোকজন কথা বলার মাঝে বার বার **'ইন্ শা আল্লাহ্'** বলতে থাকে। কখনো কখনো **'আল্ হামদু লিল্লাহ্'** বলে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানান দেয়। বিদায় বেলায় একে অপরকে **'ফী আমানিল্লাহ্'** বা **'আল্লাহ হাফেয'** বলে নিজের ইসলামী সভ্যতার প্রকাশ ঘটায়। আর তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, আমেনা মহসিন এবং দেলোয়ার।

Bangladesh: Facing challenges of radicalaisation and violent extremism

শীর্ষক যৌথ গবেষণা করে জাতিকে এক মহা সংবাদ জানিয়েছে। তা হলো, তাদের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, মেয়েদের হিজাব ও নিকাব, ছেলেদের গোড়ালির উপরে প্যান্ট, সম্ভাষণ বিদায়সহ দৈনন্দিন নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কথা-বার্তায় আরবী শব্দের ব্যবহার নাকি উগ্রবাদের লক্ষণ।

তাদের গবেষণার এহেন ফলাফল জেনে আমার মনে হলো, এরা থাকতে এদেশের যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের জন্য জঙ্গি আর বাংলা ভাই ও ইংরেজী ভাইয়ের কি দরকার? এরাই যথেষ্ট।

এখন প্রশ্ন হলো, আরবী শব্দের ব্যবহার যদি উগ্রবাদের লক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে উগ্রবাদের জন্মদাতা তারাই। এটি জানার জন্য গবেষণার দরকার নেই। কারণ তাদের নিজেদের নামও আরবী। এটি তারা একবারও ভাবলো না। এসব গাঁজাখোরী গবেষণা করে তারা জাতিকে বেকুফ বানিয়ে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে চায়, আমরা তা বলতে না পারলেও এতটুকু অবশ্যই বলতে পারি, এদের প্ররোচনায় নারী উলঙ্গ হচ্ছে আর পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। পশ্চিমারা ইসলামেকে গাল-মন্দ করে নারীকে ঘর হতে বের করে চৌরাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে বলে তাদের সমাজের নারীরা যখন তখন রেপিং এর শিকার হচ্ছে। আর তাদের রাষ্ট্র ধর্ষণের তালিকায় Top ten countries এর শিরোপা জিতেছে। অতএব এসব গবেষণা চলতে থাকলে হয়ত আমাদের দেশও উল্লেখিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে, **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক**।[৭৭]

ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানরা নিজেদের ঘর-বাড়ী, মাসজিদ-মাদরাসাহ্ এমন কি টয়লেট নির্মাণেও ইসলামী সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্মাণ করে থাকে। তাই বর্তমান পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন আপনি সেখানকার ইমারাত ও ঘর-বাড়ী দেখে ইসলামী সভ্যতার গন্ধ খুঁজে পাবেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, বর্তমান পৃথিবীতে এমনও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে মুসলমানদের ফিজিক্যালী কোনো অস্তিত্ব খুঁজে না পেলেও এবং কাগজের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে বা কলমের কালীতে লিখিত কোনো সাক্ষী না থাকলেও সেখানকার প্রকৃতি ও নির্মাণশিল্প আপনাকে কোনো এক সময়ে সেখানে মুসলমানদের উপস্থিতি এবং অবস্থানের কথা অত্যন্ত আমানাতদারীর সাথে জানান দেবে।

এখানেই শেষ নয়, প্রত্যেক মুসলিম দৈনিক তার রাব্বের সামনে পাঁচবার সালাতে গিয়ে দাঁড়ায়। রুকু এবং সাজদাহ্ করে নিজের আনুগত্যের প্রকাশ

৭৭- বিস্তারিত দেখুনঃ লেখকের বই **'দাম্পত্য জীবন'** পৃষ্ঠা নং-১৪১

ঘটায়। এটি তার ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ধর্মীয়ভাবে ফার্‌য করা হলেও তারা এর বাইরেও এমন কিছু আচার-আচরণ মেনে নিজের জীবনে ইসলামী সভ্যতার প্রকাশ ঘটায়। ইসলামী সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে যেমন তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও নিজেদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিধান করে। মুখে দাড়ি রেখে মাথায় টুপি দিয়ে নিজের মুসলমানিত্বের পরিচয় দেয়।

রামাদ্বানের আগমনের সাথে সাথে অনেকে পায়জামা-পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তি জীবনে ইসলামী সভ্যতার প্রকাশ ঘটায়। এই মাসে মাথায় টুপি রাখে এবং পায়জামা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে চলা-ফেরা করে। এ কারণে অনেকে চাকরিও হারিয়েছেন বলে খবর বেড়িয়েছে। বাংলালিংক এর ম্যানেজার তার এক কর্মচারীকে রামাদ্বানের আগমনের সাথে সাথে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে অফিসে আসার কারণে গালাগালি করে তাকে চাকরি হতে বাদ দেয়ার হুমকিও দিয়েছিলো। পরবর্তীতে সর্বস্তরের জনগনের প্রতিবাদের মুখে সেই কুলাঙ্গার পিছু হটেছে। যে যাই বলুক না কেন, ঈদের দিনসহ পরবর্তী বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত গলাগলি ও কোলাকুলীসহ বুকে বুক মিলানোও ইসলামী সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ। এটি সাওয়াব বা গোনাহ্‌, সুন্নাহ্‌ বা খিলাফে সুন্নাহ্‌ সেটি ভাবতে পারে না। এটি মুসলিম সভ্যতার একটি অংশ হিসেবে যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে চলে আসছে।

ঈদ উপলক্ষে পায়জামা-পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ানোও ইসলামী সভ্যতার অংশ। তাই আমরা দেখতে পাই সমাজের ছোট-বড় সবাই ঈদ পরবর্তী বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত এখানে সেখানে এই পোষাকে ঘুরে বেড়ায়। ঈদের পর অফিস খোলার তারিখে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বস-পিয়ন সবাই উপস্থিত হয়ে কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই কোলাকুলী করে। নিজেদের মাঝের সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়। সবাই ঈদের খুশীতে মেতে উঠে। এই মেতে ওঠাকেই ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে। তাই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি নজরুল ইসলাম **'বাঁকা চাঁদ হাসি ঠোঁটে ফিরে এলো ঈদ'** গেয়ে উঠে ঈদের সভ্যতা ছড়িয়ে দিয়েছেন সবার মাঝে। সভ্যতার অংশ হিসেবে সালাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে ধনী-গরীব ও আমীর-ফাক্বীরের মাঝের ব্যবধানটিও এই সভ্যতা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কোনো

ভেদাভেদ ছাড়াই সবাই একই কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহ্‌র এই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বলে উঠেছেন:

ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود وایاز

نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

অর্থাৎ একই কাতারে আমীর-ফাক্বীর সবাই এক সাথে দাঁড়িয়ে যেতে পারে এখানে কারো মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মাসজিদে প্রথম কাতারে ফাক্বীর দাঁড়িয়ে গেলে আমীর এসে তাকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র ইসলামের।

এছাড়া প্রতিনিয়ত অযু-গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও ইসলামী সভ্যতার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাই ছোট বেলা হতেই মুসলিম পরিবারের মা-বাবারা তাদের বাচ্চাদেরকে কঠোর ভাবে এসবের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সন্ধ্যা হতেই গ্রাম-গঞ্জের স্বল্প শিক্ষিত মা-বাবারাও তাদের সন্তানদেরকে অযু করে পাক সাফ হয়ে ঘরে ফিরে পড়ার টেবিলে বসতে অভ্যস্থ করে তোলে। অতঃপর বড় হয়ে তারাও সালাত ও সাউমের সময় ছাড়াও কখনো অপবিত্র থাকে না। মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য গরীবের কেউ এমন থাকাকে কখনো পছন্দও করে না।

অনুরূপভাবে বড়দেরকে সম্মান করা ইসলামী সভ্যতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। মুসলিম সমাজে বড়দের সম্মানের নিদর্শন হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদেরকে সালাম দেয়ার অভ্যাস করানো হয়। শিশু যখন বড়দের সামনে এসে সালাম দেয়, তখন তার মা-বাবা আনন্দে নেচে উঠে এবং প্রাউড ফিল করে। অন্যদিকে আগন্তুক মেহমানটিও ছোট শিশুর মুখে সালাম পেয়ে নিজের খুশী প্রকাশ করে তার জন্য দো'য়া করে। অনেকে তাকে টাকা পয়সা ও গিফ্‌ট দিয়ে আগামী দিনের জন্য সালাম দিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং উৎসাহ যোগায়। নিজের বাচ্চারা মেহমান বা বাবা-মায়ের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে সালাম না দিলে নিজেরা লজ্জিত হন। পরবর্তীতে সন্তানকে সতর্ক করে দেন।

মেহমানও অপমান বোধ করে এবং পরবর্তীতে বলে বেড়ায় যে, সন্তানরা ভদ্রতা-সভ্যতা বলতে কিছুই শেখেনি। তাই এসব ধর্মের অংশ কি অংশ না

সেটি বিবেচ্য বিষয় না হলেও ছোটবেলায় প্রতিটি সন্তানকে তাদের মা-বাবারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এসব শেখায়। এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো, এটি শুধু মা-বাবা বা নিজ রক্তের কেউ ছোটদেরকে শিখিয়ে থাকে বিষয়টি এমন নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরাও সমাজের ছোটদেরকে পথে-ঘাটে এমন শিক্ষা দিয়ে থাকে। খাবার টেবিলে বসলে ধর্ম-কর্ম মেনে চলে না এমন মুসলিম পরিবারের সদস্যরাও হাত ধুয়ে খেতে বসে। খাওয়ার শুরুতে **বিস্‌মিল্লাহ** এবং খাওয়ার শেষে **আল-হামদু লিল্লাহ** বলাটা মোটামুটি তাদের একটি নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা থাকুক বা নাই থাকুক, রাত-দুপুরে ভাত খাওয়ার পর উচ্চস্বরে **'শোকর আল্লাহ্‌র'** বলা অনেক পরিবারের চিরাচরিত অভ্যাস। এমন এক সভ্যতায় প্রভাবিত জীবন কাটানোর কারণে যখন কোনো আনন্দ ভ্রমনে গিয়ে হোটেলে-মোটেলে খেতে বসে সেখানেও ইসলামী সভ্যতার প্রকাশ পায়। অমুসলিমের সাথে কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে খাবারের টেবিলে বসে প্রথমেই হালাল-হারাম খাবারের পার্থক্যের মাধ্যমে অন্যদের মাঝে তার ব্যবধান তৈরী করে। এটি একজন মুসলিমের কোনো সাময়িক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং তার পুরো জীবনের পরিচয় বহন করে। যে পরিচয় তাকে দুন্‌ইয়া হতে কব্‌রে নিয়ে যাবে এবং কবর হতে জান্নাতে নিয়ে যাবে বলে এক অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে।

চলার পথে যেখানে সেখানে কোনো মুসলমান প্রশ্রাব-পায়খানা করতে বসে যেতে পারে না। একান্ত বাধ্য হলে সে রাস্তার এক পাশে লোক চক্ষুর আড়ালে গিয়ে সেটি সেরে আসে। ইসলামী সভ্যতা ও অনৈসলামিক পরিবেশের মাঝে পার্থক্য বোঝানোর জন্য একটি ঘটনা না বলে পারছি না। নাদওয়ার ছাত্র থাকাকালে একবার আমার জন্ডিস হয়েছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার আম্মা মেহের আফজুন বেগমও ১৯৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী জন্ডিসে মারা গেছেন। আম্মার মৃত্যুর পরের বছর ১৯৮৩ সালে ঢাকার লালবাগ জামেয়া ক্বোরআনিয়া আরাবিয়্যাহর ছাত্র থাকাকালে আমার প্রথম জন্ডিস হয়েছিলো।

আমার জেঠাতো ভাই মাওলানা ওবায়দুল্লাহ (রাহ.) তখন আমাকে রাবেতার অধীনে পরিচালিত ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পে অবস্থিত 'রাবেতা

হাসপাতাল' এ ভর্তি করিয়েছিলেন। রাবেতার তদানীন্তন কান্ট্রি ডিরেক্টর ছিলেন জনাব মীর কাসেম আলী। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় সেখানে সকালে ফ্রী ঔষধ দেয়া হতো এবং হাসপাতালে যারা ভর্তি হতো তাদের ফ্রী চিকিৎসাও করা হতো। সেখানে আমি দীর্ঘ এক মাস ভর্তি হয়ে ফ্রী চিকিৎসা নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র রাহমাতে সুস্থ হয়ে উঠলেও জন্ডিসকে খুব সহজে মেনে নিতে এখনো ভয় লাগে। একারণে জন্ডিস হয়েছে শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ডাক্তার আমাকে বেশী করে পানি এবং আখের রশ খেতে বললেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌ হতে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দূরে বস্তি নামক একটি জেলা রয়েছে। সেই জেলার আব্দুল মু'য়ীদ নাদভী নামক নাদওয়ার আমার এক সহপাঠি ছিলো। আমরা ক্লাস এইট হতে মাস্টার্স পর্যন্ত এক সাথে পড়েছি। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। ডাক্তারের কথা শুনে সে আমাকে শান্তনা দিয়ে বললো, ভয় পেয়ো না। গ্রামে আমাদের বাড়ি আছে। সেখানে আমাদের ক্ষেতে আখের খুব চাষ হয়। তুমি আমার সাথে আমাদের বাড়িতে গিয়ে যতদিন প্রয়োজন মনে কর ততদিন থাকতে পারবে। আর প্রতিদিন আখের ক্ষেতে গিয়ে সকাল বিকাল আখও খেতে পারবে। এভাবে তাজা আখ খেলে আশা করি দ্রুত সেরে উঠতে পারবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

তার পরামর্শটি আমার খুব পছন্দ হলো। তাছাড়া বিপদগ্রস্থ লোক সবার কথা শোনে এবং সবার সাহায্য কামনা করে। আমার অবস্থাও তাই। অতঃপর পরের দিন সকালে তার সাথে তাদের গ্রামের বাড়ি বস্তির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যায় একটি ছোট শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। শহর হতে প্রায় ৬/৭ কিলো মিটার পায়ে হেঁটে অন্ধকার রাতে গিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছলাম। অসুস্থ ও ক্লান্ত শরীরে সামান্য কিছু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সালাতুল ফাজর আদায়ের জন্য ঘুম হতে যখন উঠলাম তখন আমার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। তাকে যখন টয়লেটে যাওয়ার কথা বললাম তখন সে আমার হাতে একটি বদনা দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘর হতে বের হলো।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে ধান ক্ষেতের একটি আইল দেখিয়ে দিয়ে বললো ঐখানে গিয়ে বসে যাও। যেহেতু আমার টয়লেট করতে হবে তাই এই

সম্পর্কে তাকে কোনো প্রশ্ন না করে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম। তবে সেখানকার হিন্দু-মুসলিম এবং নর-নারী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে একসাথে ক্ষেতের আইলে গিয়ে বসে পড়ে তা আমার জানা ছিলো না। টয়লেটে মানুষের অনেক কথা মনে পড়ে এটি শুনে আসছি আজীবন। কিন্তু এখানে যারা কথা বলে তাদেরকেই দেখতে পেলাম। একটু পরে দেখি আমার আগে পিছে ডানে বামে নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী সবাই নীরবে বসে শুধু টয়লেট করছে না; বরং কথাও বলছে। এ অবস্থা দেখে আমার আর টয়লেট করা হলো না। লজ্জায় উঠে চলে আসলাম।

অতঃপর সালাতুল ফাজরের পর আমি কোনো ভাবে লাক্ষ্মৌ পালিয়ে আসার পরিকল্পনা করতে লাগলাম। বন্ধু আব্দুল মুয়ীদ নাদভীকে এটি সেটি এবং আমার এই সেই সমস্যার কথা বলে চলে আসার অনুমতি চাইলাম। সেও বিষয়টি বুঝতে পেরে আমাকে শহরে এনে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেল। এভাবে আমি পালিয়ে এসে ইয্যাত বাঁচালাম। তবে ততক্ষণে আমার পেট ফুলে গেছে। শহরে এসে একটি মাসজিদের টয়লেটে গিয়ে টয়লেট সেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। পরে জানতে পারলাম, তাদের পাড়ার হিন্দু-মুসলিম নারী-পুরুষ সবাই এভাবেই যুগ যুগ ধরে ক্ষেতের আইলে রাত-দুপুরে বসে টয়লেট করে আসছে। এখানে লজ্জার কিছু আছে বলে তারা মনে করে না। কারণ ভারতে নারী-পুরুষ এক সাথে বসে রাতের অন্ধকারে শুধু নয়, দিনে দুপুরেও শহরে বন্দরে রাস্তার ধারে ড্রেনের উপর বসে প্রকাশ্যে টয়লেট করতে করতে কথা বলতে অভ্যস্ত। দেখলে এমন মনে হবে যে, এভাবে কথা না বললে তাদের টয়লেট হবে না।

তবে যাদের সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে এবং দেশ-বিদেশ ঘুরেছে তাদের মাঝে এভাবে টয়লেট করা নিয়ে হাসির অনেক গল্পও শোনা যায়। তার একটি এখানে না বলে পারছি না। একবার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতে বেড়াতে আসলেন। ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জাওয়াহার লাল নেহরু সকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। দুই প্রধানমন্ত্রী যেই রাস্তায়ই যান না কেন, সেখানে রাস্তার ধারে শত শত নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে বসে টয়লেট করছে। এমন দৃশ্য দেখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জাওয়াহার লাল নেহরুকে বললেন, আপনার দেশে এভাবে প্রকাশ্যে মানুষ টয়লেট করে? কি অসভ্য আপনার দেশের মানুষ! আমাদের দেশে এমন করলে পুলিশ

সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলতো। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে নেহরু খুব লজ্জা পেলেন। তবে মনে মনে বললেন, আপনার দেশে গেলে আমিও সকালে আপনাকে নিয়ে ঘুরতে বের হবো। তখন দেখবো আপনারা কেমন সভ্য জাতি।

অতঃপর তিনিও এক সময় রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে লন্ডনে বেড়াতে গেলেন। পরের দিন সকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঘুরতে বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক জাগায় গিয়ে দেখলেন একজন লোক রাস্তার ধারে ড্রেনের উপরে বসে টয়লেট করছে। সাথে সাথে নেহরু বলে উঠলেন এ কি? আপনার দেশের মানুষ এত অসভ্য? এরা এ ভাবে প্রকাশ্যে টয়লেট করে? এটি শুনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সিকিউরিটি ডেকে ঐ লোকটিকে গুলি করতে বললেন। প্রধানমন্ত্রীর অর্ডারের সাথে সাথে পুলিশ তাকে গুলি করলো। অতঃপর লোকটি মারা গেলো। পরে লাশটি উঠিয়ে এনে দেখলো যে, সে লন্ডনে কর্মরত ভারতের রাষ্ট্রদূত। কি বুঝলেন?

যাক বলছিলাম, মুসলমানদের নিজস্ব কিছু রুচি ও সভ্যতা রয়েছে। সেই সভ্যতা তাদেরকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কারণ তারা রাস্তা-ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটতে হাঁটতে খাওয়াকেও অসভ্যতা মনে করে। আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন কোনো মুসলিম এভাবে খাওয়াকে কখনো মেনে নিতে পারে না। এমন কি তারা বাসা বাড়ীতে নিজের বউ-বাচ্চার সামনেও খালী গায়ে ঘুরে বেড়ানোকে অভদ্রতা এবং অসভ্যতা মনে করে। তাই তারা কখনো কোনো মেহমানের সামনে খালী গায়ে উপস্থিত হয় না। এগুলো সবই ইসলামী সভ্যতার নিদর্শন।

মুসলমানরা রামাদ্বানের সাউম বা রোযা রাখে। পবিত্র ক্বোরআনের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক রাখে। সকাল বেলা ক্বোরআন তিলাওয়াত করাও ইসলামী সভ্যতার অংশ। নিজ পরিবারে এই সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ছোটবেলায় সন্তানদেরকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনেক মুসলিম এমনও আছে যে জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নিজের জীবনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর অনেক সুন্নাহ্ পালন করে থাকে। যেমন মুসলিম সমাজের পুত্র সন্তানের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুন্নাহ (খাত্না) করানো হয়। অথচ সেই সন্তান তখন

জানেই না এটি কি এবং কেন? এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলতে বাধ্য হয়েছে যে, খাত্না এইড্স্ এর মত মরণব্যাধী হতে নারী-পুরুষকে রক্ষা করতে পারে।

সম্প্রতি দেখা গেলো, মোজাম্বিক সরকার তার দেশের একলাখ পুরুষের খাত্না করানোর ব্যবস্থা করেছে। মোজাম্বিকের যে সব প্রদেশে খাত্নার প্রচলন নেই, সরকার সে সব অঞ্চলকে এই কর্মসূচির আওতায় এনে খাত্না করানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। কারণ বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান দাবী করেছে যে, পুরুষের খাত্না এইচআইভি/এইড্স্ সারাতে না পারলেও তবে প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষণা করেছে যে, পুরুষের খাত্না এইচআইভি সংক্রমণের ৬০% ঝুঁকি কমাতে পারে। এতেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ১০০% প্রমাণিত বলে শুধু আমরা মনে করি না, বিশ্বও মেনে নিচ্ছে।

প্রাপ্ত বয়সে নারী-পুরুষ নিজেই নিজের বোগল এবং নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করে। হাত-পায়ের নখ কাটে। স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে অথবা স্বপ্নদোষ ও শুক্রক্ষরণ হলে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করে। নারীরা নিজেদের সাময়িক অসুস্থতা হতে সেরে ওঠার পর পবিত্র হওয়ার জন্য প্রথমেই গোসল করে। নারী-পুরুষ সবাই সর্বদা পাক-পবিত্র থাকে। সালাত আদায়ের পূর্বে সবাই অযু করে। শুধু সালাত নয়, এখনো সন্ধ্যা হলে পড়ার টেবিলে বসার পূর্বে বাচ্চারা অযু করেই বসে। এমন কি রামাদ্বানের রোযা, সাহ্রী এবং ইফত্বারসহ ঈদের দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া তাকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়। এ সবগুলো ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলমানের এসব সংস্কৃতি আকাশ-বাতাস সাক্ষী হয়ে থাকে শুধু তাই নয়, অন্যদের দৃষ্টিতেও তাকে সম্মানীয় করে তোলে। ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

যেমনটি আমি দিল্লীর জাওয়াহার লাল নেহরু ইউনিভার্সিটির 'কাভেরী' হলে মুসলমান ছাত্রদের সাথে বসে হিন্দু ছাত্রদেরকে রামাদ্বানে ইফতার করতে দেখেছি। তাদেরকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, মুসলমান ছাত্রদের ইফত্বার সংস্কৃতি তাদেরকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করছে। তাই তারাও দুপুর হতে না

খেয়ে ইফতারের সময় মুসলমান ছাত্রদের সাথে ইফত্বার করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।[৭৮]

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্য আরেকটি বড় পরিচয় হলো হায়া-শরম। হায়া-শরম ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। হায়া-শরম দেখেই তার ধর্ম বোঝা যায়। পারিবারিক নিয়ম-নীতিও তাকে সমাজের সর্বত্র পৃথক এক চরিত্রের মানুষ হিসেবে পরিচয় নিয়ে চলার সাহস যোগায়। বিশেষ করে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ইসলামী সভ্যতা একটি প্রাচীরের মাঝে আবদ্ধ করে রেখেছে। উভয়ের মাঝে এক বিশাল ব্যবধান মেনে চলার শিক্ষা প্রতিটি মুসলিম সন্তান পারিবারিক ভাবেই পেয়ে থাকে।

মোটকথা, নিজের পারিবারিক গন্ডিতেই মুসলিম সন্তানরা শিশুকাল হতেই বুঝতে পারে যে, নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র তখনই জায়েয যখন একজন নারী এবং একজন পুরুষ শারী'য়াতের আলোকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর ব্যতিক্রম হলে নারী-পুরুষের সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম। ইসলামী সভ্যতায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের পুরো বিষয়টি এই একটি তা'লীমের মধ্যেই নিহিত বলে প্রত্যেক মুসলমান মনে করে। বিয়ের বাইরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক করাকে অসভ্যতা মনে করে। তাই এর বাইরে নর-নারী পরস্পরের সংস্পর্শে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। ইসলামী সভ্যতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, মদ, জুয়া, সূদ ও ঘুষ হারাম। তাই প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের বাত্লানো হালাল-হারাম মেনে চলাকে তার জন্য অপরিহার্য মনে করে।

ইসলামী সভ্যতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, বংশ-মর্যাদা এবং জন্মসূত্রে সকল মানব সন্তান এক। বড়-ছোটর মাঝে ব্যবধান সব সময়ই মেনে চলা হয়। এই সভ্যতায় বাক স্বাধীনতাসহ ব্যক্তি স্বাধীনতার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তাই প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম করতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সম্মানীয়দেরকে অসম্মান করা যাবে। যে কোনো ধর্মের ধর্মীয়গুরু এবং ধর্মীয় তীর্থস্থানের ব্যঙ্গ করার সুযোগ তাকে তার বাক-স্বাধীনতা দেয় না। কোনো ধর্মের উপাসনার বস্তুকে উপহাস করার

৭৮- বিস্তারিত দেখুন: লেখকের বই **'সংসার'** পৃষ্ঠা নং-১১৯

সুযোগ ইসলামী সভ্যতায় নেই। কারণ ইসলামী সভ্যতার মূল সোর্স আল্ ক্বোরআনে আল্লাহ্ এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[৭৯]

'তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ্কে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্কে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করতো।'

ইসলামী সভ্যতায় ছোট-বড়র মাঝে ব্যবধান উঠিয়ে ফেলারও কোনো সুযোগ নেই। বড় এবং ছোটদের মাঝে ইয্যাত ও সম্মানের একটি প্রাচীর থাকে যা কোনো ভাবেই অতিক্রম করা যাবে না। আর যারা এই সীমা অতিক্রম করবে তাদেরকে বেয়াদব ও অসভ্য মনে করা হয়। অতএব আমি মনে করি এই একটি সভ্যতাই ইসলামী সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এবং মুসলমান শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে পারে। এখানে এক একটি করে ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে অনেকগুলো পয়েন্ট বলা যাবে। মূলতঃ ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি উল্লেখিত মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্মিত।

এর বিপরীতে পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি হলো শুধুমাত্র বাক-স্বাধীনতার ওপর। যদিও পশ্চিমা সভ্যতায় এমন স্বাধীনতার ওপরও অনেক বাধা রয়েছে। এমন বাধা বা অবরোধ ইসলামী সভ্যতায় একজন মুসলমানের ওপর সভ্যতার কারণেই আরোপিত হয়ে থাকে। পারিবারিকভাবেই এই শিক্ষা পেয়ে থাকে। তবে পশ্চিমা সভ্যতার এমন কিছু নেই। এখানে পারিবারিকভাবে সবাই যেমন স্বাধীন, সামাজিকভাবেও কেউ কাউকে কিছু বলার অধিকার রাখে না। যার যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করছে। পশ্চিমা সভ্যতায় ধর্ম-কর্ম এবং ইবাদাত বন্দেগী হলো সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। মনে চাইলে কেউ করবে এবং যেভাবে ইচ্ছে সে ভাবেই

৭৯- সূরাতুল আন'আম, আয়াত নং-১০৮

করবে। মন না চাইলে করবে না। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। এখানে কারো কোনো মতামত চলবে না। এমন কি মা-বাবাও কিছু বলতে পারবে না। বলবেই বা কেমন করে? তারা নিজেরাই ধর্ম-কর্ম করে না।

পশ্চিমা সভ্যতায় লাজ-শরমও ব্যক্তিগত বিষয়। মা-বাবার মাঝে যেমন লজ্জা শরম নেই অনুরূপভাবে সন্তানদের মাঝেও এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইচ্ছে হলে কেউ এটি মেনে চলবে, না হলে চলবে না। এখানে কারো কিছু বলার বা করার সুযোগ নেই। নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে যৌন আবেদন মূলক কর্ম-কান্ড করতে কোনোরূপ বিব্রতবোধ করে না। রাস্তা-ঘাটে দাঁড়িয়ে একে অপরকে প্রকাশ্যে চুমু দিচ্ছে চুমু খাচ্ছে। উলঙ্গ বা অর্ধালুঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানোই পশ্চিমা সভ্যতা। বিশেষ করে নারীরা যত বেশী বিবস্ত্র হতে পারবে তত বেশী তারা সভ্যতার দাবীদার। অশালীন কাপড়ে ঘুরে বেড়ানোকেই সভ্যতার প্রতীক মনে করে। বাড়ী-ঘর এবং হোটেল-মোটেলে গিয়ে রাতের অপেক্ষা না করে দিনে-দুপুরে নিজের জৈব চাহিদা মেটাচ্ছে। এমন কি গাড়ি, বিমান, স্টেশন ও সুইমিংপুলসহ পার্ক ও বিনোদনের স্থানে ইচ্ছে হলেই নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাদের এসব অসভ্য অপকর্ম কার চোখে কেমন দেখা গেলো এটি তাদের কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

মদ খাওয়া না খাওয়াও পশ্চিমা সভ্যতায় নিজস্ব ব্যাপার। ইচ্ছে হলে কেউ খাবে, না হলে খাবে না। কেউ কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। খাওয়ার জন্য যেমন কেউ তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না তেমনিভাবে না খাওয়ার জন্যও তাকে বাধ্য করা যাবে না। এমন কি রাষ্ট্রীয় আইনও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। রাষ্ট্র ও আইন শুধুমাত্র তখনই তাকে বাধা দিতে পারে, যখন সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় কারো কোনো ক্ষতি করে বসে। অন্যকে সম্মান করবে কি করবে না, এটিও তার ব্যক্তিগত বিষয়। এখানে কেউ কাউকে সম্মান দেখাতে বাধ্য করতে পারবে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন স্বাধীনতা পেয়ে পশ্চিমা সভ্যতায় যাকে ইচ্ছে তাকে, যখন তখন যে কেউ অপমানও করতে পারে আবার সম্মানও দেখাতে পারে। যার তার কার্টুন আঁকতে এবং ব্যঙ্গ করতে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। তাই বিভিন্ন সময়ে তারা ধর্মগুরুদের কার্টুন এঁকে তাদেরকে

অপমান করে। বেশ কয়েক বছর পূর্বে ডেনমার্কের এক কার্টুনিস্ট রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কার্টুন এঁকে ছিলো। আর তখন পুরো মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো। কারণ মু'মিন মনে করে তাওহীনে রেসালাতের (রাসূলের শানে বেয়াদবী) বিচার কখনো ক্বাযী করে না গাজী করে।

রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যঙ্গ করে কার্টুন আঁকা এবং প্রতিনিয়ত মিডিয়ায় প্রকাশ হওয়াটা পশ্চিমা বিশ্বে সাধারণ ব্যাপার। তবে আমাদের দেশের কথা ভিন্ন। এদেশে রাসূলের শানে বেয়াদবীতে কোনো শাস্তি না থাকলেও ব্যক্তির সমালোচনায় জেল-জরিমানা রয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতায় এসব কাজে কাউকে বাধা দেয়া বা বিরত রাখার চেষ্টা করার অর্থই হলো তার বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। তাই পশ্চিমা জগতে এসবের ওপর কখনো কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় না। যার যা খুশী সেই তাই করে চলছে। এখানে কেউ অপমানবোধ করলো কি করলো না, এটি কারো কোনো বিবেচনার বিষয় হতে পারে না।

একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় যে, উভয় সভ্যতা ইনসাফ, সাধুতা, বিশ্বস্ততা, আমানাত, শ্রম, অসহায় এবং দুর্বল শ্রেণী-পেশার মানুষদের উপকার করার কথায় বিশ্বাস করে। উভয় সভ্যতা ঘুষ, অযোগ্যদের জন্য সুপারিশ, মিথ্যা, প্রতারণা, চুরি, কারো ধন-সম্পদ গোপনে আত্মসাৎ করাসহ কারো ওপর যুল্‌ম করাকে অন্যায় মনে করে। যে সব বিষয়কে ইসলামী সভ্যতা অন্যায় মনে করে সেগুলোর প্রায় সব কয়টিকে পশ্চিমা সভ্যতাও অন্যায় মনে করে। তবে এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলোকে ইসলামী সভ্যতায় অপরাধ মনে করা হলেও পশ্চিমা সভ্যতায় সেগুলোকে অপরাধ মনে করে না। উল্টো এসব তাদের সভ্যতার উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। তা হলো, বিয়ে ছাড়াই নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপন, মদ, জুয়া, সূদকে তারা কোনো অপরাধ বা অন্যায় মনে করে না। বরং এ সবকে তারা আনন্দ ও উপভোগের জিনিস মনে করে। কেউ না করলে তাকেই খারাপ মনে করা হয়।

কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ইসলামী সভ্যতা এবং পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। অথচ সেগুলো নিয়ে মতবিরোধের চেয়ে মতৈক্য রয়েছে বেশী।

সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হলো গণতন্ত্র। যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ভিত সম্পর্কে উভয় সভ্যতার মাঝে মতৈক্য রয়েছে।

তবে মুসলিম বিশ্বে বিপরীত একটি চিন্তাধারা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তাদের অভিমত হলো গণতন্ত্র পুরোপুরি চালু করা ঠিক নয়। লাগাম টেনে ধরে রাখা উচিৎ। বাস্তববাদী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে এমন করা কখনো উচিৎ নয়। কারণ যখন কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কায়েম হয়ে যায় তখনও কিন্তু সেই গণতন্ত্র সেখানকার সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি এবং সামাজিক মূল্যবোধের বাইরে নুতন কোনো পথে পরিচালিত হয় না। সেই গণতন্ত্র সামাজিক নিয়ম-নীতির বাইরে না গিয়ে সেগুলোর আলোকে সীমিত হয়ে পড়ে। যা কখনো কোনো আইনের বইতে উল্লেখ থাকে না। সামাজিক মূল্যবোধের কারণে গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা নিতে হয়। সমাজেরও ঠিক একই অবস্থা।

তাই বলছিলাম, মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রে যদি কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেই সমাজের রীতি-নীতির আলোকেই হবে। কারণ সেই দেশের সংসদে যে সব সদস্যরা থাকবেন তাদের অধিকাংশ হবেন মুসলিম। সমাজে ইসলামী রঙ যত বেশী থাকবে সংসদের সদস্যরাও তত বেশী ইসলামিক হবেন। অতঃপর আইন প্রণয়নের সময় তারা সমাজের কথা বিবেচনায় রাখবেন খুব বেশী। তারা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে না পারলেও ক্বোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী আইন কখনো প্রণয়ন করার সাহস করবেন না। কারণ সংসদীয় খেলাকে তারা কখনো শেষ খেলা মনে করবে না। পরবর্তীতেও এখানে আসার জন্য সমাজের মানুষের ভোটের প্রয়োজন হবে। ঠিক একই অবস্থা পশ্চিমা জগতের। যদিও সেখানকার সংসদ যে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে। তারপরও কিন্তু তারা রাষ্ট্র ও সমাজের মূল্যবোধ এবং রীতি-নীতিকে ডিঙিয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করে না।

প্রাচীন ও পশ্চিমা সভ্যতার ফলাফল

প্রাচীন ধর্ম এবং আধুনিক সভ্যতার দর্শনের সঠিক এবং নিরপেক্ষ হিসাব নিকাশ করা হলে অবশ্যই বলা যাবে যে, উভয়ের মাঝে আকাশ ও যমীনের ব্যবধান রয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বের আলোচনায় পাঠকদের কাছে তুলে ধরার যথেষ্ট চেষ্ঠা করেছি। কারণ আদীকাল হতে বিশ্বধর্মতত্ত্বে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নারীর অস্তিত্ব এবং নারীকে মানুষ হিসেবে মেনে নেয়া সম্পর্কে অস্বীকারবোধক একটি চিন্তা-চেতনা লালিত হয়ে আসছে। একারণে অতীতের কোনো সভ্যতাসহ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীকে কখনো মূল্যায়ন করা হয়নি। উল্টো জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীকে অমঙ্গল মনে করা হয়েছে। এমন কি নারীকে মানুষও মনে করা হতো না। তাই নারীকে সারা জীবন আপনজনদের মাঝে থেকেও অপমান ও অপদস্ত হতে হয়েছে সমান তালে। লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছে সকল সভ্যতায়। বঞ্চিত হয়েছে যাবতীয় অধিকার হতে। কারণ পশ্চিমা সভ্যতার দর্শন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখিত কারণেই নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের মৌলিক দুইটি উদ্দেশ্য ছিলো বলে আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয়েছে।

এক: নারীর স্বাধীনতা।

দুই: পুরুষের সমান অধিকার অর্জন।

উক্ত আন্দোলনের অবশ্য অন্য আরেকটি দিকও ছিলো। তা হলো, নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যানারে নিজেদের প্রকাশ ঘটানোকেও অনেকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলো বলে প্রতীয়মান হয়েছে। লাম্পট্য ও ভ্রষ্টামী চরিত্রসহ তারা এটিকে নিজেদের শরীর প্রদর্শনীর সুযোগ হিসেবেও গ্রহণ করেছে। তখন হতেই নারীর মাঝে শরীর প্রদর্শনের যে মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তা আজও পুরোদমে চলছে। তাই পশ্চিমা সভ্যতা আধুনিকতার নামে প্রতিনিয়ত পোশাকের ডিজাইন পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে উলঙ্গ করে ছাড়ছে। একজন নারী এ সব পোশাক পরিধানের পরও তার শরীরের সব কিছু দেখা যাচ্ছে। এই সুযোগে যারা ভবঘুরে ও উদ্দেশ্যহীন চিন্তা-চেতনা

লালন করতো তারা **শাম'এ খানা** বা ঘরের প্রদীপ হওয়ার পরিবর্তে **শাম'এ আঞ্জুমান** বা অনুষ্ঠানের প্রদীপ হওয়াকে পছন্দ করতে লাগলো। **না'উযু বিল্লাহে মিন যালিক**।

এ ধরনের নারীরা যখন স্বাধীনতা পেলো তখন নিজেদের আত্মপ্রকাশের পুরো আবেগ ও অনুভূতি এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়লো। এখানের মুক্ত হাওয়া গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার ঘটালো। যার পরিণতিতে দেখা গেলো, তাদের সেই নারী অধিকার আন্দোলন আড়াই হতে তিনশ বছরের মধ্যে পুরো ইউরোপ ও আমেরিকা ছাড়াও সমগ্র পৃথিবীতে শুধু ছড়িয়ে পড়েনি; বরং নারীরা তাদের আন্দেলনের প্রভাবে প্রভাবিতও হয়েছে। যা কারো আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, তারা এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো।

ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ নারী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারিবারিক গন্ডি এবং স্বামীর ঘরে থাকার চেয়ে উন্মুক্ত বিচরণের কলা-কৌশল নিয়েই ভাবছে সারাক্ষণ। আবার কোথাও কোথাও রাত-দুপুরে নারী ইচ্ছে মত যার তার সাথে যখন বের হয়ে যাচ্ছে, তখন সবাই নিজের চরিত্রের ওপর পর্দা দিয়ে বলে উঠছে **'যামানা খাবার হো গায়া'** বা যুগ খারাপ হয়ে গেছে। এভাবে দুন্ইয়া তার চাকচিক্যের মাধ্যমে আমাদেরকে ধোকা দিয়ে পরহেযগার হয়ে গেলো। আর আমরা দুন্ইয়ার ওপর ভরসা করে গুনাহ্গার হয়ে গেলাম।

তাই বলছিলাম, সত্য কথা তিক্ত হয়। এটি সবার জানা। তবে বলাটাও জরুরী। কিন্তু বললে কাকতালীয়ভাবে যাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে মিলে যায় তারাই বলে উঠে, সব পাগলের প্রলাপ। অন্যরা কেন এটি আপনজন অর্থাৎ চাচা-মামা, খালা-ফুফু, ভাই-ভাবী, বোন-ভগ্নিপতিরাও বলে। অর্থাৎ বার বার দৃশ্যের পরিবর্তন হবে। তবে জানালা একই থাকবে। অতএব যে সমাজে সত্য বললে খারাপ লাগে, দলীল দিলে যালীল বা অপমান হতে হয়, সে সমাজ মূর্খদের আখড়া নয় তো কী?

আজ শুধু পশ্চিমা জগতে নয়, আমাদের জগতের পারিবারিক অবস্থাও খুবই নাযুক। দাম্পত্য জীবন এখন কারো সহজ ভাবে চলছে না, সবাই অভিনয় করে কাটিয়ে দিচ্ছে। কেউ সহ্য করে আর কেউ সহ্যের শক্তি হারিয়ে হযম করে যাচ্ছে। আগে বলা হতো ভালোবাসা অন্ধ। এখন তার সম্পূর্ণ উল্টো দেখা যাচ্ছে। যুগের পরিবর্তনে এখন ভালোবাসার প্লাস্টিক সার্জারী করানো হয়েছে। তাই এই যুগের নারীরা ভালোবাসার মানুষের আকার আকৃতি যেমন দেখে, ব্যাংক ব্যালেন্সও তেমন দেখে। পরিণতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আজকের পারিবারিক সম্পর্ক। তাই আজকের ইউরোপের মুসলিম নারীরা নিজেদের ধর্ম-কর্ম পালনের স্বার্থে পর্দায় থাকার জন্য সেখানে আন্দোলনের কারণে ও আমাদের দেশের নারীরা পশ্চিমাদের দেখানো মতে তথাকথিত স্বাধীনতা ভোগের লক্ষ্যে বে-পর্দা হওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকছে। এধরনের নারীদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, ইসলামী সভ্যতার শিক্ষা হলো শরীরকে কম সাজাও এবং কম দেখাও, কারণ এটি মাটিতেই মিশে যাবে। রূহকে বেশী করে সাজাও, কারণ এটি একদিন তার রাব্বের কাছে যাবে।

পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভেসে যাওয়ার কারণে আজকের মুসলিম উম্মাহর নারীদের অবস্থা দেখে আমার খুব কান্না আসে। তাই আমি মুসলিম নারীদেরকে বলতে চাই, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পশ্চিমাদের শেখানো নারী স্বাধীনতার স্লোগানে ডুবে থাকবেন না। এখানে সাময়িক মজা পেলেও এক সময় আপনার দিকে কেউ তাকাবে না। বিনিময়ে আপনার দুন্‌ইয়া ও আখেরাত সবই হারাতে হবে। আজ হতে পনের বিশ বছর আগের ডায়েরীর পাতা উল্টিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন স্বাধীনতা ভোগের নামে Internet Cafe (ইন্টারনেট ক্যাফে) Scandal বা কলঙ্কের কারণে বাবার একমাত্র মেয়ে নিজ রুমে ফ্যানের সাথে ফাঁস লাগিয়ে রাতে আত্মহত্যা করেছে। অতঃপর মা-বাবা মেয়ের লাশ জাড়িয়ে ধরে কান্না করছে। এখন প্রশ্ন হলো, স্বাধীনতার নামে বাবা কী পেলো? মেয়ের লাশ!! এখানেই শেষ নয়, সেই লাশের সারি দীর্ঘ হতে চলছে। এসব নারী স্বাধীনতা স্লোগানের পরিণতি নয় তো আর কী?

আমার তখন খুব কান্না আসলো, যখন বাবার একমাত্র কন্যা ফ্রী মাইন্ড এবং স্বাধীনতার নামে বান্ধবীর কথায় তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলো, এবং সেখানে সে গণধর্ষনের শিকার হয়ে সব হারিয়ে রাস্তায় পড়েছিলো। পথচারীরা তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলো আর সেখানেই সে মারা গেল। অতঃপর হাসপাতাল হতে যখন তার মা-বাবাকে ফোন করলো তখন তারা জানিয়ে দিল আমাদের কোনো মেয়ে নেই। পরিশেষে কী হলো? মা-বাবাও নিজ সন্তানকে অস্বীকার করলো!! মনে রাখবেন, এটিই পশ্চিমা সভ্যতার চুড়ান্ত ফলাফল।

আমার সেদিনও খুব কান্না আসলো। যেদিন একটি মেয়েকে তার বয়ফ্রেন্ড নেশাযুক্ত জুস খাইয়ে তাকে ভোগ্যপণ্য বানিয়ে বন্ধুদেরকে উপহার হিসেবে পেশ করেছে এরপর যা হওয়ার তা হয়েছে। অতঃপর সেই মেয়ে লজ্জায় ও ক্ষোভে রাস্তায় এসে ট্রাকের নীচে পড়ে আত্মহত্যা করে এমন সভ্যতা এবং স্বাধীনতা হতে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তবে দুন্ইয়ার অপমান হতে মুক্তি পেলেও এর চেয়েও আরো কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে। অতএব যারাই পশ্চিমা সভ্যতাকে আলিঙ্গন করবে তাদের সবার পরিণতি এমনই হবে। হয়ত কেউ আগে আর কেউ পরে। পার্থক্য শুধু এখানেই। এটিই পশ্চিমা সভ্যতার ফলাফল।

আমার তখনও কান্না আসছিলো, যখন নারী স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা স্টাইলে অশালীন কাপড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো একটি মেয়েকে এক বদমাইশ জোরপূর্বক ধরে নিয়ে উলঙ্গ করে তার ভিডিও ধারণ করে মোবাইলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। আর প্রযুক্তির সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সকল বদমাইশের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছিলো। অতঃপর মেয়েটির মা-বাবা এমন সংবাদ পেয়ে নিজেদের অপরাধের দিকে না তাকিয়ে শুধু মেয়েটিকে বকাঝকা করার কারণে মেয়েটি আত্মহত্যা করে এমন মা-বাবাকে ছেড়ে চলে যায়নি; বরং এই দুন্ইয়াও ছেড়েছে।

আমার তখনও কান্না আসছিলো, পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভাসতে গিয়ে যখন একটি মেয়ে বদমাইশদের জালে আটকা পড়ে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে হাত জোড় করে তাদের কাছে মুক্তি চাচ্ছে। আর ঐ শায়ত্বানগুলো তাদের

প্রবৃত্তির দানবকে সেই মেয়ের শরীর খামছে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি বাব বার তাদেরকে বলছে, আমার ভিডিওটি ডিলেট করে দাও, তোমাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করবো। তবুও এমন অসহায় তরুণীর চিৎকারে ঐ শায়ত্বানদের অন্তর কেঁপে উঠেনি। উল্টো তাদের বন্ধুদের ইচ্ছা পূরণেরও জন্য তার কাছে দাবী করছে। অতঃপর যা হওয়ার তাই হয়েছে। পরিশেষে মেয়েটি নারী স্বাধীনতার বাস্তব পরিণতি উপলব্দী করে রাতের অন্ধকারে সাত তলার ছাদ হতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে এই দুন্ইয়া হতে বিদায় নিয়েছে। এমন সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে আসছি। আজ এখানে ঘটলে কাল ঐখানে। আজ এই পরিবারে হলে কাল ঐ পরিবারে। মনে রাখবেন, পশ্চিমা সভ্যতার ফল খুবই তিক্ত। অতএব সময় থাকতে সাবধান না হলে পরিণতি সবার একই হবে। আল্লাহ্ আমাদের সমাজকে হিফাযাত করুন।
আ-মী-ন।

পশ্চিমা সভ্যতায় সমানাধিকার ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম

আঠারশ খ্রিস্টাব্দের পরের সময়কে আধুনিক সভ্যতার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এখানেও নারীর ভাগ্যের কোনো উন্নয়ন হয়নি। উল্টো নতুন বোতলে পুরাতন মদ ভরে দিয়ে সভ্যতা ও প্রগতির নামে নারীকে উলঙ্গ করে ভোগের রাস্তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এই বইতে আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাই এখানে এই নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখিত তথ্য এবং পবিত্র ক্বোরআনের বর্ণনা-সমূহ হতে পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, একমাত্র ইসলাম ও মুসলমান ছাড়া পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নারীকে কখনো ভালো দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। কেউ কখনো তাদেরকে ভালো কোনো স্থান দেয়ার কথা চিন্তাও করেনি। এমন অবস্থা শত শত বছর নয়, হাজার হাজার বছর ধরে মানব সমাজে চলে আসছিলো।

দুঃখজনক হলেও সত্য, তাই আমরা দেখতে পেলাম নারীর জন্মদাতা বাবা, আশ্রয়দাতা ভাই ও নারীর সান্নিধ্যে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভকারী স্বামী এমন কি মায়ের শরীর হতে কেটে পৃথক করা সন্তানের ঘরেই জীবনের শেষ বয়সে নির্যাতিত এবং সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে আসছিলো যুগের পর যুগ। এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে খ্রিস্টীয় আঠার শতাব্দীতে কিছু নারী তাদের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বত্র প্রবহমান যুল্‌ম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারা পৃথিবীর সকল নারীদেরকে এসব যুল্‌ম নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে মুক্তির একটি পথ দেখালো। পরবর্তীতে সেটি নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে **'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন'** নামে বিশ্বের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করলো।

'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' এর ব্যানারে তাদের কী দাবী ছিলো? তাদের সেই আন্দোলনের প্রভাব বিশ্বের নারী সমাজের ওপর কেমন পড়েছিলো? এটি আমাদের অনেকেরই আজ অজানা। ক্ষতি বা নেগেটিভ বিষয়টিকে

বিবেচনায় না নিয়ে সবাই পজেটিভ বা লাভ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। তাই এখানে বাস্তবতার আলোকে পাঠকদের কাছে সেই আন্দোলনের ফলাফলসহ নারী আন্দোলনের সার সংক্ষেপ তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। যাতে পাঠকরা বুঝতে পারেন যে, নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যানারে রাজপথে দাঁড়াতে গিয়ে আজ কারা বেশী লাভবান হয়েছে। নারী সমাজ নিজেদের সমান অধিকারের স্লোগানের আড়ালে কী পেয়েছে আর কী হারিয়েছে?

ইউরোপে নারী-পুরুষের মাঝে সমান অধিকারের সর্বপ্রথম আহবান বা দর্শন Mary Wollstonecraft (April 27, 1759- Sep 10, 1797) নামক একজন বৃটিশ নারী দার্শনিক পেশ করেন। ১৭৯২ ইংরেজীতে ২১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তার বিখ্যাত বই Vindication of the Rights of Women এর মধ্যে তিনি সমাজে নারীর অধিকার সম্পর্কীয় তার দর্শন পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন। উক্ত বইতে তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের মত শিক্ষা, চাকরি এবং রাজনীতিতে সমান অধিকার পাওয়া উচিৎ বলে দাবী জানান। জীবনের সকল বাঁকে উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও একই ধরনের হওয়া উচিৎ বলেও তিনি মন্তব্য করেন। উপরোক্ত দাবীগুলো সম্পর্কে তিনি এভাবে লিখেছেন:

'Women should receive the same treatment as men in education,work opportunities and politics and that the same moral standards should be applied to the both sexes' [80]

পরবর্তীতে John Stuart Mill (May 20,1806-May 8, 1873) সহ একই চিন্তা ধারার আরো অনেকে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে যুক্তি-তর্ক পেশ করে লেখা-লেখির মাধ্যমে উক্ত দর্শনের প্রচার শুরু করেন। যার কারণে খুব দ্রুত এটি একটি নতুন আন্দোলনের রূপ নিয়ে সমগ্র ইউরোপে বিদ্যুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এটি আত্মপ্রকাশ করলো। যা শুনতে খুবই শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী ছিলো। তাই সমগ্র পৃথিবীর নারীরা এটিকে লুফে নিয়ে স্বাগত জানিয়ে সমান অধিকার আদায়ের কাতারে এসে শামিল

---

80 - Vindication of the Rights of Women. p. 170

হয়ে গেলো। তারা তাদের অধিকারের কথা ভেবে দলে দলে এই আন্দোলনের ব্যানারে একত্রিত হয়ে সর্বত্র নিজেদের অধিকার আদায়ের আওয়াজ উঠালো। এটিকে একটি সূবর্ণ সুযোগ মনে করে পুরুষদেরও বিরাট একটি অংশ যারা আগেই সমাজে নারীর বে-পর্দা ও উলঙ্গপনাসহ বেহায়াপনার প্রচার ও প্রসার ঘটানোর আকাঙ্খায় ডুবে ছিলো, তারাও এই আন্দোলের প্রতি অত্যন্ত জোরালো ভাবে একাত্মতা ঘোষণা করলো। যার পরিণতিতে এই আন্দোলন নারীর উন্নয়ন এবং নারী প্রগতির স্লোগানে সবার মুখে মুখে পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিদ্যুত গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। পরিস্থিতি এমন এক রূপ ধারণ করলো যার বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থই ছিলো, নারী প্রগতি ও নারী উন্নয়ন বিরোধীর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া।[৮১]

এখন প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি তাই? নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিরোধীতাকারী কি নারী উন্নয়ন এবং নারী প্রগতি বিরোধী? ইসলাম কি বলে? ইসলাম যদি নারী পুরুষকে সমান মনে না করে তাহলে কেন? আর যদি তাই না হয় তাহলে ইসলামে নারীর সাক্ষ্যকে অর্ধেক কেন মনে করা হয়? পুরুষের সমান কেন ধরা হয় না? উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা প্রত্যেক মুসলামানের জরুরী এবং নারী সমাজের এই সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে বলে আমি মনে করি। কারণ ইসলাম সম্পর্কে নারীর ধারণা যত স্বচ্ছ এবং গভীর হবে নারী ততবেশী নিরাপদ থাকতে পারবে শুধু তাই নয়; নিজেদের ষোলআনা অধিকারও পাবে এটি হলফ করে বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এগুলো জানা থাকলে নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের বাস্তবতা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হবে না বলেও আমি মনে করি।

আমরা নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন এবং স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করলে শুরুতেই যা দেখতে পাই তা হলো, উভয়ের শারীরিক গঠন এবং স্বভাবের মাঝে বিশাল কিছু পার্থক্য রয়েছে। একে অপরের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির এবং শারীরিক গঠনের দিকে দিয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সক্ষমতা ও অক্ষমতার দিক

৮১- বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মাদ রফীক চৌধুরী, **ইসলাম আউর নাযরিয়্যাতে মুসাওয়াতে মরদ ও যন**, (উর্দু) পৃষ্ঠা নং-১৭, ইদারায়ে মা'আরিফে ইসলামী, পাকিস্তান।

দিয়ে কেউ সবল এবং কেউ দুর্বল। কোনো বিষয়ে নারী সক্ষম হলে পুরুষ সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্যদিকে পুরুষ যা করতে পারে নারী তা পারে না। আবার অনেকগুলো বিষয়ে নারী-পুরুষ সবাই সমান। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌র ইবাদাত, নৈতিক চরিত্র, গুনাহ্, সাওয়াব, ন্যায়, অন্যায়, জাহান্নামের শাস্তি, আখেরাতে পুরস্কার ও সম্মানসহ জান্নাত ও জাহান্নাম লাভের দিক দিয়ে নারী-পুরুষ সবাই সমান। উভয়কে আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই নারী-পুরুষ উভয়কে মানুষের গুণাবলীতে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয়ের চরিত্র এক হতে হবে। অর্থাৎ নৈতিক চরিত্রের সকল বিষয়ে নারী-পুরুষ সবাই সমান।

অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কবরে সবাইকে একই প্রশ্ন করা হবে। সবার উত্তরও এক হবে। এখানে কনফিউশনের কোনো সুযোগ নেই। রাজার প্রশ্ন এক, প্রজার প্রশ্ন আরেক, আখেরাতে এমন দুই নম্বরীর চিন্তাও করা যাবে না। দুন্‌ইয়ার ভাষা পরিভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও মতলব থাকতে পারে। যেমন বায়োলজির পরিভাষায় মানব শরীরের কোষিকাকে 'সেল' বলে। ফিজিক্স এর পরিভাষায়ও ব্যাটারীকে 'সেল' বলে। ইকোনোমিক্স এর পরিভাষায় বিক্রিকে যেমন 'সেল' বলে। হিস্ট্রির পরিভাষায় জেলকেও 'সেল' বলে। ইংরেজীর পরিভাষায় মোবাইলকে 'সেল' বলে। দুন্‌ইয়ায় প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে পান্ডিত্য দেখাতে পারলেও কিন্তু বিভিন্ন ভাষা ও পরিভাষা নিয়ে কনফিউশনও সৃষ্টি হতে পারে।

তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল, দ্বীন ও শারী'য়াত নিয়ে কোনো কনফিড়শন থাকতে পারবে না। থাকলে এটিকে পান্ডিত্য বলে না, বলে মূর্খতা। তাই আখেরাতে উভয়কে একই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে সাবজেক্টের এক্সপার্টের কোনো দাম নেই, দাম হবে ঈমানের। সবার 'আমলনামা পৃথকভাবে দুন্‌ইয়ার জীবনে রেডি করা হচ্ছে। একইভাবে আখেরাতে ওজনও করা হবে এবং পৃথক পৃথক হিসাবও নেয়া হবে। তাই নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে দ্বীন ও শারী'য়াতকে নারী সম্পর্কীয় বিষয়ে গাল-মন্দ করার আগে নিজেই ভৎর্সনার কথা মনে রাখতে হবে। যারা এমন করাকে পছন্দ করে তাদেরকে বলতে চাই, অনর্থক অন্যের

জীবনে অনুপ্রবেশে আপনার কোনো লাভ নেই। আপনার নিজের মধ্যেই এমন অনেকগুলো বিষয় রয়েছে সেগুলোর প্রতি আপনার মনোযোগ দেয়া দরকার। কারণ আল্লাহর পাল্লা বা বাটখারায় শুধু ইনসাফ মাপা হয়। যা করবেন তাই পাবেন। অতএব নারীকে ভালো করে বুঝতে হবে, নারীর সংসার নষ্ট করার আশ-পাশেই লোকের অভাব নেই। যখন কোনো নারীর ঘর-সংসার নষ্ট হয়ে যায় তখন দূর দূর পর্যন্ত কাউকে আর তার পাশে দেখা যায় না। নারীকে মনে রাখতে হবে, তার শত্রু সব সময় ওৎপেতে বসেছিলো। পেছনে বন্ধুরাও দাঁড়িয়ে ছিলো। তাই প্রথম গুলিটি কে মেরেছে সেটিই এখন প্রশ্ন।

এমতাবস্থায় দুন্ইয়াতে ইবাদাত বন্দেগী এবং নেক 'আমল করে আখেরাতের মুক্তি নিজেকেই নিশ্চিত করে যেতে হবে। দুন্ইয়ার জীবনে নারী-পুরুষের পাপের শাস্তি এবং ভালো কাজের পুরস্কার যেমন সমান, ঠিক আখেরাতের সাওয়াবও সমান হবে। নেক 'আমলের পুরস্কার এবং বদ 'আমলের শাস্তিও সমান হবে। এসম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে চুরি, যেনা, ব্যভিচার ও হত্যার মত অপরাধে নারী-পুরুষ সবাইকে সমান শাস্তি পেতে হবে।

এখানে প্রণিধান যোগ্য বিষয় হলো, ইসলামে নারী-পুরুষ যদি সমান না হতো তাহলে উভয়ের শাস্তিতেও ভিন্নতা দেখা যেতো। কিন্তু না, সৎ কর্মের পুরস্কারও উভয়কে সমান দেয়া হবে। আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে এসম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন :

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾[৮২]

'যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।'

আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনের অন্যত্র বলেছেন:

৮২- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-১২৪

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[৮৩]

'যে মন্দ কাজ করে সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিয্ক্ব দেয়া হবে।'

উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনায় বোঝা গেলো যে, আখেরাতের ফায়সালায় নারী-পুরুষ সবাই সমান। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান নয়। আমরা যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, নারী-পুরুষ বেশ কিছু ক্ষেত্রে একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, পরস্পরের মাঝে ভিন্নতা কখনো মান-সম্মান এবং মর্যাদার মাঝে ব্যবধান প্রমাণ করেনা। তাই কেউ উৎকৃষ্ট আবার কেউ নিকৃষ্ট এটি মনে করারও কোনো সুযোগ নেই।

যেমন একজন মানুষ এক ময়দানে কাজ করে আবার অন্যজন অন্য ময়দানে কাজ করে। মানব জীবনের সর্বত্র কর্মক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। কেউ চাকরি করে আবার কেউ কৃষি কাজ করে। কেউ ব্যবসা করে আবার কেউ শিক্ষকতা করে। কেউ উচ্চশিক্ষা লাভের পরও স্বামী-সংসার নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। আর কেউ কোনো শিক্ষা ছাড়াই চাকরি করছে। তবে এখানে কেউ কারো থেকে শ্রেষ্ঠেত্বের দাবী করতে পারে না। তাই সন্তান জন্ম দেয়া এবং সন্তানকে দুধ পান করানো এটি নারীর স্বভাব ও চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত একটি কাজ। পুরুষের পক্ষে এটি করা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা এবং নৈতিকতা সৃষ্টিতেও মায়ের ভূমিকা বেশী। ঘরের কাজেও নারীর অবদান বেশী। যেমন রান্না করা ঘর-বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নারীর স্বভাব।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, যে কন্যা মায়ের মৃত্যুতে অথবা মা-বাবার বিচ্ছেদের কারণে বাবা ও ভাইয়ের যত্নে বড় হয়, তার মধ্যে পুরুষের চরিত্র বেশী থাকে। অন্যদিকে মাঠের প্রচন্ড রোদে হালচাষ করা

৮৩- সূরাতুল মু'মিন, আয়াত নং-৪০

এবং কল-কারখানার উত্তপ্ত গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেশিন চালিয়ে পণ্য উৎপাদন করা, পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে রুটি-রুজির উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ানো এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে পণ্য বহনের কাজ করা, কুলি মজুরের মত মাঠে-ঘাটে ভারী জিনিস কাঁধে তুলে নেয়ার মতো পরিশ্রমের কাজে সাধারণত পুরুষকেই এগিয়ে আসতে হয়। পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার জন্য পুরুষকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এবং দুর্যোগের পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নিজের জীবন সঙ্গিনীকে নিরাপত্তা দেয়ার কাজটিও পুরুষকেই করতে হয়। এসব মুহূর্তে নারীরা শুধু পেছনেই থাকে না, উল্টো আশ্রয়ও খুঁজে বেড়ায়। সত্যিকারের পুরুষ স্ত্রীর কাছে শুধু মুকসূদ আলী হতে বা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইলে তার নিজের আত্মাও তাকে ভৎর্সনা দেয়। আর মুখলিস বা সাদা মনের থাকতে চাইলে যামানাও তাকে বাঁচতে দেয় না। সমাজ তাকে বোকা বলে।

স্বামীকে বুঝতে হবে, স্ত্রী শুধু নামেই বদনাম। বাস্তবে স্বামীর সুখে-দুঃখে শুধু স্ত্রীই কাছে থাকে। নারী-পুরুষ উভয়কে মনে রাখতে হবে, নিজের মনের মত স্বামী-স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। উভয়ে এক সাথে আনন্দে জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য এবং কোরবানী। এখানে একজন যতই ধৈর্য ধারণ করুক এবং যতই সেক্রিফাইজ করুক না কেন দাম্পত্য জীবন কখনো স্বর্গীয় জীবন হবে না। নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে স্বর্গীয় জীবন বানাতে হলে উভয়কে ধৈর্য যেমন ধরতে হবে তেমনিভাবে নিজের অনেক চাহিদাকেও বিসর্জন দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ছোট ছোট আনন্দের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে পারলে নিজেদের দাম্পত্য জীবন আনন্দে কাটবে এটি হলফ করে বলা যায়।

তৃতীয় যে কথাটি বলে ইসলামকে বদনাম করার অপচেষ্টা চলানো হয় তা হলো, ইসলামে নারীর সাক্ষ্যকে অর্ধেক বিবেচনা করে সমাজে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে, অপরাধ প্রমাণের জন্য ক্বোরআন বিশেষ কোনো নির্দেশনা দেয়নি। তাই ইসলামী আদালতে অপরাধ প্রমাণের জন্য এমন সব পন্থা অবলম্বন করা হয় যেসব পন্থা নীতি ও নৈতিকতা এবং বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে

অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব। তাছাড়া মানুষের বিবেক যখন অপরাধ প্রমাণে সাড়া দেয় তখনই বিচারিক আদালতে কাউকে অপরাধী অথবা নিরপরাধি বলে সাব্যস্ত করা হয়।

তাই আমরা দেখতে পাই অপরাধ প্রমাণের জন্য পরিস্থিতি, অপরাধের ধরণ, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পোষ্টমর্টেম, আঙ্গুলের ছাপ, সাক্ষ্য-প্রমাণ, ১৬৪ ধারায় অপরাধীর অপরাধ স্বীকার অনুরূপভাবে আরো বিভিন্ন প্রকারে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেমনিভাবে দুন্ইয়ার আদালতে অপরাধ প্রমাণ করা হয়, ঠিক একই ভাবে ইসলামী আদালতেও অপরাধ প্রমাণের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, রিমান্ডে নিয়ে পুলিশের অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে স্বীকারোক্তিকে পরবর্তীতে প্রত্যাহার করে নেয়ারও সুযোগ থাকে। তাই প্রচলিত আদালতে অপরাধী যখন স্বেচ্ছায় এবং সুস্থ মস্তিষ্কে ১৬৪ এ ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তি দেয় তখনই আদালত তাকে অপরাধী বলে। কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ ছাড়াই যখন কেউ নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়, তখনই ইসলামী আদালত তাকে দোষী বলে। এর আগে নয়। এসম্পর্কে হাদীসের পাতা উল্টালে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لو يُعْطَى الناسُ بِدَعْواهُم، لأدَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ وَدِمَاءَهُم، لَكِنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)[৮৪]

'ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, মানুষের দাবী অনুযায়ী যদি ফায়সালা করে দেয়া হয়, তাহলে অনেকেই অনেকের সম্পদ এবং (জীবন) কেসাসের দাবী করে বসবে। তাই বাদীকে অবশ্যই সাক্ষী আনতে হবে এবং অস্বীকারকারী (বিবাদী) কে ক্বাস্ম করতে হবে।'

ইমাম ইবনুল কায়্যেম উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এলামুল মুওক্বে'য়ীন এ লিখেছেন:

৮৪- حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين

(اَلبَيِّنَةُ فِي كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ إِسمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ، فَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْبَيِّنَةِ فِى اصْطِلَاحِ الْفُقَهاءِ حَيْثُ خَصوها بالشَّاهِدَيْنِ، أَوِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ)[৮৫]

'আল্ বায়্যেনাহ্' হলো এমন একটি নাম যা দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাদের কথায় ঐ সব কথাকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে হক্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব ফুক্বাহা বা ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় এর অর্থ ব্যাপক। কারণ তারা দু'জন সাক্ষী অথবা একজন সাক্ষী এবং ক্বাসম এর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে।'

অতএব উপরোক্ত হাদীস এবং আল্লামা ইবনূল কায়্যেমের ব্যাখ্যাটি বিবেচনায় নিলে আমরা এখানে শুধুমাত্র দু'টি পথ খোলা দেখতে পাই। তা হলো কেউ যদি কোনো ভদ্র ও পবিত্র নারী বা পুরুষের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এমতাবস্থায় ক্বোরআনের বক্তব্য হলো অভিযোগকারীকে অবশ্যই চারজন চাক্ষুস সাক্ষী হাযির করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে কোনো ভাবেই তার দাবী মেনে নেয়া যাবে না। অপরাধ প্রমাণের জন্য পরিস্থিতি, অপরাধের ধরণ, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধুমাত্র দু'টি কারণেই ব্যতিক্রম হবে। নারী বা পুরুষ যাদের ব্যাপারে অভিযোগ করা হচ্ছে তারা দুশ্চরিত্রের হলে তাদের অপরাধ প্রমাণের জন্য উল্লেখিত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে, তিনি যদি সমাজে সম্মানিত এবং সবার কাছে নীতি ও নৈতিকতার দিক দিয়েও পরীক্ষিত হন এমতাবস্থায় ইসলামের বক্তব্য হলো, যদি তিনি কোনো অপরাধ করে ফেলেন তাহলে তা গোপন রাখা। সমাজে তার অপরাধ প্রচার করে তাকে অপমান করা অনুচিৎ বলে ইসলাম মনে করে। এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে শুধু দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ অপরাধ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। অভিযোগকারী এটি করতে না পারলে তাকে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত করা হবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন:

৮৫- إعلام الموقعين، ج/১، ص: ১৩১ وجامع الفقه، كتاب القضاء، ج/৭ ص: ১২৩

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[৮৬]

'আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।'

দ্বিতীয়তঃ নারী যদি ব্যভিচারিণী হয়ে থাকে তাহলে ক্বোরআনের আলোকে তার অপরাধ প্রমাণের জন্য চারজন মুসলিম সাক্ষী নিয়ে আসতে হবে। যারা বলবে, সত্যিই এই নারী সমাজে ব্যভিচারিণী এবং যেনা করার অভ্যাস ও তার সাহস রয়েছে। আদালতে যদি তারা পুরো দায়িত্বের সাথে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলে, আমরা তাকে সমাজে ব্যভিচারিণী হিসেবে জানি। আদালত তাদের জেরা করে যদি সন্তুষ্ট হতে পারে তাহলেই কেবল এমন নারীকে শাস্তি দিতে পারে। অন্যথায় শাস্তি দেয়া যাবে না। আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾[৮৭]

'আর তোমাদের নারীদের যারা ব্যভিচারিণী, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখো। যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্দেশ না করেন।'

উল্লেখিত দু'টি পন্থা ছাড়া ইসলামী শারী'য়াত অপরাধ প্রমাণের জন্য অন্য বিশেষ কোনো পন্থা অবলম্বনের জন্য বাধ্য করে না। অতএব ফৌজদারী অপরাধ হোক বা অন্য কোনো প্রকারের অপরাধের সাক্ষী হোক এটি সম্পূর্ণ বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তিনি যাকে সঠিক মনে করবেন, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, আর যাকে তিনি সত্যবাদী মনে করবেন না, তার

৮৬- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৪

৮৭- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-১৫

সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। এখানে বিষয়টি নারী-পুরুষের সাথে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নয়। কারণ নারী যদি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট করে বিশদ বর্ণনার সাথে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে শুধুমাত্র তার সাক্ষ্যকে এই জন্যই বাতিল করে দেয়া হবে যে, তার সাথে অন্য কোনো নারী বা পুরুষ সাক্ষী নেই বিষয়টি কখনো এমন হবে না।

অন্যদিকে পুরুষ সাক্ষীর বক্তব্য যদি অস্পষ্ট হয় এবং পরিষ্কার করে কিছু বলতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলে এমতাবস্থায় তাকে শুধুমাত্র পুরুষ হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আদালত অন্য সাক্ষীদের বক্তব্য এবং অপরাধ প্রমাণের জন্য পরিস্থিতি, অপরাধের ধরণ, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমলে নিয়ে বিচারক যদি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাহলে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আর বিচারক যদি সাক্ষীর সাক্ষ্যতে কোনো ভাবেই সন্তুষ্ট হতে না পারেন তাহলে সাক্ষী শুধুমাত্র পুরুষ হওয়ার কারণে কোনো ভাবেই গ্রহণ করবেন না। অতএব এমতাবস্থায় দশজন পুরুষ সাক্ষ্য দিলেও আদালতের কাছে কখনো গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। ব্যভিচারী নারীর অপরাধ প্রমাণের জন্য সাক্ষী ছাড়াও ক্বোরআন **'মিনকুম'** বলে শর্তারোপ করে বিষয়টিকে শুধুমাত্র মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ফকীহ্দের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তারা তাদের অভিমত সুরা বাক্বারাহ্র ২৮২ নং আয়াতের আলোকে দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে:

﴿وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ، فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى﴾[৮৮]

'তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার সাক্ষী রাখো। আর যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে। যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে ইসলামী ফাক্বীহ বা আইনবিদগণ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেখানে বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন।

৮৮- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২৮২

তাদের অনেকে বলেছেন, ফক্বীহগণ **'শাহাদাহ্'** কথা বলে যে রায় দিয়েছেন তার সাথে এই আয়াতের কোনো সম্পর্কই নেই। মূলতঃ এটি সনদের সাথে সম্পৃক্ত। তাই প্রতিটি ব্যক্তি খুব ভালো করেই জানে যে, সনদ বা দলীলের সাক্ষীর জন্যই কাউকে ডাকা হয়। ঘটনার সাক্ষী ঘটনাস্থলে ঘটনাক্রমেই পাওয়া যায়। সাধারণত ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষী খুব কমই থাকে। অতএব এটিও আমাদেরকে ভাবতে হবে।

তবে দলিল বা কোনো চুক্তিপত্র লেখার সময় যেহেতু অনেকেই জানে সেহেতু এখানে সাক্ষী বানানোই যুক্তি যুক্ত। তাই দাতা ও গ্রহীতা নিজের পছন্দমত যাকে খুশী তাকে সাক্ষী বানাতে পারে। কিন্তু যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, হত্যা-ধর্ষণসহ ফৌজদারী অপরাধের সময় ঘটনাস্থলে কে উপস্থিত থাকবে? কেন থাকবে? স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তখন চাক্ষুস সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব শাহাদাহ্ বা সাক্ষীর উপরোক্ত বর্ণনার মাঝে অবশ্যই ব্যবধান রয়েছে এবং থাকবেই। একটি আরেকটির সাথে ক্বিয়াস করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে পয়েন্টটি প্রণিধান যোগ্য তা হলো, উক্ত আয়াতের নাযিলের সময় ও অবস্থান এবং বর্ণনার ভঙ্গি কখনো এটি প্রমাণ করে না যে, এটিকে আইন ও আদালতের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। কারণ এই আয়াত আদালতকে সামনে রেখে বা উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়নি। এখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটলে বিবাদীর কাছে এধরনের সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য বলা হয়নি।

এই আয়াতের লক্ষ্য হলো, ঐ সব লোক যারা ধার লেন-দেন করে। তাই এই আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে, একটি সময় পর্যন্ত যদি তারা এধরনের লেন-দেন করে তাহলে যেন তারা দলীল বা Agreement করে নেয়। ক্ষতি এবং ঝগড়া হতে বাঁচার জন্য এমন কিছু সাক্ষীর ব্যবস্থা করবে যাদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে কারো কোনো কথা থাকে না। মোটকথা, তারা বিশ্বস্ত এবং ঈমানদার হবে। নিজের ব্যস্ততা এবং কর্ম তৎপরতার পরও তারা এমন একটি দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

মূলতঃ একারণেই পুরুষদেরকে সাক্ষী বানাতে এবং দুইজন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষের সাথে দুইজন নারীকে সাক্ষী বানানোর কথা

বলা হয়েছে। ঘরে অবস্থানরত স্ত্রী যদি আদালতের পরিবেশে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে সাক্ষীর সাক্ষ্যকে চাঞ্চল্য এবং সন্দেহ হতে বাঁচানোর জন্য অন্য স্ত্রী যেন তার সাহায্যকারী এবং সহযোগী হয়ে তাকে সাহস যোগায়। এটিই হলো উপরোক্ত আয়াতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। **ওয়াল 'ইলমু ইন্দাল্লাহ্** বা আসল ব্যাখ্যা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

অতএব এটি কখনো হতে পারে না যে, আদালতে কমপক্ষে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন নারী যখনই এসে সাক্ষ্য প্রদান করবে তখনই বাদী-বিবাদীকে সত্য বলে ধরে নেয়া হবে। এটি একটি সামাজিক দিক-নির্দেশনা। এটির অনুসরণ করতে পারলে সমাজ ঝগড়া-ঝাটি এবং হৈ হট্টোগোল হতে মুক্ত এবং খুন-খারাবী হতে পাক-পবিত্র থাকবে। সমাজের বিচ্ছৃঙ্খলা রোধে এবং নিজেদের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এটিকে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। তবে মামলার সুষ্ঠু সমাধান এবং রায় প্রদানের জন্য আদালতের কাছে এটিই একমাত্র সমাধান মনে হতে পারে না। সুতরাং এধরনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ক্বোরআনে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন:

﴿ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا﴾[৮৯]

'আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত, এর সাহায্যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়।'

ক্বোরআন হাদীসের আলোকে উপরোক্ত আলোচনা হতে যে কোনো পাঠক সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, এই সব মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা শুধুমাত্র ইসলামকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮৯- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং- ১৮২

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামে নারীর অবস্থান

পশ্চিমা অপশক্তি এবং ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী আধুনিকতা ও সভ্যতার নামে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কত বেশী সজাগ ও সোচ্চার তা আমাদের অনেকেরই অজানা। বর্তমান বিশ্বে কিছু মুসলমান নামধারী বুদ্ধিজীবী সেজে তাদেরকে কীভাবে ও কত প্রকারে সাহায্য করে সেটিও আমাদের কাছে গোপন। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে কোথায় কীভাবে ষড়যন্ত্র চলছে এখানে তার কিছু নমুনা তুলে ধরছি।

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সালমান রুশদীর বই The Satanic Verses ভারতে নির্বাসিত মুসলিম নামধারী তসলিমার 'লজ্জা' ও 'আমার মেয়েবেলা' পরিশেষে তার 'ক' বইটিসহ হুমায়ুন আযাদের বই 'নারী' ও 'পাকসার জমিন শাদ বাদ' এবং সম্প্রতি প্রকাশিত মরক্কোর ফাতেমা মরনসিসি নামক একজন মুসলিম নারীর 'Women and Islam' নামক বই গুলোই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। ফাতেমা মরনসিসির বইটি সম্পর্কে দিল্লী হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক Observer of Business and Politics পত্রিকায় ২৭ জুন ১৯৯৩ সালে এক বিশাল আলোচনা করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনায় ফাতেমা ও তার বইয়ের খুব প্রশংসা করে ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায় তা বুঝার জন্য পাঠকদেরকে বইটি পড়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কারণ সেই বইতে ফাতেমা মরনসিসি ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে। আর যেহেতু সে মুসলমান সেহেতু ইসলামের বিরুদ্ধে তার বলা ও লেখা সবই দলীল হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ফাতেমা মরক্কোর রাবাত ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞানের একজন প্রফেসর। বইটি সে এমন ভাবে লেখেছে যেন এটি তার আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা বিরোধী রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে তার জন্ম ও ইসলাম প্রিয় পরিবেশে বড় হওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছে।

ছোটবেলায় তার স্বল্প শিক্ষিত দাদীর কাছে রাসূল (স.) এর নৈতিক চরিত্র এবং আরবের মুশরিকদের মাঝে **'আল্ আমীন'** খেতাব পাওয়া সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা শুনেছেন যার মাধ্যমে রাসূলের চিত্র তার মানসপটে

এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, মাদীনাহ্‌র জীবনে রাসূল ছিলেন বিধবাদের অবিভাবক, গরীবদের সাহায্যকারী, ইয়াতীম, অসহায় ও অনাথদের দায়িত্বশীল এবং নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। দাদীর কাছে এভাবে রাসূলের বর্ণনা শুনে একটি সুন্দর ও মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে তার অন্তরে রাসূলের চিত্র সেদিন ভেসে উঠেছিল। কেন উঠবে না? রাসূল (স.) তো ছিলেনও তাই। যেমনটি আমরা তাঁর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন) খাদীজাহ্‌র (রা.) কণ্ঠে এভাবে শুনতে পেয়েছি। তিনি অহী নাযিলের প্রথম দিনের ঘটনাটি এভাবে বলেছেন:

(عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّها قَالَتْ..... فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَلَا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ)[৯০]

'আয়েশাহ্‌ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খাদীজাহ্‌ (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) কে সান্তনা দিয়ে বললেন, ভয়-ভীতির কোনোই কারণই নেই। আল্লাহ্‌র ক্বাস্‌ম! আল্লাহ্‌ আপনাকে কোনো দিন অপমানিত করবেন না। এটা সুনিশ্চিত। কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রেখে চলেছেন, দরিদ্র ও দুর্বলদের দায়িত্ব বহন করছেন, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থদেরকে উপার্জনক্ষম করে তুলেছেন, অতিথিদের আতিথেয়তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন এবং হক্বপন্থী বিপদগ্রস্থদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলছেন।'

এধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা দাদীর কাছে শোনার পরও কিন্তু ফাতেমা যখন শিশুকাল শেষ করে যৌবনে পা বাড়ালো, এবং দাদীর শিক্ষালয় হতে বের হয়ে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগতে লাগলো, তখন আস্তে আস্তে দাদীর নির্মিত রাসূল প্রেমের সুপ্ত সৌধের এক একটি ইট প্রকাশ্যে খসে পড়তে লাগলো। শেষ পর্যায়ে যে অন্তরে রাসূল প্রেম বাসা বেঁধে ছিলো সেখানে এখন রাসূল বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্ম নিলো। এরপর সে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির তত্ত্বাবধানে তাদের দেয়া চশমা চোখে দিয়ে

৯০- البخاري، كتابُ بَدءِ الوحي، رقم الحديث: ٣

ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলের জীবন পুনরায় অধ্যয়ন করতে লাগলো। অতঃপর যা হওয়ার তাই হলো। ধীরে ধীরে তার অন্তরে দাদীর প্রতিষ্ঠিত রাসূলের চিত্র ও চরিত্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস জন্মেছিলো এবং রাসূল চরিত্রের যে বিশাল মিনার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। যা নির্মাণ করতে তার দাদী বহু পরিশ্রম করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়, ফাতেমার ঈমান আক্বীদায়ও বিশাল পরিবর্তন দেখা দিল। সে এখন আর ইসলাম প্রিয় মুসলমান থাকলো না; বরং একজন অস্থিতিশীল নারী হিসেবে আবির্ভূত হলো। আজকের পশ্চিমাদের শেখানো পরিভাষায় সে তথাকথিত **'উদারপন্থী, উন্নয়নকামী ও প্রগতিশীল নারী'** হয়ে গেলো। ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার এবং মিথ্যা প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হওয়ার কারণে তার অন্তরে রাসূলের বিকৃত চিত্র ভেসে আসার সাথে সাথে ইসলামের শত্রুরা তাকে লুফে নিল। তার এই কু-চিন্তার প্রচার প্রসারে সহযোগিতা করতে শুরু করলো। অতঃপর তাদের পাতানো পথভ্রষ্টতার জালে সে এমন ভাবে আটকা পড়লো সেখান হতে আর বের হতে পারলো না। তার দাদীর বানানো আলোকিত জীবনে নেমে আসলো এক গভীর অমানিশা। দাদীর দেখানো জান্নাতের রাস্তা পাড়ি দিতে গিয়েও হঠাৎ করে ইউটার্ণ নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নিজের গতিপথ পাল্টে দিলো।

অতঃপর নারীদের হিতাকাঙ্খি ও সম্মানদানকারীর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) কে নারীদের অপমানকারী মনে করতে লাগলো। এমন কিছু হাদীস ও ক্বোরআনের কিছু আয়াত তার সামনে আসলো যার সঠিক অর্থ বুঝতে সে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তার মানসপটে ইসলামের পুরো চিত্রই পাল্টে গেল। শুরু হলো ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষায় তার লেখা-লেখি। আলোচনা ও সমালোচনা। তাই বলছিলাম, কারো সাথে মত বিরোধ করে দেখুন, তখন জানতে পারবেন ডিগ্রীর আড়ালে কিছু লোক ভদ্রতার সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এরাও তাই করেছে। তবে এসব ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, কাউকে অপমান করার আগে নিজের অপমান হওয়ার জন্য তৈরী থাকুন। কারণ আল্লাহর পাল্লায় শুধু ইনসাফ মাপা হয়।

অনুরূপভাবে পবিত্র ক্বোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ব্যাহ্যিক অর্থ দেখে তার মধ্যে উল্লেখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার ধারণা। বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও ইসলাম বিরোধী হওয়াটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কারণ এটি আলোকে অন্ধকার বুঝতে তাকে সাহায্য করেছে। পরিণতিতে সে ইসলামকে নারী বিদ্বেষী একটি ধর্ম মনে করে বসলো। আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) মুসলিম উম্মাহ্‌র পারিবারিক জীবনে বহু প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এসব কাজ পারিবারিক জীবনে আমল করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বাস্তবায়ন করার রাস্তা উন্মুক্ত করে গেছেন। যার প্রমাণ উম্মাহাতুল মু'মেনীনদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি।

রাসূল (স.) এর উক্ত সব ঘটনাবলীকে তার কলেজ জীবনের শিক্ষকরা সব সময় ঘৃণ্যভাবে উপস্থাপন করেছে। যা তার সুন্দর ইসলামী জীবন এবং চিন্তা-চেতনাকে মুহূর্তের মধ্যে ওলট পালট করে দিয়েছে। তাই সে আল্লাহ্‌র রাসুলকে অবজ্ঞা করে তার বইতে বার বার লেখেছে "তিনিই এক আল্লাহ্ যিনি এমন এক নাবীকে নির্বাচন করেছেন, যে নাবী নিজের ইচ্ছা আকাঙ্খা পূরণসহ যৌন বিষয়ে নিজের ধ্যান ধারণাকে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতেন।" এভাবে সে রাসূলের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, সে অবজ্ঞার ভাষা ও ভঙ্গিতে 'তিনিই এক আল্লাহ্....' বললেও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হ্যাঁ তিনিই এক আল্লাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে মানব জীবনের সব কিছু তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তবে ফাতেমা যেভাবে রাসূল (স.) সম্পর্কে বিশ্রী ভাষায় বলেছে রাসূল (স.) তেমন ছিলেন না। কারণ আমরা হাদীসের ভান্ডারে দেখতে পাই:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا)[৭১]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম যার চরিত্র উত্তম।'

---

[৭১]- صحيح البخاري، كتاب المناقب، ج/٣

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই মাদীনাহ্‌র নারীরা প্রকৃতিগতভাবে কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে মাক্কার নারীদের তুলনায় সাহসী ছিলেন। তবে কখনো কখনো তাদের এই সাহসিকতা পিতা ও স্বামীদের ইয্‌যাত সম্মানের সীমানাও ছাড়িয়ে যেত। এমন অবস্থা যখন সর্বত্র দেখা দিতে লাগলো, তখন উমার (রা.) কঠোরতা অবলম্বন করলেন। একবার তাঁর স্ত্রীও যখন এরূপ আচরণ করলেন, তখন তিনি কঠোরভাবে বাধা দিলেন। যেহেতু আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না; বরং তাদেরকে মানুষও মনে করা হতো না সেহেতু পিতা তার কন্যাকে জীবিত মাটি চাপা দিত। জাহেলী যুগে কন্যা জন্ম দিলে সমাজে পিতাকে ছোট মনে করা হতো।

ইসলামের আগমনে সেই বর্বর সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তারা মানব সমাজে মানুষ হিসেবেও বাঁচার সুযোগ পেল। পুরুষদের ন্যায় নারীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইজ্জত সম্মান দেয়া হলো। তাই দাবিয়ে রাখা নারীত্ব যখন হঠাৎ মুক্তি পেলো, তখন কখনো কখনো নারী সীমা লঙ্ঘন করতে লাগলো। প্রতিনিয়ত পিতা ও স্বামীর স্বল্প পরিমাণে হলেও সমাজে অবাধ্যতা দেখা দিলো। এই সব অনাকাঙ্খিত বিচ্ছৃঙ্খলা হতে সমাজের পরিবেশ রক্ষার্থে ওমর (রা.) কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করলেন। শুধু তাই নয়; এই বিষয়ে তিনি তাঁর মেয়ে রাসূলের স্ত্রী উম্মুল মু'মেনীন হাফসাহ্‌ (রা.) কেও শাসন করেছেন।

তবে এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে, পবিত্র ক্বোরআন পুরুষদেরকে শুধুমাত্র তাদের স্ত্রীগণকে শাসন করার অধিকার দিয়েছে। মারার জন্য হুকুম দেয় নাই। কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে এবং তার শরীরে দাগ পড়ে যায়, অথবা রক্ত বের হয় বা চামড়া কেটে যায়, বা হাড় ভেঙ্গে যায় তাহলে স্বামীকে শাস্তি পেতে হবে বলেও শারী'য়াত জানিয়েছে। অতএব ইসলামের এই বিধানটি নিয়ে অপপ্রচার চালানোর কোনো সুযোগ নেই।

মনে রাখবেন, ইসলাম নারীকে শাসন করে এবং যুল্‌ম অত্যাচারের মাধ্যমে তার হাত-পা ভেঙ্গে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে স্বামীকে কখনো উদ্বুদ্ধ করেনি। এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতা বোনদেরকে বলবো আপনার যালিম স্বামীর

এখন দুপুর চলছে, সূর্যকে তার ইচ্ছে মত তাপ ছড়িয়ে দিতে সুযোগ করে দিন। তাকেও আল্লাহ্ দেখে নেবেন, কারণ তারও তো সন্ধ্যা হবে। আর যালিম ও অত্যাচারী পুরুষকে বলবো, আপনার স্ত্রী শত অত্যাচারের পরও আপনার ঘরে থেকে যাওয়ার অর্থ এই যে, সে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখে না; বরং সে ক্ষমতা রাখার পরও ধৈর্য ধরে প্রতিশোধ নেয় না। তবে মনে রাখবেন তার চেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যক্তি আপনার জীবনে আর কেউ নেই। কারণ সে নিজের বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। আর এই ধৈর্যের মাধ্যমে সে আপনার মত যালিমের দুন্ইয়া ও আখেরাত বরবাদ করে দেয়।

তাই আমরা দেখতে পাই শারী'য়াত **'খোলা'**[৯২] নামক বিধানের মাধ্যমে অত্যাচারী ও অযোগ্য স্বামীকে ত্যাগ করার ব্যবস্থা করে নারীদেরকেও তাদের দাম্পত্য জীবনে পছন্দ অপছন্দ বাস্তবায়নের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। যা অন্য কোনো ধর্ম ও সমাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ ইসলামের শত্রুরা পবিত্র ক্বোরআনের নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾[৯৩]

'পুরুষ নারীর কর্তা। এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র হেফাযাত ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। আর যে সব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো তাদেরকে বুঝাও। শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে প্রহার কর। তারপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা

৯২- বিস্তারিত দেখুন, লেখকের বই 'ডিভোর্স'।

৯৩- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-৩৪

তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ ওপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ।'

ইসলাম বিরোধী শিবির যেভাবে ক্বোরআনের এই ধারণাটিকে উপস্থাপন করছে মূলতঃ সেভাবে ক্বোরআন বলেনি; বরং এখানে ক্বোরআন আরো বহু শর্ত জুড়ে দিয়েছে। তারপরও পশ্চিমাদের উচ্ছিষ্টভোগীরা উপরোক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করেই চলেছে। ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল ইচ্ছাকৃতভাবে মূল বক্তব্যকে এড়িয়ে গেছে। অথচ পুরুষ পরিবারের প্রধান হওয়ার কারণে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বের বোঝাও তার কাঁধে রাখা হয়েছে এ কথাটি তারা একবারও বলেনা। তাই স্ত্রী যদি তার কথার বাইরে চলতে চায় তাহলে পরিবারে বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এবং এসব কারণে আস্তে আস্তে কোনো এক সময় পারিবারিক বন্ধনও ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে ইসলাম স্ত্রীকে শাসন করার অধিকার দিয়েছে।

উমার (রা.) পুরো সতর্কতার সাথে এই বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। সব ক্ষেত্রে নারীর কাছে পরাজিত হওয়ার ধারণাকে তিনি পাল্টে দিয়েছেন। তবে জীবনের কোনো বাঁকেই তিনি নারীকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করেন নি। তাই আমরা দেখতে পাই, নারীরা কখনো জনগনের সামনেও ওমরকে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় করেনি, এবং উমার (রা.) তা শুনে কখনো তাদের উপর ক্ষেপেও যাননি; বরং তাদেরকে সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। তাঁর কথা কখনো কারো বুঝে না আসলে তারা তাঁকে মন্দও বলেছেন। এতেও উমার (রা.) কোনো নারীর প্রতি কখনো ক্ষিপ্ত হননি। অথচ এসব কিছুকে বিবেচনায় না এনে উক্ত বইয়ের লেখিকা ফাতেমা উমারের ব্যাপারে খুবই অগ্নিবিচ্ছুরণকারী নারী হিসেবে তার বইতে প্রকাশিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উমার (রা.) এর নিকট নারীর ইয্যাত ও সম্মানের একটি কথা আমার মনে পড়েছে। তিনি একবার তাঁর কিছু সঙ্গি সাথীদের সাথে এক পথ দিয়ে হেঁটে চলছিলেন। পথিমধ্যে **খাওলা বিনতে খুওয়াইলিদ** নামক একজন মহিলার সাথে দেখা হয়ে গেলো। যার খাতিরে আল্লাহ্ ক্বোরআনে **'যিহার'** এর বিধান নাযিল করেছেন। ঘটনাটি আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ **'তাফসীর ইবনে কাসীর'** এ এভাবে উল্লেখ করেছেন

'একবার খালীফাতুল মুসলেমীন উমার (রা.) কিছু লোকের সাথে একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সামনে একজন মহিলা এসে কিছু কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে উমার (রা.) তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। এটি দেখে কাফেলার কোনো একজন সঙ্গি বলে উঠলেন **ইয়া আমীরাল মু'মেনীন!** আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতগুলো লোককে আটকিয়ে রাখলেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে উমার (রা.) বললেনঃ তোমরা জান ইনি কে? ইনি হলেন সেই মহিলা, যার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। সুতরাং আমি কি করে তার কথা এড়িয়ে যেতে পারি? **আল্লাহ্র ক্বাসম!** তিনি যদি স্বেচ্ছায় সরে না যেতেন, তাহলে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার কথা শোনার জন্য এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।' [৯৪]

দেখলেন, ইসলামের ছায়াতলে নারীর সম্মান কত বেশী। খালীফাহ্তুল মুসলেমীনের দৃষ্টিতে নারী কত বড় মর্যাদাবান। তাই মনে রাখতে হবে, স্ত্রী শুধু সুন্দর হলে চলবে না। বিশ্বসুন্দরী না হয়ে শুধুমাত্র ইসলাম এবং শারী'য়াতে ইসলামকে মানলেই আপনার দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন। যেমনটি আমরা উপরের ঘটনার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। স্বামীর প্রতি নিজের জীবন উৎসর্গের কারণে স্বামী **'মা'** বলে ফেলার পরও তাকে ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি স্ত্রী; বরং আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এসম্পর্কে আসমানী বিধান নিয়ে এসেছেন। এটিই হলো ঈমান এবং এটিই হলো **তাক্বওয়া**। আর এমন নারীর সম্মান রক্ষার্থে উমার (রা.) বিশাল এক ইসলামী রাজ্যের শাসক হয়েও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনেছেন। ইসলামের আঙ্গিনায় নারীর এমন ইয্যাত ও সম্মান ফাতেমা ও তসলিমাদের চোখে পড়েনি, পড়েছে পশ্চিমাদের বানোয়াট কাহিনী।[৯৫]

অনুরূপভাবে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ভালভাবে না বুঝে অধ্যয়নের কারণে ফাতেমা তার বইতে ইসলামের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করেছে। জানিনা সে কার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কার ইশারায় ইসলামের বিরুদ্ধে এসব লিখেছে। শিক্ষকদের না পরিবেশের। তবে আমরা বলবো, যার প্রভাবেই সে প্রভাবিত হোক না কেন, ইসলামের সঠিক

৯৪- বিস্তারিত দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর

৯৫- বিস্তারিত দেখুন, লেখকের বই **'সংসার'** পৃষ্ঠা নং-৫৯

অধ্যয়ন করতে সে ব্যর্থ হয়েছে এটি সবার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আর যারা তার কথায় লাফালাফি করবে তারাও পথভ্রষ্ট।

ফাতেমারা যদি উক্ত সব হাদীস ও ক্বোরআনের আয়াত শানে নুযুল সহকারে অধ্যয়ন করে উমারের শাসনকে তখনকার পরিস্থিতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতো তা হলে তার ঈমান আরো মজবুত হতো। কোনো প্রভাবেই সে ইসলাম বিরোধী শক্তির মিথ্যা প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হতো না। যত মূল্যই দেয়া হোক না কেন, যত উষ্ণ প্রেম ভালোবাসাসহ নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার রঙ্গিন স্বপ্নই দেখানো হোক না কেন, এই ভাবে সে কখনো তার ঈমান বিক্রি করতো না; বরং ইসলামকে নারীদের জন্য রাহমাত হিসেবে মনে করতো। কোনো অবস্থাতেই ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে তার আবির্ভাব হতো না। এরূপ অসত্য ও কাল্পনিক ঘটনাবলী উল্লেখ করে ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা তো দূরের কথা কখনো সাহস ও করতো না।

দুঃখজনক হলেও সত্য, তারপরও সমাজের এক শ্রেণী শারঈ আইন বা শাস্তিকে বর্বর বলছে। অতঃপর আজ যারা আধুনিকতার স্রোতে ভাসতে গিয়ে সন্তান হারাচ্ছে হয়ত তাদের এখন বুঝে আসছে যে, সমাজে এধরণের অপরাধের রাস্তা বন্ধ করার জন্য শারী'য়াতের রজম বা পাথর মেরে অপরাধীর হত্যাই হলো উপযুক্ত শাস্তি। একজন অপরাধীকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গাড়িয়ে পাথর মেরে হত্যা করাই হলো তার সঠিক বিচার। প্রকাশ্যে এমন করা হলে অন্য অপরাধিরাও সতর্ক হয়ে যাবে। তাদের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে থাকবে। তখন কোন্ মায়ের সন্তান আছে, নারী ধর্ষণের সাহস নিয়ে কোনো নারীর উপর দিনের আলোতে তো দূর কী বাত, রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়েছে, সাউদী আরবের রাস্তায় গভীর রাতে সিগনালে এসে উভয় দিকে রাস্তা ফাঁকা থাকার পরও ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। আমি হেসে উঠে তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তো কেউ আপনাকে দেখছে না তাই গাড়ি থামিয়ে দিলেন কেন? সে উত্তরে জানালো হ্যাঁ, আমাকে মানুষের চোখ দেখছে না এটি সত্য, কিন্তু চারদিকের ক্যামেরা আমাকে খুব ভালো করেই দেখছে। আমি কি করছি

তা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে রেকর্ড করছে। অতঃপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি জানেন? সাউদী আরবে সিগন্যাল ভঙ্গ কারীর শাস্তি কি? আমি বললাম না। সে জানালো দুই হাজার সাতশ রিয়াল অর্থাৎ ৪৩,৮২৭ টাকা আমাকে জরিমানা দিতে হবে। বুঝলেন কেন থেমে গেলাম? তাই বলছিলাম, সমাজে নারী ধর্ষণের শাস্তি যদি এমন হয় তাহলে অতি সুন্দরী ও আকর্ষনীয় তরুণীরাও রাতের অন্ধকারে নিরাপদে ঘরে পৌছতে পারবে। হাজার ইচ্ছা ও খাহেশ লালন করার পরও এমন তরুণীরকে ধর্ষণ করা তো দূরের কথা তার প্রতি তাকানোর সাহস ও কখনো কারো হবে না।

এপ্রসঙ্গে এখানে একটি শোনা ঘটনা আমার মনে পড়েছে। সত্য-মিথ্যা বলতে না পারলেও দ্রুত বিচার পদ্ধতিটি আমাদের দেশের এ ধরনের অপরাধির বিচার পদ্ধতির সাথে তুলনা করার জন্য উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। বেজিং শহরের একটি এলাকায় একবার এক তরুণী ধর্ষিত হলো। ধর্ষণ শেষে ধর্ষক পালিয়ে গেল। এই খবরটি এলাকার চেয়ারম্যান মাউ এর কাছে পৌছলো। সংবাদ পেয়ে তিনি উক্ত মেয়েটির সাথে দেখা করতে আসলেন। এসে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: মা তুমি যখন আক্রান্ত হলে তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলে? মেয়েটি হ্যাঁ সুচক উত্তর দিল। চেয়ারম্যান তার মাথায় সহানুভূতির হাতটি রেখে জিজ্ঞেস করলেন: মা তুমি পুরো শক্তি দিয়ে তেমন চিৎকার আবার দিতে পারবে? মেয়েটি বললো হ্যাঁ পারবো।

অতঃপর আধা কিলোমিটারের মাধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহস্যদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে বললেন: তুমি চিৎকার দাও। মেয়েটি চিৎকার করলো। এরপর তাদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মেয়েটির চিৎকার শুনেছো? তারা সবাই জানালো হ্যাঁ আমরা শুনেছি। এটি শুনে তিনি আদেশ দিয়ে বললেন, এখানকার এক চুতুর্থাংশের সকল পুরুষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আস। ত্রিশ মিনিটিরে মধ্যে যদি ধর্ষক চিহ্নিত না হয় তাহলে সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে। সাথে সাথে অত্র এলাকার সকল পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হলো। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই ধর্ষক ধরা পড়লো। বিশ মিনিটের ব্যবধানে তাকে চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থিত করা হলো। এরপর মেয়েটিকে ডাকা হলো। সেও তাকে চিহ্নিত করলো। সাথে সাথে আদেশ জারি হলো এবং সবার সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো।

এটিই হলো ইনসাফ। এখন আমাদের দেশে ইনসাফ হওয়ার আগে বাদিকে দুনইয়া হতে চলে যেতে হয়।

আধুনিক যুগের নারীদের এটিও একটি দুর্ভাগ্য, ইসলামের সঠিক পয়গাম হতে বহু দূরে আজ তাদের অবস্থান। ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তারা নির্ভর করছে পশ্চিমাদের চার্জে আলোকিত উচ্ছিষ্টভোগীদের কলম হতে নির্গত তথ্য ও যা মডার্নিজমের স্রোতে ভেসে যাওয়া আঁটসাঁট পোশাকে বেশামাল শরীর দেখিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনো জীবন ও তাদের অর্থে প্রকাশিত সম্পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষী কোনো পরিকল্পনার উপর। যাদের কাঁধে ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল তারা নিজেরা আজ শুধু উক্ত দায়িত্ব ভুলে যায়নি; বরং যারা দা'ওয়াতী কাজ করছে সর্ব শক্তি দিয়ে তাদের বিরোধিতা করাকে এখন ইসলাম মনে করে বসেছে।

অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা রয়েছে তা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করার কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র নিজের 'আমল করাকেই যথেষ্ট মনে করছে। মুসলমানদের সিংহভাগ আজ পশ্চিমাদের চাকচিক্যে দিশেহারা। ইসলামের চিরন্তণ সত্যের উপর পশ্চিমাদের প্রপাগান্ডাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে শুধু তাই নয়; বরং তাদের বাত্লানো মত ও পথকে সঠিক ইসলাম মনে করছে। আর তাই ইসলামের রাজপথ ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমাদের অন্ধকার গলিতে হোঁচট খেয়ে পড়ছে। মযলুম মানব ও মৃত্যুমুখে পতিত মানবতাকে রক্ষায় এগিয়ে আসাতো দূরের কথা স্বয়ং নিজেদের ঘর-বাড়ী, পরিবার ও সমাজ যুল্ম অত্যাচারের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যালিম তার যুল্মের পরিণতি কী হতে পারে তা বুঝতেই পারছে না।

অথচ ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম ১৪৪০ বছর আগে নারী অধিকারের ধারণা মানব সমাজকে দান করেছে। তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকামী ও নারী অধিকার আদায়কারীদের তখন না ছিল কোনো সেন্টার, না ছিল কোনো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। না বুলন্দ হতো নারীবাদীদের কোনো স্লোগান, না বের করা হতো কোনো মানব র‍্যালী। আজ যারা নারী দিবস পালন করছে তারা শুধু নারী ভোগের রাস্তা অনুসন্ধানের জন্যই এসব দিবস উদযাপন করছে নারীদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নয়। তাই নারী দিবস

উদযাপনকারীদের সমাজেই আজ নারী সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও নির্যাতিত।

আপনি স্বীকার করুন বা না করুন সত্য কথা হলো, যারা নারী অধিকার নিয়ে শুধু সোচ্চার নয় দাবীও করছে যে, তাদের আঙ্গিনায় নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত। নারী সমান অধিকার ভোগ করে স্বর্গীয় সুখে আছে। সেখানে নারী শুধু ঘর হতে বের হয়ে আসেনি; বরং নিজের শরীরের সব কিছু দেখিয়ে যুব সমাজকে মাতিয়ে পাগল করে নারীর নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজের ইয্যাত নিজেই হারিয়ে চলেছে। এটি কারো কাল্পনিক দাবী নয়, এটিই বাস্তবতা। অতএব নারী যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে ক্রিকেট খেলে রাষ্ট্রের সম্মান বৃদ্ধি করছে সেখানের নারীর সমান অধিকারের অবস্থা নিম্নে পাঠকদের জন্য উদাহরণসহ তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি।

ভারতের নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ। সে যখন সর্ব প্রথম ক্রিকেট খেলতে শুরু করে তখন তার কোনো স্পন্সর ছিলো না। সম্প্রতি কিছু কিছু ম্যাচ খেলায় জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তার বেতন বাড়িয়েছে। বাইশ হাজার পাঁচশ ডলার হতে বাড়িয়ে সাতাত্তর হাজার ডলার করা হয়েছে। এখন সে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার। তারপরও ভারতের পুরুষ ক্রিকেটারদের বেতনের সাথে তার বেতনের আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েই গেলো। এই তফাৎ কমে আসা স্বপ্নের মত। সে 'সি গ্রেড' এর ক্রিকেটারদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বেতন পায়। তার মূল কারণ হলো নারীদের ম্যাচে দর্শক কম হয় এবং স্পন্সরশীপ বাবদ উল্লেখ যোগ্য অর্থ পাওয়া যায়। এখানেই শেষ নয়, ইংল্যান্ডের নারী ক্রিকেটারদের বেতন ভারতীয় নারী ক্রিকেটারদের চেয়েও কম। ইংল্যান্ডে একজন পুরুষ ক্রিকেটার যে আয় করে নারী ক্রিকেটারদের আয় তার চেয়ে ৩৮% কম। নারী এবং পুরুষের মাঝে বেতনের পার্থক্য অনেক বেশী।[৯৬]

উপরোক্ত রিপোর্টটি পড়ার পর পাঠকদেরকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে হলফ করে বলুন তো, ইসলামের আঙ্গিনায় ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সাজানো মানব জীবনের কোনো বাঁকে ও মোড়ে নারী-পুরুষের মাঝে এমন ব্যবধান দেখাতে পারবেন? ইসলাম কখনো নারীকে অবমূল্যায়ন করার কথা

৯৬- বিস্তারিত দেখুন, জাতীয় দৈনিক ১ মে ২০১৮

বলেছে? শারী'য়াত নারীর হক্ব নিয়ে কখনো কথা বলেনি শুধু পুরুষের হক্বের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এমন একটি চ্যাপ্টার কখনো আপনার চোখে পড়েছে?

আমি আল্লাহ্‌র কাস্‌ম খেয়ে বলতে পারবো সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া পর্যন্ত এমন কেউ দেখাতে পারবে না। কারণ যে জাতিকে বলা হয়েছে মায়ের প্রতি তাকালে সাওয়াব। বোনের জন্য খরচ করা উত্তম সাদাক্বাহ। কন্যার সঠিক লালন-পালনকারীর জান্নাতে রাসূলের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং নিজ স্ত্রীর প্রতি মুচকি হাসির সাথে তাকালে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন, অতএব যে জাতির জীবনে প্রতিদিন Women day উদযাপিত হচ্ছে, সেই জাতির আবার নতুন করে পশ্চিমাদের সাথে তাল মিলিয়ে Women day পালনের মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কি দরকার? যে পুরুষের কাছে নারীর এমন ইয্‌যাত সেই পুরুষের (স্বামী) হক্বও নিজ স্ত্রীর উপর রয়েছে বলে স্ত্রীকে স্বামীর চাহিদা মত তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أعظمُ الناسِ حقاً على المرأةِ زوجُها وأعظمُ الناسِ حقاً على الرجلِ أُمُّهُ) [৯৭]

'আয়েশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন: নারীর ওপর সবচেয়ে বেশী অধিকার হলো তার স্বামীর। আর পুরুষের ওপর সবচেয়ে বড় হক্ব বা অধিকার হলো তার মায়ের।'

ইসলাম এভাবে নারীর সব দায় দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দিয়ে তাকে চিন্তামুক্ত করেছে। আখেরাতেও তার হিসাব নিকাশ পুরুষের মতই হবে বলে আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে বলেছে। পুরস্কার ও তিরষ্কার আখেরাতে আল্লাহ্‌র একক ট্রাইব্যুনালে উভয়ের সমান সমান হবে বলেও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। এখানে কোনো ব্যবধান থাকবে না বলে নারী-পুরুষ উভয়কে সতর্ক করা হয়েছে। যার যার কর্মের পরিপূর্ণ বিনিময় তার তার আমল নামায় দেয়া হবে বলে সু-সংবাদ শুনানো হয়েছে। সবার আমল

---

[৯৭] - حديثٌ صحيحٌ صحّحهُ الحاكمُ وغيرهُ

অনুযায়ী জান্নাত হবে বলেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরও বলবেন ইসলাম নারীকে বঞ্চিত করেছে?

অন্যদিকে যারা সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে সারাক্ষণ চেঁচামেচি করে তাদের নিজেদের আঙ্গিনায় নিজেরাই নারীকে অবমূল্যায়ন করে সেই নারীকেই আবার বেকুফ বানিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে। বিনিময়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের হোতাদের ঝান্ডা তলে প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে নারীর সর্বস্ব লুণ্ঠন হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বাজার তাদের অঙ্গনে আজ সরগরম। নারী তা টের পেয়েও না পাওয়ার ভান করে বসে আছে। নারীকে সবাই মিলে সমান তালে শিক্ষাঙ্গনে ভোগ করার জন্য Co-education এর রাস্তা দেখাচ্ছে। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রেও Co-warking এর ব্যবস্থা করে তাদেরকেও বাগে আনার পুরো বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু নারী বুঝতে পারছে না যে, এই দর্শনে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশী। নারীকে তারা সর্বস্তরে সমান অধিকার দেয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে আর নারীও ঘুম আসার আগেই দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তবে তারা একবারও ভাবছেনা যে, কিসের বিনিময়ে তাদেরকে সমান অধিকার দেয়া হবে? এই কথাটি একটি বারের জন্যও ভাবার প্রয়োজন মনে করছে না। এই সম্পর্কে ফাতেমা ও তসলিমারা বুঝতে পারলেও না বোঝার ভান করছে।

অন্যদিকে ইসলাম নিঃশর্তে নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক মর্যাদা দিয়ে মানব সমাজের একটি Active Pillar হিসেবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই নারীকে তাদের সঠিক নিরাপত্তা ও আসল স্বার্থ কোথায় রক্ষা হচ্ছে, ভাল করে জানার জন্য ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ফাতেমা আর তসলিমাদের মত ইসলাম সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করলে পশ্চিমাদের ঝড় তুফানের সামনে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়ানোর চেয়ে নিজের সহায় সম্বল যা আছে তা নিয়ে ভেসে যেতে হবে। প্রতিরোধ বা প্রতিশোধ তো বহু দূরের কথা, ঈমানও হারাতে হবে।

নারী স্বাধীনতার দাবীদাররা নারীকে পুরুষের গোলামী হতে মুক্তি দিয়ে সমাজে সম্মান দেয়া তাদের মূল উদ্দেশ্য দাবী করলেও কিন্তু বাস্তবে তারা

প্রতিনিয়ত নারীকে অপমান অপদস্থ যেমন করছে তেমনিভাবে নারী ভোগের নতুন নতুন রাস্তাও আবিষ্কার করে চলেছে। এরাই আবার ফেসবুকে মায়ের যত সম্মান ও ইয্যাত দেখায় তার ১০% ও যদি বাস্তবে দেয়া হতো তাহলে জাহান্নাম বিরাণ এবং শায়ত্বান হয়রান হয়ে যেতো। পশ্চিমা দুন্ইয়ায় যারা নারী স্বাধীনতা নিয়ে বেশী হৈ চৈ করে সেখানে নারীদের সামাজিক অবস্থান খুবই নাযুক। যাদের ওকালতি করে আমাদের তসলিমা ও ফাতেমারা ইসলাম ও নাবী মুহাম্মাদ (স.) এর বিরুদ্ধে নিরলসভাবে লিখে চলেছে তাদের সমাজে নারীর অবস্থান ও Position এর যে চিত্র ভেসে ওঠে তা নিম্নরূপ:

১. আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ নারী পরিবারের পুরুষ অথবা তাদের Boy Friend এর হাতে মার খায়। কিন্তু মাত্র ৫৭২০০ জন নারী প্রশাসনের নিকট অভিযোগ করে। এর মধ্যে ১৭০০০ নারী গুরুতরভাবে আহত হয় এবং ১৪০০ নারী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে পরিশেষে দুন্ইয়ার মায়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

২. ১৯৯৯ সালে প্রায় ৯ লক্ষ নারী ও তরুণী ধর্ষিত হয়েছে। তাদের অধিকাংশ নিকটাত্মীয়দের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যাদের বয়স ১৫/১৭ বছর। আরো ভয়ানক এবং লজ্জাজনক তথ্য হলো, অনেকে আপন ভাই অথবা আপন পিতার দ্বারাও ধর্ষিত হয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর ধর্ষণের উদ্দেশ্যে প্রায় ২৪ লক্ষ নারী ও তরুণীর উপর আক্রমণ হচ্ছে তথাকথিত সভ্যতার পতাকাবাহী আমেরিকায়। আর উভয়ের সম্মতিতে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতো পশ্চিমা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এসব অবৈধ সম্পর্কের হিসাব তো কেউ দিতে পারবে না। তসলিমার মত যদি নিজের জীবনে সংঘটিত ধর্ষণ কাহিনী নিয়ে সবাই বই লেখে অথবা কে কোথায় কীভাবে এই ঘৃণ্য কাজটি সম্পন্ন করেছে তা প্রকাশ করার জন্য তসলিমারা ঠিকাদারী নেয়, তাহলে পৃথিবী এই তথ্যও পেয়ে যাবে একদিন।

৩. আমেরিকায় প্রতি বছর ১৫ লক্ষ বৈধ বিয়ের মধ্যে ৩ লক্ষ বিয়ে প্রথম তিন মাসের মধ্যে ত্বালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটছে।

৪. আমেরিকায় ৭৫% স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বামী যেমন অন্য নারীর মধু আহরণে ব্যস্ত থাকে, স্ত্রীও অন্য পুরুষের শয্যা

সঙ্গিনী হয়ে তার মনোরঞ্জনে তেমন রাত কাটায়। তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তো বলেই দিয়েছে পরকীয়া কোনো অপরাধ নয়। নারী-পুরুষ নিজেদের ইচ্ছে মত যৌন ক্ষুধা মেটাতে পারবে। এখানে কারো কিছু বলার ও করার সুযোগ নেই।

৫. আমেরিকায় ৬৫% সন্তান অবৈধভাবে জন্ম নেয়ার কারণে পিতৃ পরিচয় হতে বঞ্চিত। এখন আমেরিকান সোসাইটিতে তাদের জীবন না ঘরকা না ঘাটকা। অর্থাৎ এ কুল ঐ কুল কোনো কুলই নেই তাদের।

৬. আমেরিকার প্রায় ২ কোটি নর-নারী সমকামিতার অভিশাপে অভিশপ্ত। তবুও কোথায় যেন তাদের তৃষ্ণা রয়েই গেছে। তরুণীদের প্রাইভেসী বলতে কিছুই নেই সবই তারা জেনে নিয়েছে। তারপরও তারা অতৃপ্ত থাকার কারণে এখন কোমলমতি সোনামনিদের কাছেও নারীদের সকল তথ্য পাচার করার জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করে বিশ্ববাসীকে Sexual Education এর সবক দিতে শুরু করেছে। যার প্রভাব ৯০% মুসলমানের দেশ আমাদের বাংলাদেশেও পড়েছে। তাই স্কুলের বইতে পাঠ্য করে এসব আবর্জনা শেখানো হচ্ছে।

অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে এটি কোনো শিক্ষা নয়, এটি একটি কু-শিক্ষা। Sexual Education হলো পশ্চিমাদের শেখানো বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের আরেক ঘৃণ্য রূপ। যার অর্থ হলো Freedom of Sex. এই শিক্ষা লাভ করতে এসে Co-education এর মাধ্যমে তার বাস্তব রূপ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশ্যে নিজেদের যৌন উত্তেজনা নিরসনের ব্যবস্থা করছে মাত্র। তাছাড়া পশ্চিমাদের বাত্‌লানো মতে আমাদের শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ের কোমলমতি শিশুদেরকেও এই শিক্ষা দিয়ে তাদের কোমলমনা জীবনকে অনর্থক করে ফেলার পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আজ পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম দেশের সরকারকে সাহায্য দেয়ার নামে ব্যবহার করে উম্মাহ্‌র আগামী প্রজন্মের চরিত্র ধ্বংসের আরেক নতুন ফাঁদ পেতে বসেছে। তাই তারা এ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নামে শিশুদের নিষ্পাপ চরিত্রকে ধ্বংস করার মহা এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বয়স ও সময়ের পূর্বে এসব কোনো শিক্ষা নয়, এসব পাপাচার। আমরা মনে করি শিক্ষার নামে শিশুদের অন্তরে এমন কিছু

কথা ও চাহিদা পূরণের বীজ বপন করে তাদের মন মানসিকতাকে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। আর তাই কোমলমতি শিশুদের মনে এমন ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার কারণে সহপাঠিদের সাথে শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে তা পূরণ করার জন্য পড়া-শোনা বাদ দিয়ে উদগ্রীব হতে থাকে। আর সেটি করতে না পারলে নেশা করে মনের চাহিদা মেটায়। এভাবে তাদের শিশুত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের এই সম্পর্কে কিছু সমীক্ষা পর্যালোচনা করলে পাঠকদের কাছে আমাদের এই দাবীর যথার্থতা ও সত্যতা প্রমাণিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমেরিকায় প্রতি বছর দশ লক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্কা তরুণী অবৈধভাবে গর্ভধারণ করছে। যার অর্থ ফি দিন সেখানে তিন হাজার তরুণী গর্ভবতি হচ্ছে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্কা তরুণী অবৈধ গর্ভধারণ করে সন্তান প্রসব করার দায়িত্বও নেয়। অবশিষ্টরা Abortion বা অবৈধ গর্ভপাত করে ফেলে। ১৯৫০ সালে আমেরিকায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা তরুণী মায়ের সংখ্যা ছিল ১৩% কিন্তু ১৯৮৫ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯%। আজকের তথ্য আমাদের হাতে না আসলেও এর চেয়ে অনেক বেশী হবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমেরিকায় কোমলমতি শিশুদের মাঝে Sexual Education এর নামে পাপাচার ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রতি বছর দুই মিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে। এর পরিণামে সমাজের কলঙ্ক অপ্রাপ্ত বয়স্কা তরুণী মায়েদের জন্য ফি বছর আট মিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে। যৌনশিক্ষার পরিণতিতে নিয়মিত Dating ও তরুণ-তরুণীদের অবৈধ সম্পর্কের কারণে বিবাহ না হওয়ার দুঃখ ও ক্ষোভে আজকের তরুণ-তরুণীরা এক ভয়ানক যৌন তাড়নায় নেশাগ্রস্থ হয়ে আমেরিকান সমাজের ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। তাই পশ্চিমা সমাজের Ultra Modern তরুণ-তরুণীরা আজ অ্যালকোহল, আফিম, গাঁজা, মদ ও হেরোইনসহ আরো কত কি নেশা জাতীয় দ্রব্যের স্রোতে ভাসছে তা শুধু তাদের মা-বাবারাই জানে। তাই সেখানকার স্কুলগুলো তাদের Prospectus এ অভিভাবকদের তাদের স্কুলে সন্তান ভর্তি করানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে এভাবে প্রশ্ন করেছে:

Why would you choose this school ?
because it is Drug free.

এই ধরণের বক্তব্য লিখে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করছে। উপরোক্ত অসভ্য শিক্ষার কারণে আমেরিকায় প্রতি বছর কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ তরুণী তাদের সহপাঠির যৌন আক্রমণের শিকারে পরিণত হচ্ছে। পশ্চিমা জগত এহেন অপমানের জীবন হতে তাদের নারী সমাজকে উদ্ধারের পরিবর্তে সমগ্র পৃথিবীর বিশেষ করে আরববিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের নারীদেরকেও একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই তারা তথাকথিত মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবীদেরকে Fuel & Charge দিয়ে ইসলাম ও শারী'য়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলেছে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইউরোপের নারীরা, যারা ঈমানের মূল্য বুঝতে পেরেছে তারা আজ পর্দায় থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। আর মুসলিম দেশের নারীরা বে-পর্দা হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য আন্দোলন করছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র নারীদের এহেন অধঃপতন কখনো কাম্য ছিলো না। অতএব এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে তাদের উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিংএ নারী অধিকার সম্মেলন এবং ১৯৯৬ সালে মিশরের কায়রোতে World Population Conference করে যে সব দাবী করা হয়েছিলো তা হলো নিম্নরূপ:

১. সমগ্র বিশ্বের নারীকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

২. নারীকে গর্ভপাতের স্বাধীনতা দিতে হবে।

৩. নারীকে নারীর সাথে সমকামিতাসহ নারী নারীকে বিবাহের অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ণ করতে হবে।

৪. বিবাহ ছাড়াই পুরো পৃথিবীতে নারীকে উন্মুক্ত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা দিতে হবে।

উপরোক্ত আবদারগুলো পূরণ করে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নৈরাজ্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীকে উলঙ্গ করে তাদের শরীরের উঁচু নীচু সব প্রদর্শনই তাদের একমাত্র ইচ্ছা। আর তাই পাপাচারের স্রোতে মানব সভ্যতাকে ভাসিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিশ্বের সর্বত্র তারা International Beauty Contest এর আয়োজন করার ব্যবস্থা করে চলছে। লজ্জার কথা হলো, এখানে যারা আসবে এবং শিরোপা জিততে চাইবে তাদেরকে বিভিন্ন ইভেন্টে অশালীন কাপড়ে নিজ বেশামাল শরীরের মাপ দিতে হবে। অর্থাৎ

তাদের স্তন হতে হবে ৩৬ ইঞ্চি। কোমর হতে হবে ২৬ ইঞ্চি। নিতম্ব হতে হবে ৩৬ ইঞ্চি।

আরো আশ্চর্যের কথা হলো, এই মাপ নেবে একজন পুরুষ। এরাই নাকি আবার সভ্য। বিচারক হতে শুরু করে দর্শক পর্যন্ত মোটামুটি সবই পুরুষ। সবার সামনে নেংটা হয়ে একটি মেয়েকে হাঁটতে হবে। আর সবাই তার শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গের প্রতি তৃষ্ণার্ত কাকের মত চেয়ে থাকবে। অনেকে হয়ত তরলে গরলে কাপড়ও ভিজিয়ে ফেলবে। এমন নিয়ম পুরুষরাই করেছে। কোনো নারী করেনি। অতএব এখানে কেউ নিজেকে পুরুষ মনে করলে ফেরেশ্‌তা চরিত্রের দাবী করার কোনো সুযোগ নেই। যারা এখানেই উপস্থিত থাকে তারা দুশ্চরিত্রের। এটি বলার জন্য আর কিতাব দেখতে হবে না।

কারণ একটি যুবতী ব্রা-প্যান্টি পরে উলঙ্গ ও অর্ধালুঙ্গ হয়ে পোজ দেবে আর উপস্থিত ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ দাবী করার পরও তার শরীর শিহরিত হবে না এ কথা শায়তানও বিশ্বাস করবে না। অতএব এরা প্রতারক না হয়ে কে হবে? তবে দুঃখের বিষয় হলো, পশ্চিমা জগতের নারী সমাজের এহেন করুণ অবস্থা হতে আমাদের মুসলিম সমাজের শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে উল্টো মুসলিম নামধারী তসলিমা ও ফাতেমারাও তাদের এই জালে আটকা পড়ে নিজেদের সর্বস্ব লুণ্ঠনের ব্যবস্থা নিজেরাই করছে শুধু তাই নয়; বরং এটিকেই জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মনে করে নিরলসভাবে ইসলামকে গাল মন্দ দিয়ে চলেছে।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশ বাংলাদেশেও তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকামীরা ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির পক্ষ হতে পাওয়া উচ্ছিষ্টকে হালাল করার জন্য প্রতি বছর সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে। এই প্রতিযোগিতা প্রকাশ্যে না করতে পারলেও হোটেলের আলো আঁধারে করা হচ্ছে। আর আমাদের মুসলিম তরুণীরা তাদের শরীরের সৌন্দর্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে পুরুষ বিচারকদের দৃষ্টিতে মিস বাংলাদেশ হয়ে শিরোপা লাভ করছে। ভারতের তরুণীরা তো গত কয়েক বছর যাবত **হাসিনায়ে আলম** এবং **হাসিনায়ে কায়েনাত** এর উপাধীতে ভূষিত হয়ে আসছে। যার কারণে আমাদের মুসলিম তরুণীদের মাথায়ও আজ এই রোগ বাসা বেঁধে বসেছে।

পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণের কারণে মুসলিম দেশ ও মুসলিম সমাজের নারীরা নিজেদের ঈমান নিয়ে গর্ব করে সম্মানের সাথে সমাজে অবস্থানের নি'য়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে আজ তারাও হীনমন্যতায় ভুগে **হাসীনায়ে আলম** হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

এ কারণেই মূলতঃ আমাদের তসলিমা ও ফাতেমাদের উত্থান। ঢাকার শাহবাগের নাস্তিকরাও একই হারের বিচ্ছিন্ন কড়ি বললে ভুল হবে না। পশ্চিমাদের অনুকরণ ও তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার তাগিদেই আমাদের সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও নারীবাদীদের আজ আবির্ভাব ঘটেছে। অথচ তারা একবারও ভেবে দেখে না যে, এমন সমাজে নারীর মর্যাদা কীভাবে বৃদ্ধি পাবে, যে সমাজে ঝগড়া লাগলেই মা-বোনকে গালী দিয়ে নিজের মনের ঝাল মেটায়। তাদের শেখানো পথেই তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে তরুণীদের উপর। অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থে ব্যর্থ হলেই একদিকে আজকের আধুনিক নারী এসব যৌনসন্ত্রাসীদের এ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র গযব Aids এর মত মরণব্যাধিতেও বিশ্বব্যাপী আক্রান্ত হচ্ছে।

নীচের সমীক্ষাটি বিবেচনায় নিলেই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থান পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা যাবে তাদের সমাজও আজ পশ্চিমা সমাজ হতে কোনো ভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। প্রমাণিত হবে ইসলামেই নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। অন্য সব ধর্ম শুধু নারী ভোগের রাস্তা উন্মুক্ত করেছে তাই নয়, তাদের উপসনালয়গুলোতেও নারী ভোগের উৎসব চলছে। এটি কারো বানানো মিথ্যা কাহিনী নয়। সম্প্রতি ভারতের কেরালার একটি মার্চের পাঁচজন খ্রিষ্টান পাদ্রী গ্রেপ্তার হয়েছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এঘটনাটি প্রকাশ করেছে।[৯৮]

আর হিন্দুদের মন্দিরে নারী ভোগের কাহিনীতো সবার জানা। পুরো ভারতে প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটেই চলছে। ভারতের মন্দিরের পূজারী বা সন্ন্যাসীদের কেউ জেলে আছে, আর কেউ এখনো পুরোদমে মন্দিরে শত শত নারী রেখে নিজের জৈব চাহিদা পূরণ করেই চলছে। অনেকের ক্ষেত্রে

৯৮- বিস্তারিত দেখুন জাতীয় দৈনিক ২৬ জুন ২০১৮

ধর্মীয়ভাবে এটি স্বীকৃতও বটে। অবিশ্বাস হলে নীচের রিপোর্টটি পড়ে দেখুন। বুঝতে পারবেন হিন্দুদের মন্দিরে কী হচ্ছে।

'সম্প্রতি কর্ণাটক রাজ্যের দেবনগর জেলার উত্তরঙ্গমালা দুর্গা মন্দিরে রাতের বেলায় নারীদের দেবতার নামে উৎসর্গ করার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন এক বেঞ্চ রাজ্যের মূখ্যসচিবকে ঐ অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এটি মূলতঃ নারীদের যৌনশোষণ। যা ১৯৮৮ সালে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোর্ট আশা করেছিলো নারীদের যৌনশোষণ বন্ধ হবে কিন্তু তা হয়নি। এখনো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, মহারাষ্ট্রে, ওড়িষায় এবং গুজরাটে দেবতাকে উৎসর্গ করার নামে দেবদাসীদের প্রধানত দেহভোগের কাজে ব্যবহার করা হয়। উৎসর্গের পর তাদের পরিচয় হয় দেবদাসী। কোনো অঞ্চলে তাদেরকে যোগিনীও বলা হয়।

প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন এই প্রথা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এর পেছনে আছে চরম দারিদ্র, জাতিভেদ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। গরিব ঘরের মা-বাবা তাদের কুমারী মেয়েকে রজঃস্রাব হওয়ার আগেই মন্দিরে নিয়ে আসে। এখানে প্রথমে নিলাম করা হয়। তারপর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত উৎসর্গ করার নামে বিগ্রহের সঙ্গে কুমারী মেয়েদের তথাকথিত বিয়ে দেয়। আর তাই অন্য কোনো পুরুষ ঐ মেয়েটির স্বামী হতে পারে না। সারা জীবন খাওয়া-পরার বিনিময়ে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থেকে শুরু করে মন্দিরের সব পুরুষের যৌন লালসার শিকারে পরিণত হয়। আবার কখনো কখনো উচ্চ বর্গীয় ধনীদের রক্ষিতার ভূমিকা পালন করতে হয়। তাদের ওপর ধর্মীয় প্রভাব খাটিয়ে বেশ্যাবৃত্তিকে দেয়া হয় ধর্মীয় সীলমোহর। উৎসর্গের পর দেবদাসীকে ভোগ করার প্রথম অধিকার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের।

এমন ধর্মীয় প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে নানা কাহিনী, বিতর্ক ও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। গুজরাটে প্রায় চার হাজার মন্দিরে প্রায় ২০ হাজার দেবদাসী ছিলো। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার এবং ইউ এন ঘোষালের মতে মধ্যযুগে গরিব ঘরের নীচু জাতের মেয়েদের শোষণের উৎস ছিলো এই দেবদাসী সম্প্রদায়। অনেকের মতে ভারতে দেবদাসী

প্রথার প্রচলন শুরু হয় ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। বৌদ্ধমঠগুলির বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দু মন্দিরের দেবদাসী হয়ে ওঠে। আর তাই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র যেমন জাতক, কৌটিল্য কিংবা বাৎসায়নের কামশাস্ত্রে দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রবিদ যোগাশঙ্কর এই প্রথার বিবর্তনের প্রধান যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরবলির বিকল্প, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বাড়ানো, প্রাচীন দ্রাবিড় ধর্মসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে লিঙ্গ উপাসনা, অতিথিদের আপ্যায়নের অঙ্গ হিসেবে পুরুষ অতিথির যৌনসুখ চরিতার্থ করা এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মতো উঁচু জাতের লোকদের দ্বারা নীচুজাতের শোষণ ইত্যাদি।'[৯৯]

দেবদাসী প্রথাটি হিন্দু ধর্মের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যুগের পরিবর্তনেও এই প্রথাটির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যদিও হিন্দুদের কেউ কেউ এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। এই প্রতিবাদী গ্রুপটি সম্প্রতি দেবদাসী প্রথার আরেক নাম **'ধর্মীয় যৌনব্যবসা'** বলে মিডিয়ায় এর বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা শুরু করেছে। তাদের সেই প্রচারণাটি সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরা না হলে আমার বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত মনে করার সুযোগ থেকেই যেতে পারে। তাই প্রতিবাদের একটি লেখার কিছু অংশ পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে তুলে ধরছি।

'মানব সভ্যতার আদি ব্যবসা বলা হবে, আর আদি সাহিত্যে তার উল্লেখ থাকবে না, তাও কি কখনও হয়! আর সাহিত্য যদি সমাজের প্রতিফলন হয়, তবে ধরেই নিতে হয় ঋক বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজে বহাল তবিয়তে ছিলো আদি জীবিকা, দেহ ব্যবসা। অবশ্য আর্যরা আসার আগে দ্রাবিড় সভ্যতাতেও ছিলো যৌন ব্যবসা। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো এবং অন্য অংশে নৃত্যরত নারীমূর্তি মিলেছে। সেগুলোকে নর্তকী বা রূপভেদে গণিকা বলেই মনে করেন পুরাতত্ত্ববিদরা। আসলে, সভ্যতার ভোর থেকেই আছে যৌন ব্যবসা। শুধু যুগে যগে বদলেছে এর নাম। আর্যদের মধ্যে

৯৯- বিস্তারিত পড়ুন: www.dw.com ভারতের প্রাচীন দেবদাসী প্রথা এক জাতীয় লজ্জা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নতুন দিল্লি, ২৩.০২. ২০১৪

'গণিকা' তো রীতিমতো মর্যাদার উপহার। যুদ্ধজয়ের স্মারক বা অনেক সময় মিত্রতার স্বাক্ষর স্বরূপ উপহার দেয়া হতো গণিকাদের। এমন কী শত্রুদের বিনাশ করার জন্য যে 'বিষকন্যা'র কনসেপ্ট, সেও তো দেহব্যবসারই নামান্তর।

রামায়ণে বলা হয়েছে, 'গণিকা' হলেন রাজসভার বিনোদনের জন্য। আর 'রূপোজীবী' রা মনোরঞ্জন করবেন সৈন্যবাহিনীর। মহাভারতে তো অপ্সরা-গণিকা মিলিয়ে মোট ৪২ জনের নাম পাওয়া যায়। বাৎসায়নের 'কামসূত্র' তে যে দেহজীবীদের উল্লেখ থাকবে সে তো বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-তেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে দেহব্যবসা। গণিকাদের জীবন কীরকম হবে, তা নিয়ে তো বিষ্ণুশর্মা বলেই দিয়েছেন। পাশাপাশি গণিকালয়ে যারা যায় তাদের জন্যও রয়েছে 'কোড অফ কন্ডাক্ট'। মূলতঃ দেহকে মূলধন করলেও প্রাচীনকালে দেহ ব্যবসার অনেক রূপ ছিলো। কারণ সেখানেও ছিলো শ্রেণিবিভাগ। ছিলো স্ট্যাটাস। যেহেতু দেবরাজ উন্দ্রের সভায় নাচ-গান করতেন, দেবতাদের মনোরঞ্জন করতেন, সেহেতু রম্ভা, উর্বশী, মেনকা বা তিলোত্তমাকে কেউ পাতি 'গীনকা' বা যৌনকর্মী বলবে না।

ঠিক সেভাবেই, মন্দিরে নাচ-গান করলে তাঁদের বলা হবে 'দেবদাসী' যতই তাদের পুরোহিতরা ভোগ করুক না কেন। পুরাণে বলে, ঋষি জমদগ্নি পুত্র পরশুরামকে আদেশ দেন তাঁর জন্মদাত্রীর মুন্ডচ্ছেদ করতে। পিতার আদেশ পালন করেন পরশুরাম। পরিবর্তে বাবার কাছ থেকে তিনটি বর পান। তার একটা কাজে লাগিয়ে মা রেণুকার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন পুত্র পরশুরাম। কিন্তু সমস্যা হয় রেণুকার কাটা মাথা নিয়ে। সেটি কোথায় গড়িয়ে গিয়েছিলো সন্ধান মেলেনি। শেষে এক নিম্নবর্ণের নারী উয়েল্লাম্মার মাথা এনে বসানো হলো রেণুকার দেহে। এর ফলে এক নিম্নবর্ণের নারীর উত্তরণ হল। এবং এভাবেই সমাজে এলো নতুন ধারা। নিম্নবর্ণের নারীর উচ্চবর্ণে উত্তরণ। সেটা কীভাবে? না, দেবতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। দেবতার দাসী হয়ে।

দক্ষিণ ভারতে 'দেবদাসী' হলেও উত্তরভারতে এই রীতির নাম 'মুখি'। প্রথার জন্মের আদিপর্বে দেবদাসীদের স্থান ছিলো অত্যন্ত সম্মানের। অর্থ,

জমি তো ছিলোই। তারা ছিলেন মন্দিরের অচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের নাচ-গান ছাড়া অসম্পূর্ণ ছিল দেবতার আরাধনা। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেরা মেয়েদের উৎসর্গ করতেন দেবদাসী হওয়ার জন্য। বয়ঃসন্ধির আগেই করা হত উৎসর্গ। তারপর দেবদাসী হয়ে পারফর্ম করার জন্য নিতে হত নাচ-গানের কঠোর প্রশিক্ষণ। কন্যা উৎসর্গ করার রীতি দক্ষিণভারতে 'মুট্টুকাট্টুভাড়ু' এবং 'দেভারিগে বিদুভাদু' নামে পরিচিত। 'মুট্টুকাট্টুভাড়ু' মানে দেবতার সঙ্গে বিয়ে। এবং 'দেভারিগে বিদুভাদু' এর অর্থ নিজেকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা। একবার উৎসর্গ হয়ে গেলে সেই মেয়েরা আর ফিরতে পারতো না স্বাভাবিক সমাজে। তাদের আর বিয়ে হতো না।

কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের জায়গা থেকে চ্যুতি হল এই প্রথার। অবক্ষয় গ্রাস করল পুরোহিতকে। বোঝা গেল, পাথরের বিগ্রহকে উপেক্ষা করে মানুষই ভোগ করতে পারে 'দেবদাসীকে'। তখন আর উৎসর্গ টর্গ নয়। লুঠ করে আনা হত মেয়েদের। এমন কি, ব্যক্তিগতভাবে মেয়ে কেনাবেচাও হতো। এই অবক্ষয়ের হাত ধরেই দেবদাসীদের মধ্যে চলে এলো রূপভেদ, শ্রেণি বিভাগ। যাকে উৎসর্গ করা হয়, তিনি 'দত্তা'। লুঠ করে আনা হলে তিনি 'হৃতা। কেনা-বেচা করা হলে সেই কন্যা 'বিক্রেতা'। কেউ নিজেই নিজেকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করলে তিনি 'ভক্ত দেবদাসী'। অলঙ্কারসহ কাউকে উৎসর্গ করা হলে তিনি 'সালঙ্কারা'। যদি কেউ দেবদাসী হয়ে নিয়মিত পারিশ্রমিক পান, তিনি 'গোপীকা' বা 'রুদ্রাঙ্গিকা'।

নাম যা-ই হোক না কেন, কাজ এবং পরিণতি একই ছিল। পরিবার-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন্দিরের অন্ধকারে দেবদাসীদের অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হত। মন্দিরের মূল পুরোহিত (তাঁর মাধ্যমে নাকি দেবতা!) ভোগ করতেন দেবদাসীদের। যতদিন যৌবন, ততদিন ছিল এদের কদর। তারপর রক্তমাংসের বোঝা ছাড়া আর কিছু না। কথিত, উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির ছিল দেবদাসী প্রথার পথিকৃৎ। সেইসঙ্গে কর্ণাটকের সূর্য মন্দির, দক্ষিণ ভারতের অন্য মন্দিরসহ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে শিকড় বিস্তার করে এই প্রথা। যা ধর্মের দোহাই দিয়ে দেহ বা যৌন-ব্যবসারই আর এক রূপ। বৃটিশ শাসনে, আরো অনেক কু-সংস্কারের মতো দেবদাসী প্রথার উপরেও নেমে আসে আইনী খড়্গ।

সেটা ১৯৪৩। অভিযোগ, তার পরেও নাকি বহু মন্দিরে লুকিয়ে লুকিয়ে চলছে এই 'রিলিজিয়াস প্রস্টিটিউশন'। ধূপ-ধুনো-কর্পূর-ফুলের মালার গন্ধ ভরা মন্দিরের ভারী বাতাসে মিশে গেছে হতভাগ্য দেবদাসীদের দীর্ঘশ্বাস। শাঁখ-কাঁসর-ঘন্টার শব্দে কোথাও চাপা পড়ে গেছে তাঁদের কান্নার আওয়াজ।'[১০০]

তাই বলছিলাম, যেখানে ধর্মের এবং ধর্মীয়গুরুদের এই অবস্থা, সেখানে সাধারণ যুবক এবং সমাজের কী অবস্থা হতে পারে, তা খুব সহজেই অনুমেয়। তারপরও নিজের মতামত পাঠকদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে সেখানকার পত্র-পত্রিকার একটি রিপোর্ট তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। ভারতের রাজধানী দিল্লি হতে প্রকাশিত হিন্দী মাসিক পত্রিকা "কান্তি" জানুয়ারী ২০০৩ সালে এসম্পর্কে এক জরিপ চালিয়েছিলো। পত্রিকাটির সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০০ সালে ভারতে ১,৪১,৩৭৩ টি ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ পুলিশের কাছে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। তবে ঘটনা ঘটেছে আরো কয়েকগুণ বেশী। ভিকটিমরা সমাজের ভয়, পারিবারিক মর্যাদা, অপমান ও লাঞ্ছনা গঞ্জনা এবং আগামীতে বিয়ে হওয়ার আশায় চোরের কিল মতনে খাওয়ার মত গোপনে সহ্য করে অভিযোগ করেনি।

উল্লেখিত ঘটনার মধ্যে ১৬,৪৯৬ টি ধর্ষণের আর ৩২,৯৪০ টি ছিল উত্যক্ত করার ঘটনা। ৫০০ টি ধর্ষণের নায়ক ছিল অতি নিকটাত্মীয় যাদের মধ্যে আপন ভাইয়ের হাতে বোন ও পিতার হাতে কন্যা তার সম্ভ্রম হারিয়েছে। ৩% নিকটাত্মীয় ৩০% প্রতিবেশী ৫১% পরিচিত ১৬% অপরিচিত পুরুষদের হাতে ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষিতাদের প্রায় ৩৩% এর বয়স ১৫-১৭ বছর। ভারতের গ্রামগুলোতে ৪৭% মেয়ের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিহারে বাল্য বিবাহের হার সর্বোচ্চ ৬৯%. এরাই আবার অন্যদেরকে বাল্য বিবাহ রোধের সবক পড়ায়।

উল্লেখ্য যে, ভারতে যুগ যুগ ধরে নারী ধর্ষিত হওয়া ছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রকারের অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত আচরণের সম্মুখিন হয়ে আসছে। তা বিবেচনায় না নিলে ইসলামের আগমনে নারী মুক্তি ও ইসলামের ছায়ায় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিসহ নারী মানুষ হিসেবে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

---

[100] - বিস্তারিত পড়ুন: Banglalive.com. 24 Nov. 2014

বাস্তব চিত্রটি পশ্চিমাদের ক্যামেরায় কখনো ধরা পড়বে না। ইসলামের সঠিক পয়গাম তাদের প্রপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে অন্ধকারেই থেকে যাবে চিরদিন। নারীর অতীত ও বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই:

১. ইসলামের আগমনের পূর্বেও নারী প্রকাশ্যে ক্রয় বিক্রয় হতো আজও হচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে লাভ জনক ব্যবসা হলো পতিতা ব্যবসা। এটিকে ঘৃণা করা তো দূরের কথা; বরং সমাজে বেশ্যাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদেরকে বেশ্যা বলার পরিবর্তে দেহপশারনী, দেহোপজীবী, জনপদবধু পরিশেষে তাদের এই ঘৃণ্য কাজকে একটি সামাজিক কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রূপ দেয়ার জন্য এখন যৌনকর্মী বলা হচ্ছে। এভাবে তারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ঘৃণ্য পেশাকে অবলম্বন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

২. মেয়ে জন্ম হলে আগেও মেরে ফেলা হতো এখনো মেরে ফেলা হচ্ছে। বর্তমানে আরো একধাপ এগিয়ে মায়ের গর্ভে থাকতেই লিঙ্গ নির্ধারণ করে মেয়ে হলে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখার আগেই গর্ভপাতের মাধ্যমে নারী ভ্রুণকে হত্যা করা হচ্ছে। এভাবে মেয়েদের হত্যার কারণে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ১০০০ পুরুষের বিপরীতে নারীর সংখ্যা ৯০০। ভারতের পাঞ্জাবের হরিয়ানার চিত্র খুবই করুণ। সেখানকার একটি গ্রামে ১১০ বছর পর সম্প্রতি এক বর যাত্রীর আগমন ঘটেছে। অর্থাৎ ১১০ বছর আগে উক্ত গ্রামের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। এরপর হতে এই গ্রামে আর কোনো মেয়ের জন্ম হতে দেয়া হয় নাই। তাই এই গ্রামে ৮৫০ জন পুরুষের বিপরীতে নারীর সংখ্যা ১৫০ জন মাত্র।

৩. যৌতুকের কারণে ভারতে প্রতি বছর ৭৫০০ বধূকে হত্যা করা হয়। তবে এদের অধিকাংশকে হত্যা করা হয় আগুন দিয়ে। তাছাড়া শ্বশুরালয়ের নির্যাতন, মাতা-পিতার অত্যাচার এবং প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা তো অজানা থেকেই যাচ্ছে। শুধুমাত্র কর্ণাটক প্রদেশের কেরালায় প্রতি বছর ৪০০০ নারী উল্লেখিত কারণে আত্মহত্যা করে।

৪. ভারতে অভাবের তাড়নায় মেয়েদের বিক্রির ঘটনা তো প্রতিদিন ঘটছে। এটি নিত্য দিনের ব্যাপার। অন্যদিকে কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশে হাজার

হাজার মেয়েকে "ইয়াল্লাম্মা" নামক দেবীকে খুশী করার জন্য উৎসর্গ করা হয়। সমাজে তাদেরকে "দেবদাসী" নামে ডাকা হয়। পূজারীরা তাদেরকে শয্যাসঙ্গিনী করে ইচ্ছে মত ভোগ করার পর পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। সেখানে তারা অন্ধকার জগতের অধিবাসী হয়ে হাওয়ান জানোয়ারের জীবন যাপনের কোনো এক সময় দুন্ইয়া হতে বিদায় হয়ে যায়।

৫. ভারতের হিন্দু সমাজে নারীকে অপবিত্র আগেও মনে করা হতো এখনো মনে করা হচ্ছে। হিন্দু ধর্মে নারীকে ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে এবং ধরতে দেয়া হয় না। বিশেষ সময়ে অর্থাৎ পিরিয়ড চলাকালীন রান্নাঘর, পানি রাখার স্থান ও ধর্মীয় স্থানে নারীদেরকে যেতে দেয়া হয় না। এই সময়ে খাওয়ার কোনো পাত্র তারা ধরতে পারবে না বলে এমন শিক্ষা শিশুকাল হতেই পেয়ে থাকে। যদি ধরে তাহলে না পাক বা অপবিত্র হয়ে যাবে বলে শিক্ষা দেয়া হয়।

৬. নারীকে দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে মনে করা হয়। বিশেষ করে বিধবাদের অবস্থা খুবই করুণ। তাদেরকে ডাইনী ও প্রেতাত্মা বলা হয়। তাদেরকে পরিবার হতে পৃথক করে কালো একটি কুঠরীতে রাখা হয়। আবার কোথাও বাড়ী ঘর হতে তাড়িয়ে দেয়া হয়। তবে আগে এমন সব নারীকে মানব বসতীর বাইরে থাকতে বাধ্য করা হতো। এখন তাদের চিন্তা চেতনায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাই এখন নিজ পরিবারের কালো কুঠরীতে থাকতে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও তাদের জন্য নারী নিকেতন নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজেদের সন্তানদের থেকে পৃথক করে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর হাজার হাজার বিধবা ও বুড়িদেরকে তাদের পরিবারের সদস্যরা এখানে অসহায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। এক সময় স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় জীবিত ফেলে জ্বালিয়ে দেয়া হতো। কি করুণ চিত্র!! স্বামীর চিতায় কথিত সতীদাহের ঘটনা আজও ভারতে কোথাও কোথাও ঘটছে।

৭. নারীকে শায়ত্বানের এজেন্ট এবং পাপের বাক্স মনে করা হয়। খ্রিষ্টানদের বর্তমান বাইবেল, ইয়াহুদীদের ধর্মশাস্ত্র তালমুদ এর ভাষ্য অনুযায়ী মা হাওয়া আদম (আ.) কে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। খ্রিষ্টানদের চার্চ বা গির্জার শিক্ষায় বলা হয় রূহানী শক্তি অর্জন

ও ধর্মীয় মর্যাদা লাভ নারী হতে দূরে থেকেই সম্ভব। তাই পাদ্রীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয় না। এই কারণেই নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক, জারয সন্তান জন্ম অতঃপর তাদেরকে হত্যার ঘটনার সাথে চার্চ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রীক Methodology তে Pandora নামক একজন নারীকে সকল প্রকারের বিপদ আপদের জড় বলা হয়। তাই ইংরেজী ভাষায় Pandora Box নামক একটি পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অথচ ইসলাম ঈমানের পুর্ণতার জন্য বিবাহের হুকুম দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তা বাস্তবায়ন করে তাঁর উম্মাতের জন্য নমুনাও রেখে গেছেন।

৮. নারীকে শিক্ষা হতে দূরে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই পুরুষের তুলনায় নারীদের শিক্ষার হার কম। ভারতে নারীদের শিক্ষার হার ৪২% যেখানে পুরুষের হার ৭৬% এর কাছাকাছি।

৯. নারীকে সম্পত্তি হতে আগেও বঞ্চিত করা হতো এখনও করা হচ্ছে। হিন্দু সমাজে পিতার মৃত্যুর পর সকল সম্পত্তির মালিক ছেলেরা হয়ে যায়। স্বামী, পিতা, সন্তান এবং ভাইয়ের সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার নেই। কিন্তু ইসলাম সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, এই সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১০. হিন্দু ধর্ম ও সমাজে নারী তার পিতা, স্বামী ও সন্তানের কোনো জিনিসের মালিকানা দাবী করতে পারে না। ভেট বা উপঢৌকন অথবা উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা থাকলেও আপনজনদের ঘরেও নারী অসহায়। এ সব কারো বানানো কিস্‌সা কাহিনী নয়। এটি হলো তথাকথিত সভ্যতায় নারীর চিত্র।

মোটকথা, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর ছোট বড় সকল ধর্মের ইতিহাসের পাতায় নারীদের সাথে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ খুবই বেদনাদায়ক। নারী যেখানে মা, বোন, ভাবী, স্ত্রী ও কন্যার মত পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল মোড়ে পুরুষের সুখ দুঃখের সঙ্গী, সাহায্যকারী, সহমর্মীতা ও মমতার হাত সম্প্রসারণ করে আসছে সেখানে নারী যুগ যুগ ধরে পুরুষের হাতে নির্যাতিতও হয়ে আসছে সমান তালে। অথবা ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়ে মধু শুকিয়ে যাওয়ার পর নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে। এখনও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা নামক নুতন স্বপ্নের

মাধ্যমে নারীকে যুল্‌ম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের সেই দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও যদি মানব সমাজের চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-দর্শনের পরিবর্তন না হয় তাহলে হয়ত ক্বিয়ামাত আসার আগেই এই পৃথিবী ও মানব সভ্যতা খুব সহজেই বরবাদ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। মানব বসতিতে পরিচয় দেয়ার মত কোনো স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না।

পুরাতন সভ্যতার অনুকরণে আজকের পশ্চিমা সভ্যতা পুরোদমে চলছে। যদিও তারা এটির কখনো নাম দিয়েছে Modernism আবার কখনো নাম দিয়েছে Ultra Modernism। তাদের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতাকে শক্তি জোগাচ্ছে শিল্প বিপ্লব। শিল্প উন্নয়নের কারণে শহর বন্দর নগরীর যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমন এক বিশাল শ্রমিক শ্রেণীর কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। শহর বন্দরের জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নারীরাও আজ ঘর হতে বের হয়ে পড়ছে। পরিণতিতে কি হলো, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বিশ্বাসের কবর রচিত হলো। কেউ কাউকে আর বিশ্বাস করছে না। দেশের পরিস্থিতি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, মেয়েরা এখন সব বয়সের পুরুষদেরকে দেখলে আঙ্কেল বলে সম্বোধন করে। আর পুরুষ মনে করে তাকে সম্মান দিচ্ছে। মূলতঃ মেয়েরা নিজের ইযযাত রক্ষা করার জন্যই আজ সকল বয়সের পুরুষদেরকে আঙ্কেল বলছে। তারপরও আজ দেশের সর্বত্র নারী ধর্ষণের উৎসব চলছে। সব বয়সের নারী হারাচ্ছে তার সতীত্ব।

তেমনই এক লোক একবার বললো এটি সত্য যে, আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই। এটি শুনে সবাই বাহ্‌বা দিতে লাগলো আর বলতে লাগলো লোকটি খুবই চরিত্রবান। অতঃপর লোকটি মানুষের মুখে নিজের এমন প্রশংসা শুনে বলে উঠলো ভাই এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম আমার গার্লফ্রেন্ড না থাকার কারণ হলো এযুগে ফ্রেশ কেউ নেই। আর সেকেন্ডহ্যান্ড আমার পছন্দ না। তাই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না বলেই আমার বিয়েটিও হচ্ছে না।

তাই বলছিলাম, নারী স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদীরা নারীদেরকে ঘর হতে বের করে এনে স্বল্প বেতনে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করে

চলেছে, নারীর নয়। নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে তাদের সু-রক্ষিত ঘর-বাড়ী, বাবা-ভাই ও স্বামীর কাঁধে নিশ্চিত খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকার পরও স্বয়ং সম্পূর্ণতার নামে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, হাট-বাজারসহ সর্বত্র উন্মুক্ত চলাফেরা করে তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগের ব্যবস্থা করেছে মাত্র। তবে সত্য কথা হলো, নারী সমানাধিকার পায় নাই পাবেও না। উল্টো হারাচ্ছে সতীত্ব ও মান-সম্মান। হচ্ছে অন্যের হাতের খেলার পুতুল।

তারপরও নারীবাদী ও নারী স্বাধীনতাকামীদের সুন্দর সুন্দর স্লোগানে নারীরা আজ পাগল হয়ে যেমন বাড়ী ঘর ছেড়ে মাঠে ঘাটে ঘুরছে, তেমনিভাবে তাদের অশালীন কাপড়ও অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। শারীরিক গঠন যেন কোনো বাঁধ মানছে না। না শারী'য়াতের না পরিবারের। উল্টো কার চেয়ে কে বেশী খোলামেলা হতে পারে এবং কত স্বল্প বসনায় কে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এমন মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার কারণে পুরো মানব সমাজ আজ উন্মুক্ত বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়ে দুর্ভাগ্যের অতল গভীরে নিমজ্জিত। এভাবে শরীরের সকল আকর্ষণীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সৌন্দর্য প্রকাশের যেন প্রতিযোগিতা চলছে পৃথিবীর সর্বত্র। এটিকেই নারীরা জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া মনে করে বসে আছে। আর এরই নাম দিয়েছে নারী স্বাধীনতা!! **নাউযু বিল্লাহ্**।

এত চালাক নারী সব বুঝতে পারলেও কিন্তু এসবের মাধ্যমে নারীবাদীরা তাদেরকে ভোগের রাস্তা উন্মুক্ত করছে এটি তারা বুঝতে পারছে না। সমান অধিকার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে পরিবারের দায়িত্ব ছাড়াও নারীর দুর্বল কাঁধে জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব অত্যন্ত সু-কৌশলে তুলে দিয়ে অন্যের আঙ্গিনায় কামলা খাটতে বাধ্য করছে। মোটকথা, নারী জীবন নিয়ে সর্বত্র ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আর নারী তাদের বাঁশীর সূরে স্বাধীনতা পেয়েছি বলে যখন তখন যেখানে সেখানে নাচতেছে। কি আশ্চর্য! বিবেকহীন প্রাণীরাও কোনো এক সময় তার প্রভুকে ত্যাগ করে চলে যায়, সাপ ছোবল মারে সাপুড়েকে, দুধ-কলা খেয়ে বড় হওয়া বানরও একদিন তার মালিককে রেখে পালায়। হাতি তার মাহুতকে পায়ের নীচে ফেলে হত্যা করে। চিড়িয়া খানার প্রাণীরা খাবার কম হলে তাদের রক্ষকদেরকেও আক্রমণ করে।

একমাত্র নারীই এজগতের অনুভূতিহীন এক প্রাণী, তাকে যে যেমন নাচায় সে তেমন নাচে। তার নিজস্ব কোনো বক্তব্য, রুচি চাহিদা ও চেতনা নেই।

এখানেই শেষ নয়, Fashion Show, Modernism, Free Mind, Model Girl & Beauty Contest সহ নারী প্রগতি ও নারী উন্নয়নের নামে তারা আজ Front Line এ এসে পৃথিবীর সর্বত্র পুরুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। এই সুযোগে নারীবাদীরা তাদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে। অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনেও অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নারীকে ব্যবহার করছে। এটি কোনো গোপনে বা আড়ালে আবডালে হচ্ছে তা নয়, প্রকাশ্যে ঘোষাণা দিয়ে হচ্ছে যা প্রতিনিয়ত নারীরা মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছে। নারীর ভাগ্যের দুয়ার খুলছে, চাকুরী হচ্ছে সর্বত্র এসব চটকদার বুলি আওড়িয়ে নারী আজ আনন্দে আত্মহারা। অথচ Receptionist, Private Secretary & Public Relation Officer সহ যাবতীয় পদে নারীকে অবিবাহিতা, স্বল্পবয়সী, সুন্দরী, গোলগাল কাঠামো, স্মার্ট ও সুললিত কণ্ঠসহ আরো কত কি তাদের Requisition।

অতএব এসব চাহিদা পুর্ণ হলেই পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই নারী চাকরি লাভ করে সমান অধিকার পেয়েছি বলে মহা খুশী। অথচ একটিবারও তারা ভাবছে না যে, কিসের বিনিময়ে তাদের এই পাওনা? আরো পরিষ্কার করে নারীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হলে বলতে হয়, টিভিতে ফেয়ার এন্ড লাভলীর বিজ্ঞাপনে যে মেয়েটি Airhostess হচ্ছে সে কিসের বিনিময়ে হচ্ছে? আগে তার রূপ কেমন ছিল? ফেয়ার এন্ড লাভলী মাখার কারণে তার চেহারায় রূপের বন্যা নেমে আসার পর সে হয়ে গেল আজ Airhostess।

অতঃপর বিমানে ওঠার পর তার দিকে বিমানের আবাল, বৃদ্ধ, শিশু ও তরুণরাসহ সব বয়সের যাত্রীরা যেভাবে তৃষ্ণার্ত কাকের মত চেয়ে আছে তা দেখার পরও কি বলতে হয় নারী কিসের বিনিময়ে চাকরি পাচ্ছে? নারীবাদীদের সমাজে আজ তাদের কি লজ্জাকর অবস্থান! বাসায় টিভিতে তাদের এঅবস্থা দেখে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাদের মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে যাত্রীরা মেয়েটির দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন? তখন

ভদ্র পরিবারের মা-বাবারা সন্তানদের এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে একে অপরের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পরিশেষে লজ্জায় মুখ লুকায়। না হয় টিভি বন্ধ করে দেয়।

তাই এমন পরিস্থিতিতে আমরা রাব্বে কা'বার ক্বাস্‌ম খেয়ে বলতে পারি, ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বনারী সমাজকে একমাত্র ইসলামই মুক্তি দিতে পারে। ইসলামের শীতল ছায়ায় উত্তপ্ত বিশ্ব শান্ত হতে পারে। দিশেহারা জাতি একমাত্র ইসলামের ছোঁয়ায় পেতে পারে সঠিক পথের সন্ধান। কারণ ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র দেয়া সর্বশেষ জীবন বিধান। তাই এই বিধানে জীবনের সকল মোড়ে মধ্যপন্থা ও সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে নারী-পুরুষের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারী পুরুষের পৃথক পৃথক সীমানা নির্ধারণ করে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ইনসাফ ভিত্তিক নিয়মনীতি নির্ধারণ করে সবার কর্মক্ষেত্র বাত্‌লে দিয়েছে। তাই বলছিলাম, একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই নারী পুরুষের জন্য উত্তম নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছে। কারণ পৃথিবীর স্রষ্টা যিনি তিনি মানব জাতিকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সূরা ত্বীনে বলেছেন:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾[১০১]

'আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।'

আল্লাহ্ শুধু সৃষ্টি করেন নি; বরং তিনি তৃণলতা থেকে নিয়ে বিশাল গ্রহ নক্ষত্রসমূহকেও একটি নির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন। তাই এই বিধানের ব্যতিক্রম করার কারো কোনো সুযোগ নেই। জঙ্গলের হিংস্রপ্রাণীরা যেমন লোকালয়ে আসছে না তেমনি পানির মাছও ডাঙায় উঠে পড়ছে না। সাগরের পানি যেমন তার সীমারেখা মেনে চলছে অনুরূপভাবে আকাশের নক্ষত্রগুলোও নিজ নিজ পরিমন্ডলে ঘুরাফেরা করছে। পৃথিবীর সকল কিছুই সৃষ্টি লগ্ন হতে নিজ নিজ সীমানায় অবস্থান করে আল্লাহ্‌র বিধানের বাস্তব নমূনা পেশ করে আসছে। সেখানে কোনো প্রকারের ব্যাতিক্রম কিছু ঘটছে না। এ সম্পর্কে ক্বোরআন বলেছে:

১০১- সূরাতুত ত্বীন, আয়াত নং-৪

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾[১০২]

'আর আল্লাহ্ই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।'

মানব জাতিও আল্লাহ্র অগণিত সৃষ্টির মাঝে একটি নগণ্য সৃষ্টি মাত্র। যেখানে পৃথিবীর সকল সৃষ্টির জন্য বিধান হবে আর মানব জাতির জন্য কোনো বিধান হবে না এটি কি করে হতে পারে? তাই আল্লাহ্ পুরো মানব জাতির জন্য ক্বিয়ামাত পর্যন্ত একটি চিরন্তণ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান দিয়ে বলেছেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ﴾[১০৩]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'

আসমানী এই বিধানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে মানব ও মানবতার অস্তিত্ব। এর উল্টো হলেই মানব জীবন ও মানব সমাজে বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ ইসলামী জীবন বিধানে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও দায় দায়িত্ব পৃথক পৃথক করা হয়েছে। যদিও নারী পুরুষ একে অপরের জন্য অপরিহার্য। উভয়ের সমন্বয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। তাই বলে নারী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশায় উভয়ের জীবনে নেমে আসে এক বিভীষিকাময় অবস্থা। অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরী করে টিস্যু পেপার বানিয়ে ডাস্টবিনকেই তাদের শেষ ঠিকানা বানিয়ে দেয়। প্রকৃতিগতভাবে নারীর মধ্যে রয়েছে আগুনের স্বভাব এবং পুরুষের মধ্যে রয়েছে পেট্রোলের বৈশিষ্ট্য। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা উভয়কে কিছু নিয়ম কানুনের মাধ্যমে আবদ্ধ করে তাদের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যকে একটি সু-চ্ছৃঙ্খল মানব সমাজ প্রতিষ্ঠাসহ উন্নতি ও প্রগতির গ্যারান্টি বলে ঘোষণা করেছেন। এই সব নিয়মনীতি উপেক্ষা করা হলে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য মানব সমাজকে

১০২- সূরাতুল আম্বিয়া, আয়াত নং-৩৩

১০৩- সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৩

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে দিতে পারে। যার প্রমাণ হলো আজকের Aids নামক আধুনিক মরণব্যাধি। এই সব মরণব্যাধি হতে মানব ও মানব সভ্যতাকে রক্ষার তাগিদে ইসলাম নারী-পুরুষের জন্য যে বিধান দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ।
২. নারীদের জন্য পর্দা ফার্‌য করা হয়েছে।
৩. মাহ্‌রাম ও গায়রে মাহ্‌রামের ঘোষণা দিয়ে নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্পর্কের গন্ডি নির্ধারণ করা হয়েছে।
৪. বিয়ে ফার্‌য করে সুন্দর পরিবার গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৫. শর্ত সাপেক্ষে একজন পুরুষকে চারটি বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
৬. স্বামীর কাঁধে স্ত্রীর ভরণ-পোষণসহ ইয্‌যাত আবরু রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে নারীকে মানব সমাজে সম্মানিত করেছে।
৭. নারীকে স্বামীর সংসার ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে নারীর মমতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
৮. স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব স্বামীকে বহন করার কথা বলে পুরো জীবনের জন্য নারীকে চিন্তা মুক্ত করা হয়েছে।
৯. উপার্জনের দায়িত্ব হতে নারীকে মুক্তি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।
১০. উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনাকে হারাম করে নারী জীবনকে পাক ও পবিত্র এবং নিষ্কলুষ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১১. স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে বলাকে কাবীরাহ্ গুনাহ্ বলে নিজেদের ইচ্ছেমত একে অপরের মাঝে হারিয়ে গিয়ে দাম্পত্য জীবনকে আনন্দময় করার সকল রাস্তা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
১২. চরিত্র হননকারী নভেল নাটক ও সাহিত্যকে নিষিদ্ধ করে যুব সমাজের চরিত্রকে পবিত্র রেখে যৌন শক্তি অক্ষয়ের মাধ্যমে আগামী দিনে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৩. ব্যভিচারকে হারাম করে মানব সমাজকে রোগ মুক্ত রাখা হয়েছে।
১৪. নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির লক্ষ্যে পাপাচারের শাস্তির বিধান দিয়ে উভয়ের মাঝে **'বুন্‌ইয়ানুন মারসূস'** বা সীসাঢালা একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫. দাম্পত্য জীবনে পুরুষের জন্য ত্বালাক এবং নারীর জন্য খোলার বিধান রেখে দাম্পত্য জীবনের অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে একে অপরের কাছ থেকে মুক্তির পথ বাত্‌লে দেয়া হয়েছে।

এরপরও বলবেন ইসলাম অচল? ইসলাম নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে। আর কী করলে মূল্যায়ন হবে? এর বাইরে যারা মূল্যায়নের রাস্তা বাত্‌লানোর চেষ্টা করছে তারা মূলতঃ নারীর সতীত্ব হরণের রাস্তা খুঁজছে। যারা এমন বলে তারা নেশা করে। সকাল-সন্ধ্যা গাঁজায় টান মারার কারণে বাস্তবতা উপলব্ধিতে তারা অক্ষম। তাই তারা মানুষের কাতারে পড়ে না। উল্লেখিত বিধানের উপর মানব জীবনের গাড়ী পৃথিবীর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে চলে আসছে। অতএব এর ব্যাতিক্রম ঘটলেই দুর্যোগ বা ট্রাজেডীর সম্মুখিন হওয়া অনিবার্য। ইসলাম ইয্‌যাত ও সম্মানের সাথে পরিবার ও সামাজিক জীবনে নারীর হক নির্ধারণ করেছে। যার উপরে কোনো অধিকার বা নারীর কোনো অবস্থান মানব সভ্যতা ও সমাজ কখনো কল্পনাও করতে পারে নাই, পারবেও না কোনো দিন। কারণ একটু চোখ বুলালেই ইসলামের আঙ্গিনায় আমরা নারীকে এভাবে দেখতে পাই:

১. মা হিসেবে নারীর পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত। মায়ের অসন্তুষ্টিতে সন্তানের জাহান্নাম অবধারিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মা হিসেবে নারীর সাথে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করতে ক্বোরআনে নিষেধ করা হয়েছে। নারীকে মা হিসেবে পেয়ে তার খেদমত করে জান্নাত লাভে ব্যর্থ হলে তাকে হতভাগা বলা হয়েছে। হাদীসের ভান্ডারে আমরা দেখতে পাই, রাসূল (স.) এ ধরনের লোকদের জন্য বদ্ দো'য়া করেছেন।

২. বোন ও মেয়েকে সঠিক ভাবে লালন পালন করে দ্বীনদার পাত্রের কাছে বিবাহ দিলে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) তাঁর সাথে জান্নাতে সহাবস্থানের কথা ঘোষণা করে নারীর মর্যাদাকে সমাজে সু-প্রতিষ্ঠার সর্ব প্রথম ও সর্ব শেষ ভিত্তিপ্রস্তর রেখে গেছেন। ঈমানদারদেরকে কাছে আল্লাহ্‌র রাসুলের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর, আর সব ঘোষণা ও নারীবাদীদের সকল সনদ অর্থহীন। অতএব এরপরও যদি কেউ জাতিসংঘের কোনো সনদ এবং মানবাধিকারের কোনো ঘোষণার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে বুঝতে হবে সে হতভাগা।

৩. পবিত্র ক্বোরআনে কন্যা সন্তানদের সাথে অন্যায় আচরণ বা তাদেরকে অপমানের প্রতীক মনে করে মেরে ফেললে জাহান্নামের চরম শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েদেরকে আল্লাহ্ ক্বিয়ামাতের দিন জিজ্ঞেস করবেন বলে পবিত্র ক্বোরআনে এভাবে বলে দিয়েছেন:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾[১০৪]

'যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?'

উপরোক্ত আয়াতে কন্যা সন্তানকে হত্যা সম্পর্কে ক্বিয়ামতের মাঠে সকল অপরাধীকে জিজ্ঞেস করা হবে বলে ক্বোরআনে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে প্রশ্ন আউট করে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আফসোস! শত আফসোস! এরপরও বলা হচ্ছে ইসলাম নারীকে বঞ্চিত করেছে! ইসলামের আঙ্গিনায় নারী অবহেলিত ও অপমানিত!!

৪. স্ত্রীকে প্রশান্তির নীড়, তাক্বওয়ার পোষাক, পারিবারিক জীবনের শান্তি ও আনন্দ, সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার First Pillar বলে পরিবারে তার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য পুরুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নেক্কার স্ত্রীকে স্বামীর জীবনের সবচেয়ে বড় নি'য়ামাত ঘোষণা করে তার মূল্যায়নের জন্য তাকে সাহস জুগিয়েছে। তাই স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার, হাসি-ঠাট্টা ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনসহ তার মুখে খাবার তুলে দেয়াকেও সাওয়াবের কাজ বলে সর্বদা তার মন জয় করে তাকে খুশীতে রাখার জন্য পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অন্যায় আচরণ ও তার উপর যুল্ম নির্যাতনকে ইসলাম হারাম করেছে। এখানেই শেষ নয়, আল্লাহ্র রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَن أمّ المؤمنينَ عَائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي)[১০৫]

'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আপন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির জন্য উত্তম। আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম।'

১০৪- সূরাতুত তাকভীর, আয়াত নং-৮-৯

١٠٥- أخرجه الترمذي

রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে উত্তম তাকে শুধু উত্তম পুরুষ বলেন নি; বরং তিনি নিজেও তাঁর পরিবারের জন্য উত্তম বলে উম্মাতের জন্য নমূনা রেখে গিয়েছেন। বহু বিবাহ করার জন্য সাম্য ও সবার সমান হক্ব আদায় করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত জুড়ে দিয়ে পাতিলে পাতিলে বাড়ি লাগতেই বহু বিবাহের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, সমাজে এ সবের কোনো চর্চা নেই। চর্চা আছে ইসলামে চারটি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। এটি বলতে এবং যেখানে সেখানে এটিকে নিয়ে আসর জমাতে কেউ ভুল করে না। ইসলামের ফার্য বিধানের খবর না থাকলেও কিন্তু চারটি বিয়ে ইসলামে জায়েয নিগেটিভ অর্থে এটি সবার জানা। এরা কোন্ জাতের বদমাইশ এবং এদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার জন্য কি কিতাব দেখতে হবে?

৫. নারীর ইজ্জত সম্মান রক্ষার দায়িত্ব পালনকে পুরুষের জন্য ফার্য করা হয়েছে। স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদকে কাবীরাহ্ গুনাহ্ বলে মনগড়া ও মিথ্যা অপবাদের রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে অটুট রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাই মিথ্যা প্রমাণিত হলে দোর্‌রা ও পাথর মারারও হুকুম দেয়া হয়েছে।

৬. শিক্ষা অর্জনসহ ব্যবসা-বাণিজ্য, পিতা-স্বামী-পুত্র এবং কখনো কখনো ভাইয়ের সম্পত্তিতেও নারীর (বোনের) হক্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭. ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম মর্যাদা লাভের রাস্তা পুরুষের জন্য যেমন খোলা রয়েছে তেমনিভাবে নারীদের বেলায়ও উক্ত রাস্তা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আখেরাতেও নারী-পুরুষ হিসেবে নয়; বরং সবার আমল অনুযায়ী হিসাব নিকাশ হবে বলে জানিয়ে দিয়ে মানব রচিত মতবাদের সকল ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়েছে।

৮. মানব হিসেবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যা নারী-পুরুষের জন্য প্রযোজ্য সেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ঘোষণা করে নারীকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করা হয়েছে।

অতএব ইসলামে নারীর অধিকার অন্য সব ধর্ম ও সমাজ হতে নিঃসন্দেহে উত্তম। তাই নারীর অবস্থান ও তাদের মর্যাদাকে তুলনামূলকভাবে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রগতিবাদীদের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদেরকে

অবশ্যই পালন করতে হবে। যাতে করে মুসলিম সমাজে আর কোনো ফাতেমা মরনসিসি ও তসলিমার আবির্ভাব না ঘটে। আমাদের ঘাটের কোনো তরী দিকভ্রান্ত হয়ে শত্রুদের ঘাটে গিয়ে যাতে না ভিড়ে সে দিকেও মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমি শুধু এখানে এক ফাতেমার ঘটনা উল্লেখ করে একজন সরলপ্রাণ মুসলমান ইসলাম ও রাসূল প্রিয় নারীর মন-মগজকে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রগতিবাদী ও নারীবাদীরা কীভাবে নারী উন্নয়ন ও নারী স্বাধীনতার নামে ইসলাম বিদ্বেষী বানিয়ে ফেলছে তা পাঠকদেরকে জানাতে চেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব বলেও আমরা মনে করি। ঠিক একই অবস্থা তসলিমা, সালমান রুশদী ও দাউদ হায়দারদের বেলায়ও ঘটেছে। এদের আবির্ভাবের পর যেভাবে ফাঁসি চেয়ে আন্দোলন করা হয় ঠিক সেইভাবে যদি আমাদের একটি গ্রুপ কাগজ কলম নিয়ে ইসলামের চিন্তা দর্শন উপস্থাপনার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে হয়ত এদের জন্ম এদেশে এত সহজে হতে পারতো না।

ইসলাম নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়েছে। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত বলে সন্তানদের জান্নাত লাভের জন্য Master key ঘোষণা দিয়ে নারীকে চির জীবনের জন্য মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিবাহ বন্ধনের বিধি-বিধান আরোপ করে যখন তখন খেয়াল খুশী মত নারীভোগের সকল হারাম রাস্তা বন্ধ করে নারীকে সম্মানের সাথে পরিবার ও সমাজে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

অন্যদিকে যাদের ছায়াতলে নারী ইসলাম বিরোধী প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছে তারা শুধু নারীর সম্ভ্রম হানির রাস্তা উন্মুক্ত করেনি; বরং ভোগও করেছে। এই স্বার্থান্বেষী মহলটি সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত বিচরণের মাধ্যমে লুটে পুটে নারীর মধু আহরণের পর ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। যার প্রমাণ আমাদের উল্লেখিত সমীক্ষার আলোকে আজকের ইউরোপ ও পশ্চিমা সভ্যতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশ বাংলাদেশও যে খুব পাক ও পবিত্র এটি বলা যাবে না। কারণ তসলিমাও তার বিভিন্ন বইতে নিজেকে এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করে আমাদের ইয্‌যাতের বারটা বাজিয়েছে। কথিত

নারীবাদীরা তাকে কীভাবে ও কোথায় এবং কত প্রকারে ভোগ করেছে তার বর্ণনাও কোনো প্রকারের লুকোচুরি ছাড়াই দিয়েছে। এত পরিস্কার ও ছোট খাট ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনার পরও কোনো ইসলামপন্থী তাকে কখনো ভোগের আহবান জানিয়েছে এমন কথা কোথাও সে লিখতে পারে নাই। এতেই বোঝা যায় যে, ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদের চরিত্র নিষ্কলুষ।

হ্যাঁ, তার এসব নোংরা কাহিনী পড়ে এবং জেনে অনেকে তাকে হিন্দুদের দেবীর নামে উৎসর্গকৃত গো-মাতার মত পথে পথে উন্মুক্ত ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন যাপনের আহবান জানিয়ে ছিলেন। তবে এটিও সত্য যে, এক তসলিমা তার নিজ জীবনের ঘটনাবলী লিখে দেশবাসীকে জানালেও আরো কত তসলিমার ভোগের কাহিনী অপ্রকাশিত রয়েছে, তার হিসাব শুধু তারাই জানে যারা ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং যারা ভোগ করেছে তারা। অথচ সমাজের বিকৃত মস্তিষ্কের কিছু নামধারী বুদ্ধিজীবীর ইসলাম বিরোধী প্রপাগান্ডার মাধ্যমে কারণে অকারণে:

Western countries are the developed countries.

বলে আমাদের মন মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর আমরাও আজ তাদের শেখানো বুলিটি অবলীলাক্রমে কোনো প্রকারের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই আওড়িয়ে চলেছি। তাই ক্বোরআন ও হাদীসের সঠিক অর্থ উপস্থাপন করে আজকের মুসলিম প্রজন্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে। যেই পশ্চিমাদের অনুকরণে মুসলিম উম্মাহ্‌র সন্তানরা আজ ব্যস্ত, সেই পশ্চিমাদেরকে আমাদের আসলাফেরা ঈমানী শক্তি দিয়ে এই দেশ হতে তাড়িয়ে ছিলেন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঈমান কেমন ছিলো জানেন? না জানলে নিম্নের ঘটনাটি পড়ুন তখন বুঝতে পারবেন।

মাওলানা আব্দুশ্ শাকুর দাইনপুরী তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ **"খুত্ববাতে দাইনপুরী"** তে লিখেছেন, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি পঁচিশ বছর দেশান্তর ছিলেন। তারপরও ইংরেজরা তাঁকে ধরতে পারেনি। তিনি আরো লিখেছেন, একবার তিনি আফগানিস্তান যাচ্ছিলেন, তখন তার পথের মাঝে তিনটি বাঘ এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চিৎকার করতে লাগলো। এমতাবস্থায় মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে বাঘগুলোর কান ধরে বললেন: হে বাঘ! আমি ইসলামের মিশন বাস্তবায়নের জন্য দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছি। অতএব তোমরা যদি ইংরেজদের কুত্তা হয়ে আমার পথ রোধ করে থাক, তাহলে সরে দাঁড়াও। মুহাম্মাদ (স.) এর অনুসারীকে যেতে দাও। এটি বলতেই বাঘগুলো গাধার মত মাথা নীচু করে রাস্তা হতে সরে দাঁড়ালো। ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি কালেমা পড়তে পড়তে রাস্তা অতিক্রম করে সামনে চলে গেলেন। [১০৬]

এখন দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, মুসলমান এবং ঘোড়া কোনো এক সময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে নেচে উঠতো। আর এখন তারা উভয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচে। সমাজে চলাফেরা করলে আপনি দেখতে পাবেন, মুসলিম পরিবারে জন্ম এবং মুসলিম সমাজে লালিত-পালিত, মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া-শোনা করেও তাদের ঈমান, আক্বিদাহ্-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। ভাবখানা এমন, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারলেই যেন কিছু একটা হয়ে গেছে।

বর্তমান সমাজে মুসলমানের সন্তানরা ইসলামের দুশমন হয়ে মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে একই পরিবারে বসবাস করছে। একই নিমকদানী হতে নিমক খাচ্ছে, অথচ আমাদের অনুভূতিতে সামান্যতম আঘাতও লাগছে না। শিশুকালের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা ও বিশ্বাস বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের কাছ থেকে চির বিদায় হয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের দুঃখ বা আফ্সোস হচ্ছে না। তাদের ভবিষ্যৎ আক্বীদাহ্-বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। চিন্তা হলো শুধু, আমার সন্তান কী হলো, কী খেলো এবং আমি মারা যাওয়ার সময় তাদের জন্য কী রেখে গেলাম। এটিই এখন সমাজের উপরতলা ও নীচতলা, আমতলা ও জামতলার মূল বিষয়। অথচ মুসলমানের ঈমানের দাবী হলো এই চিন্ত করা যে, আমি এখন মারা গেলে আমার কী হবে?

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের সন্তানরাই ইসলামের বিরুদ্ধে জন্ম নেয়া সকল ভুল ধারণাকে ইউরোপ আমেরিকায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার

১০৬- খুত্ববাতে দাইনপুরী, পৃষ্ঠা ৪১৫ খন্ড নং-১

করছে। তাই তারা ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যাকে নিজেদের মধ্যে সীমিত না রেখে ফাতেমা মরনসিসির মত লিখে এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আর আমাদের অপদার্থ কিছু মা-বাবা এবং অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে বনে যাওয়া তথাকথিত সমাজপতিরা বাক স্বাধীনতার নামে মুক্তমনা বলে তাদেরকে বাহ্‌বা দিচ্ছে। আশ্চর্যের কথা হলো, এমন ঈমান নিয়ে আমরা কবরে যেতে চাই। আর সেই ঈমান নাকি আমাদেরকে কবর হতে জান্নাতেও নিয়ে যাবে। বাহ্ কী চমৎকার চিন্তা-চেতনা। জান্নাতের পথ কত সহজ।

ইসলামের দুশমনরা কত ভাবে ইসলামের বিরোধীতা করে আসছে তা দেখেও আমরা এখন না দেখার ভান করছি। তারা আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে কখনো দাউদ হায়দার, কখনো সালমান রুশদী, কখনো তসলিমা আবার কখনো ফাতেমা মরনসিসিকে উদারপন্থি ও প্রগতিশীল নাম দিয়ে মুসলিম সমাজ ও পরিবার হতে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মনের কথাগুলো নিজেরা না লিখে এ সব মুসলমান নামধারীদের কলম দিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করছে। আর আমরা নাকে তেল দিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকাকে ঈমানের পরিচয় মনে করে বসে আছি।

এখন মুসলমানদের অবস্থা দেখে আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অথচ আমরা ভারতে দেখতে পাই যে, হনুমান শ্রী কৃষ্ণকে গালী দিলে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। নেপালে সূর্যকে গালী দিলে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ইউরোপে কৃষ্ণ ধর্মকে গালী দিলে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ইসরাইলে ইয়াহুদী ধর্মকে গালী দিলে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। পাকিস্তান আর বাংলাদেশে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.) কে গালী দিতে পারলেই সে বড় নেতা। মারা গেলে সে হয়ে যায় শহীদ। তার পরিবারকে শান্তনার বাণী শুনাতে দৌড়ে চলে যায় প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু এখন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা দেখে আল্লামা ইক্বালের নিম্নের এই শে'রটি আমার বার বার মনে পড়ে। তিনি মুসলমানদেরকে বলেছিলেন:

ওয়াদা'আ মে হো তোম নাস্বারা, তো তামাদ্দুন মে হুনূদ /
ইয়ে মুসলমান হ্যাঁয়, জিনহে দেখ কর শারমায়ে ইয়াহুদ

ইউঁ তো সায়্যেদ ভী হো, মিরযা ভী হো, আফগান ভী হো
তুম সাবহি কুচ হো বাতাও তো, মুসলমান ভী হো ?

চাল চললে খ্রিস্টান তুমি, হিন্দু তুমি সভ্যতায়। এমন এক মুসলিম তুমি যাকে দেখে ইয়াহুদীও লজ্জা পায়। তুমি সায়্যিদ, মির্যা এবং আফগানীও বটে। তুমি তো সব কিছুই, তবে বলো তো তুমি কি মুসলিম?

তাই বলছিলাম, খ্রিস্টান ধর্মসহ বর্তমান বিশ্বের অন্য কোনো ধর্ম সম্পর্কে কোনো মুসলমানের লেখাতো দূরের কথা, তাদের ধর্ম সম্পূর্ণ মানব রচিত ও ভ্রান্ত মতবাদ হওয়ার পরও কেউ কথা বলার সাহসও রাখেনা এবং প্রয়োজনও মনে করেনা। যদি কেউ সাহস করে ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে তাদের ধর্মের সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে কলম ধরে, তাহলে আমাদের সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাই প্রথম তার বিচার দাবী করে মানব বন্ধন ও মানব র‍্যালীসহ সরকারী অর্থায়নে রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্রকে ব্যবহার করে সর্বস্তরের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টা চালাবে। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হবে তার সকল মিডিয়া। হৈ চৈ পড়ে যাবে সকল আঙ্গিনায়। অতিপরিচিত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে গৃহীত পরিভাষা অঙ্গি বা জঙ্গি বলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। পরিণতিতে কখনো রাতের অন্ধকারে আবার কখনো প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে অপহরণ করে গুম করে ফেলবে অথবা বন্দুক যুদ্ধের নাটক সাজাবে।

অতঃপর স্বার্থান্বেষী মহল এটিকে একটি মোক্ষম সময় মনে করে তাদের বিরুদ্ধে মিডিয়াকে লাগিয়ে দেবে। কারণ আগে কেউ কাউকে ঘায়েল করতে হলে তার বিরুদ্ধে কুকুর লেলিয়ে দিতো, বর্তমানে মিডিয়া লাগিয়ে দেয়। কারণ পক্ষে যদি থাকে টেলিভিশন-রেডিও-পেপার, মিথ্যাকে সত্য বানানো খুবই সহজ ব্যাপার। তাই এখন মিডিয়ার যুদ্ধই হলো সবচেয়ে ভয়ানক যুদ্ধ। ভারতের মুম্বে হতে প্রকাশিত Times of India পত্রিকার বিশিষ্ট কলামিষ্ট রাজদ্বীপ ১৯৯১ সালে Mighty sword, mightier Pen শিরোনামে একটি কলাম লিখেছিলেন। উক্ত কলামে তিনি লিখেছিলেন, ভারতের শিবসেনারা দীর্ঘ দিন যাবত মনে করেছিলো শক্তির মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে একদিন তারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের এই ধারণা খুব বেশী একটা

কাজে আসেনি। পরিশেষে তারা নিজেরাই এখন মিডিয়ার জন্ম দিয়ে নিজেদের পত্রিকায় লিখেছে যে, অস্ত্র হিসেবে মিডিয়াকেই এখন ব্যবহার করা উচিৎ। পত্রিকার ভাষায়:

'Do not remove a sword, When even cannot becomes useless, bring out a newspaper.'[107]

অর্থাৎ গুলি কামান দাগিয়ে তলোয়ার বের করে কোনো লাভ হবে না। এগুলো যখন অকার্যকর তখন পত্রিকা বের করে মিডিয়ার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়।

এভাবে পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের শত্রুরা একদিকে মুসলমানদেরকেই সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবহার করে আসছে, অন্যদিকে পুরো বিশ্বের সকল মিডিয়াকেও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ তাদের ষড়যন্ত্রের জাল খুবই বিস্তৃত আমরা তাদের সামনে অত্যন্ত অসহায়! তা বলার আর বোঝার অপেক্ষা রাখেনা। তবে শুধু এ টুকু বলবো, পেছনে পড়ে নিজেদের সর্বস্ব হারানোর বেদনাও আজ আমরা অনুভব করছি না। পেছনে পড়ে থাকার কারণ উদঘাটন করা তো দূর কী বাত, তাদের পেছনে কী কারণে পড়ে থাকছি তাও অনুভব করতে পারছি না। তাই এখন সবার মনে প্রশ্ন জাগছে, ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের কোনো প্রস্তুতি আছে কি? এটি এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তর আমাদের সবাইকে খুঁজে বের করতেই হবে। এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

---

[107]- Times of India, 3rd Nov.1991.

সভ্যতার নামে প্রযুক্তির আক্রমণে রক্তাক্ত উম্মাহ্‌র বন্ধন

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে নব আবিষ্কার করতে শেখায় না; বরং ইসলাম নব আবিষ্কারগুলোর ব্যবহারকারীদেরকে সৎ ও সঠিক বানানোর পদ্ধতি বাত্‌লে দিয়ে দুন্‌ইয়া ও আখেরাতে মুক্তির রাস্তা দেখায়। আর এখানেই ইসলাম এবং অন্য ধর্মের মাঝে পার্থক্য। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য তার সন্তানকে শুরুতেই শেখাতে হবে:

১. আমি কে ?
২. আমার উদ্দেশ্য কি?
৩. আমাকে কোথায় যেতে হবে?
৪. আমাকে কে পাঠিয়েছেন?
৫. কেন পাঠিয়েছেন?

আমার আপনার সন্তান যখন এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে যাবে তখন তাকে প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক, মজুর যা খুশী তা বানিয়ে ফেলুন আখেরাতে সে শুধু একা জান্নাতে যাবে না সে তার মা-বাবাকেও নিয়ে যাবে। তাই প্রথমে তাকে মুসলমান বানাতে হবে। কারণ মুসলমান যা খুশী তা করতে পারে না। তাকে জীবনের সকল বাঁকে ও সকল মোড়ে কিছু নিয়ম-নীতি এবং হালাল-হারাম মানতে হয়। এখানে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো ভুল হয়ে গেলে ইসলাম তাকে তাওবার পথ উন্মুক্ত বলে পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসতে সাহায্য করে। মূলতঃ মানব জীবনে আল্লাহ্‌ বিমুখতার মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণের পর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম U-TURN হলো তাওবাহ্‌।

তাই ইসলামী শারী'য়াত তার অনুসারী নারী-পুরুষের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়েছে। ইসলাম নারীকে যেমন পর্দা করতে বলেছে তেমনিভাবে পরুষকেও দাড়ি রাখতে বলেছে। নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য রেশমের কাপড় এবং স্বর্ণ ব্যবহারকে হালাল করে পুরুষের জন্য এগুলোকে হারাম করেছে। নারীকে পর্দার বিধান দিয়ে সকল অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী হতে তাকে হিফাযাতের রাস্তা বাতলে দিয়েছে।

অতএব পর্দা যুগ যুগ ধরে চলে আসা মুসলিম সমাজ ও পরিবারের কোনো প্রথা নয়; বরং এটি শারী'য়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। পর্দা না করলে শুধু গুনাহ হবে না, এইটি অস্বীকার করাও কাবীরাহ্ গুনাহ্। কারণ ইসলামের পর্দার বিধান ওলামা ও ফুক্বাহার গবেষণার কোনো ফসল নয়, এটি পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষিত আল্লাহ্র স্পষ্ট একটি বিধান। এই বিধান রাসূলের পরিবার হতে শুরু করে তাঁর উম্মাতের সাধারণ নারীদের জন্য পুরোপুরী প্রযোজ্য।

তবে দঃখজনক হলেও সত্য, আজকের মুসলিম সমাজের সর্বত্র এটি অবহেলার শিকার। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত সমাজের নারীরা শিক্ষার নামে ঘরের বাইরে এসে এটিকে এখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করে বসেছে। কারণ আধুনিকতার হাওয়ায় দুলতে গিয়ে ইসলামের বিধি-বিধান এখন তাদের কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে। তারা মনে করছে ইসলাম মানতে গেলে মানব সভ্যতার প্রতিযোগিতায় যেমন টিকে থাকতে পারবে না তেমনি জীবন ও যৌবনকেও ভোগ করতে পারবে না। আর এটি করতে না পারলে জীবনের ষোলআনাই মিছে। অর্থাৎ আগে মুসলিম নারীরা লজ্জার কারণে পর্দা করতো। আর এখন পর্দার কারণে তারা লজ্জা করে। আল্লাহ্র বিধানের অপব্যাখ্যাকারীরা আজ সমাজের বুদ্ধিজীবী। কারণ তারা নারীকে বে-পর্দা করার জন্য বলছে, মনের পর্দা বড় পর্দা। তবে আজকের বাস্তবতা হলো, এমন শায়ত্বানী চিন্তা ও যুক্তি পুরো মানবতাকে উলঙ্গ করে ফেলেছে।

কোনো এক বুযুর্গ একবার এক যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তুমি বিয়ে করছো না কেন? উত্তরে সে জানালো, সস্তায় দুধ পাওয়া গেলে গাভী পালনের কি প্রয়োজন। অর্থাৎ নারী আজ বে-পর্দা হয়ে নিজ শরীর প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যুবকরা তাদের দেখে শুধু কামবাসনা পূরণ করছে না; বরং নিজের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকেও যিনায় লিপ্ত করছে। তথাকথিত সভ্যতার নামে বে-পর্দায় নারীকে রাস্তা-ঘাটে দেখে অতঃপর আজকের যুবকরা রাতের ঘুমকে হারাম করে নির্জনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র নারীর শরীরের সকল উত্থান-পতন জেনে নিয়ে নিজের জীবন ও যৌবন ধ্বংস করে ফেলছে।

মনে রাখবেন, এখানে শুধু কোনো একপক্ষ পরাজিত নয়, উভয়পক্ষ দাম্পত্য জীবনে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্থ। কারণ বে-পর্দার নারীকে যে বিয়ে করবে সে শুধু স্ত্রীর কাপড়ে ঢাকা অংশকেই অরিজিনাল পাবে। তার শরীরের বাকী অংশ তো রাস্তা-ঘাটের মানুষ দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সেকেন্ড হ্যান্ড করে ফেলেছে বহু আগে। আর যে পুরুষ যৌবনে পা রাখার পর হতে অন্য নারী দেখে তৃপ্তি মিটিয়েছে সেও নিজের স্ত্রীকে প্রেম ও আবেগের চোখে দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ্ মানব সম্প্রদায়ের পরস্পরের মাঝে প্রথম যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন তা হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আর সব সম্পর্ক এর পরের সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক যে সম্পর্ক ঝড়-তুফান, রোদ-বৃষ্টি, বন্যা-খরা কোনো মওসূমেই একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারে না। তাই নিজের স্বার্থেই **'পর্দা আমার পরিচয় এবং আমার সৌন্দর্য'** বলে নিজেকে আগামী দিনের স্বামীর জন্য সংরক্ষণ করা উচিৎ। যে নারী এমন করতে পারবেন, তিনিই হবেন স্বামীর আগামী দিনের মূল্যবান সম্পদ।

যুবকদেরকে বলতে চাই, অন্যের মেয়ের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর আগে নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো, কাজে আসবে। কারণ কথায় আছে যেমন কর্ম তেমন ফল। তাই একজন নারীর এমন স্বামী হও যে, কাল নিজের মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে গিয়ে যেন লজ্জায় না পড়ো। নারীদেরকেও মনে রাখতে হবে, দাম্পত্য জীবনে ফেরেশ্তা গুণাবলীর স্বামী পেতে হলে প্রথমেই নিজের ঘরকে জান্নাত বানাতে হবে। কারণ ফেরেশ্তা দোযখে থাকতে পারে না। আর পুরুষ যদি জান্নাতের হুরের চরিত্রের নারীকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায় তাহলে নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানব চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে। কারণ শায়তান কখনো হুর পাবে না।

পর্দা কখন এবং কার কাছ থেকে করতে হবে সেই সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আমার বিভিন্ন বইতে ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে এই সম্পর্কে পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও এখানে সামান্য কিছু কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। শারী'য়াতে পর্দার বিধান উম্মাহাতুল মু'মিনীন হতে শুরু হয়ে উম্মাতের নগণ্য একজন নারীর বেলায়ও হুবহু

বলবৎ থাকছে। তবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে পর্দার বিধানেরও ভিন্নতা রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে কোনো পর্দা নেই। একে অপরকে যেমন ইচ্ছা তেমন দেখতে এবং যখন ইচ্ছা তখন দেখাতে পারবে। নারীদের পরস্পরের মাঝেও পর্দা করতে হবে। অযথা একে অপরকে শরীরের সব অঙ্গ দেখতে বা দেখাতে পারবে না। মাহরাম পুরুষের বেলায়ও ফেত্নার আশঙ্কা থাকলে এখানেও নারীকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তাই বলছিলাম মূলতঃ বিশ্বব্যাপী মানব সমাজে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের একটি দ্বন্দ্ব হলো সভ্যতার দ্বন্দ্ব। সম্প্রতিপুরো শক্তি সামর্থ্য নিয়ে পশ্চিমা জগতের সর্বত্র এটির প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে এমন একটি ভাবধারা সৃষ্টি হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা (Islamists) কট্টরপন্থা এবং ধর্মীয় কারণে তারা পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা এবং সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না। এমন ধারণাও কিন্তু কট্টরপন্থার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটিকে আধুনিক পরিভাষায় Islamophobia বলে। Samuel Huntington তাঁর The Clash of Civilizations নামক বিখ্যাত গ্রন্থে একথারই প্রতিধ্বনী করেছেন। সভ্যতার দ্বন্দ্বের আরেকটি ভয়ানক রূপ হলো, যে সব মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তারাও এখন এমন এক ভয়ের মধ্যে রয়েছে যে, তারা মনে করছে ইসলামী সভ্যতা হয়ত কোনো এক সময় পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভেসে যাবে। পর্দা দিবসটি সেটিরই প্রমাণ বহন করছে।

৯/১১ এর ঘটনাকে পশ্চিমা জগতের কট্টরপন্থীরা ইসলাম নির্মূলের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে পশ্চিমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ৯/১১ এর ঘটনাটি সাধারণ কোনো ঘটনা নয়। এই ঘটনাটি পশ্চিমা জগতে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি ও অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। অতএব পশ্চিমা জগতের জন্য ইসলামই এখন সমস্যা। তাই ইসলাম এবং ইসলামী কর্ম-কান্ড নিয়ে এখন পুনরায় চিন্তা করার সময় এসেছে বলে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখানে যদি বলি তাহলে অন্যায় হবে না যে, তাদের মাঝে এমন চিন্তা এবং ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে উদ্গ্রীব হওয়ার পেছনে অতিউৎসাহী কিছু মুসলমানরাই একমাত্র দায়ি।

কারণ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের কিছু মুসলমানের চিন্তা-চেতনা এবং বিশ্বব্যাপী কর্মপন্থাই পুরো মুসলিম উম্মাহকে আজ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পরিচয় দান করেছে। অথচ এর পূর্বে পশ্চিমা জগতের সাধারণ নাগরিকদের কাছে ধর্ম কোনো বিষয় মনে হতো না। যার যার ধর্ম সে সে স্বাধীনভাবে পালন করবে। এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করতো না। আর তাই কেউ কোনো দিন কারো ধর্ম এবং ধর্মীয় উপাসনালয় নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। এমন এক অনুকুল পরিস্থিতিতে যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছে বা ইসলামকে বদনাম করার চেষ্টা হয়েছে তখনই এর পেছনে খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষের সম্পৃক্ততা দেখা গেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে এই একটি গ্রুপই সব সময় মিথ্যা প্রপাগান্ডা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে এযাবৎ তারা যা করেছে এর সাথে সাধারণ মানুষকে কখনো সম্পৃক্ত করতে পারেনি।

আমেরিকান ইয়াহুদী লবিদের মধ্যএশিয়া নিয়ে তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানা আছে। ইয়াহুদী লবিরা সব সময় ধর্মকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে নিয়েছে। সর্বাবস্থায় এটিকে তারা ইসরাইলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মনে করতো। তাই ইসলামকে তারাও কোনো পয়েন্ট মনে করতো না। তবে আমরা দীর্ঘদিন হতে শুনে আসছি এবং সর্বত্র বলা হচ্ছে যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম বিদ্যুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলামের ছায়া তলে ইউরোপীয়রা দলে দলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এটি যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ইউরোপ ও আমেরিকায় সরকারীভাবে ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। যদি করা হতো তাহলে কোনো ভাবেই ইসলামের এই নব জাগরণ যেমন দেখা দিতো না, ঠিক তেমনিভাবে নওমুসলিমদের লাইনও দীর্ঘ হতো না।

দুঃখজনক হলেও সত্য, ৯/১১ এর পরই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যদিকে সভ্যতার দ্বন্দ্ব অভ্যাসগতভাবে আগেও ছিলো এখনও চলছে। তবে এটি শতভাগ সত্য যে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব যখন যার হাতে থাকে তখন তার প্রভাবে প্রভাবিত থাকে পুরো সমাজ, জাতি ও দেশ। সে তার মত করে জাতিকে দেখতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে ধর্মীয় আচার আচরণ এবং রাষ্ট্রীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও তার

ইচ্ছার বাইরে থাকার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই প্রাচীন যুগের কোনো এক দার্শনিক বলেছিলেন:

(اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ)

'মানুষ তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের ধর্মের অনুগত থাকে।'

আজ পশ্চিমাদের হাতে পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাই তারাই বিশ্বব্যাপী সকল সভ্যতার চালিকা শক্তি হবে এটিই স্বাভাবিক। এই একটি কারণেই আজ পশ্চিমা সভ্যতার ছোবলে শুধু ইসলামী সভ্যতা আক্রান্ত নয়, বিশ্বের সকল জাতি-গোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ ধনী-গরীব সকল মানব বসতি তাদের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত। আমাদের এমন দাবীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ৯০% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের FDC তে গিয়ে দেখে আসুন ষোলআনা টের পাবেন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ আঞ্চলিক পত্রিকার বিনোদনের পাতা উল্টিয়ে দেখুন শতভাগ সত্যতা খুঁজে পাবেন।

ভারতের সিনেমার জগতেরও আজ একই অবস্থা। সেখানেও আপনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি দেখতে পাবেন। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানেও ইংরেজী ভাষা-ভাষীদের দৌরাত্ম্য দেখতে পাবেন। ম্যাকডোলাল্ডের কব্জায় রয়েছে পুরো চীন। সভ্যতার একই চিত্র আজ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। তবে এটি কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নয়; বরং বিশ্বায়নের কবলে পড়ে এখন সবাই নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে বসেছে। কারণ বিশ্বায়নের ছাতার নীচে আশ্রয় নিলে বিশ্বায়নের জ্যাকেট গায়ে দিতেই হবে।

অতঃপর বিশ্বায়নের পরিচয়ে গর্ব করতে হলে বিশ্বায়নের লেবেলে যাই দেয়া হবে তাই বিনা বাক্যে সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। এটিই সত্য এটিই বাস্তব। মনে রাখবেন, এখানে আশ্রয় নেয়ার আগেই এখান হতে পালানোর সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের সকল মত ও ধর্মীয় ভাবধারাকেও বিসর্জন দেয়ার সবক তাদের দেখানো এবং বাত্‌লানো মতে ও পথেই নিতে হবে। তাই এখন অপছন্দ হচ্ছে বলে এবং দুর্গন্ধের কারণে নিজেদের উদগীরণ করারও কোনো সুযোগ নেই।

তবে এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে একমাত্র আঞ্চলিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিই বিশ্বায়নের আগ্রাসী স্রোতের মুখে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে, সভ্যতা মানুষের প্রয়োজনে জন্ম নেয়। মানুষ কখনো সভ্যতার প্রয়োজনে জন্ম নেয় না। এই সভ্যতা কখনো অর্থনৈতিক কখনো আত্মীক আবার কখনো জাতি-গোষ্ঠীর রুচিবোধ ও সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে জন্ম নেয়। এই সভ্যতা আঞ্চলিক মওমুস এবং ভৌগোলিক রীতি-নীতির ধারক বাহক হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক, ও আত্মীক এবং মানসিক ও ধর্মীয় ভাবধারায় জন্ম নেয়া এমন সভ্যতা যুগ যুগ ধরে জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে বেঁচে থাকে। প্রত্যেক সভ্যতা তার জাতির রুচিবোধের ধারক বাহক হয়ে অন্যদের সামনে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তার দেশ ও জাতিকে উপস্থাপন করে।

অতএব যে সভ্যতা মানুষের এসব দিক লক্ষ্য রেখে জন্ম নেয় সেই সভ্যতাই যুগ যুগ ধরে মানুষের মাঝে টিকে থাকে। পরিশেষে এমন সভ্যতার প্রভাবে সাধারণ জনগণও প্রভাবিত হতে থাকে। এমনই এক সংকটময় মুহূর্তে আমরা মনে করি মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আঞ্চলিক এবং সামাজিক বিষয়াদি হতে দূরে রেখে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা অনুচিৎ। কারণ স্বার্থান্বেষী মহলের দেখানো পথে চলতে গেলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে, কোনো এক সময় মুসলমানদের পরিচয় বহনের জন্য তাদের কোনো সভ্যতাই আর বাকী থাকবে না। তাই সময় থাকতেই ইসলামের পতাকাবাহীদেরকে এটি অবশ্যই বুঝতে হবে এবং নতুন করে দেশ ও জাতি নিয়ে ভাবতে হবে। বিশ্বায়নের স্রোতের মুখে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে:

(ক) সিনেমার সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন হতে পারে?
(খ) গান-বাজনা এবং বাদ্য-যন্ত্র হতে ইসলামের দূরত্ব কতটুকু?
(গ) চিত্রকর্ম এবং চিত্রশিল্প সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কি?

তবে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে যারাই কাজ করবেন তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মিউজিক এবং গান-বাজনাকে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾[১০৮]

'আর মানুষদেরই মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মনোমুগ্ধকর কথা কিনে আনে লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহবানকে হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।'

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে সাহাবা এবং তাবেঈদের অনেকেই এটিকে 'গান-বাজনা' বলে রায় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ এবং তাবেঈদের মধ্যে হাসান আল বাসরী।[১০৯]

তাই আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর সমাধানে যতবেশী দেরী হবে তত সুযোগ সন্ধানীরা মুসলমানদের মূলোৎপাটনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে। যেমনিভাবে আমাদের এই শূণ্যতা আজ ভারতীয় ফিল্ম এসে পুরো দেশের সিনেমা হল গুলোকে দখলে নিয়ে ফেলেছে। আর আমাদের যুব সমাজ ভারতীয় সিনেমা দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। তাছাড়া প্রকৃতিরও নিয়ম হলো শূণ্যতা কখনো দীর্ঘায়িত হয় না। এটি সবার অজান্তে কোনো এক সময় পূরণ হয়েই যায়। এটি না বুঝে শুধুমাত্র ইসলামের অপব্যাখ্যা করা হলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ ক্ষতিগ্রস্থ হবে শুধু তাই নয়; বরং যুব সমাজও ভুল বুঝে ইসলামকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে ফেলবে।

অতএব এবিষয়ে অলসতা বা শীথিলতা দেখালে ভারতীয় অপসংস্কৃতি এবং হিন্দি সিনেমা পুরো দেশ ও জাতিকে দখলে নিয়ে ঈমান হারা করে ফেলবে। এর দায়ভার আমাদের আলেম সমাজ কোনো ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারবেন না। হয়ত আমরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রাজ পথ কাঁপিয়ে তুলতে পারবো। সরকারও হয়ত কোনো এক সময় বিশেষ করে ভোট ঘনিয়ে আসলে এসব বন্ধও করে দিতে পারে। কিন্তু সিডি ও

১০৮- সূরাতু লোক্বমান, আয়াত নং-৬

১০৯- বিস্তারিত দেখুন : উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা 'তাফসীর ইবনে কাসীর'।

ইন্টারনেট আপনি কীভাবে বন্ধ করবেন? আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন হতে আগামী প্রজন্মকে কীভাবে বাঁচাবেন?

কারণ বর্তমান যুগ হলো প্রযুক্তি নির্ভর যুগ। উন্নতি ও অগ্রগতির চুড়ায় উঠার যুগ। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিত্য-নতুন টেকনোলজি, উন্নত প্রযুক্তি ও মিডিয়ার যুগ। তাই এই যুগের মানুষরা আজ এসব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। প্রতি মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশ হতে আকাশের শেষ সীমানায়। তবুও যেন চৈত্রের তৃষ্ণার্ত কাকের মত ফিরে আসছে পৃথিবীর বুকে। কোথাও যেন অপরিপূর্ণ কিছু রয়ে গেল। পরিবর্তন এসেছে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে। পাল্টে যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্র ও চিত্র। পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ এই গুলোর প্রভাবে দিন দিন প্রভাবিত হচ্ছে। পুরাতন প্রযুক্তি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নতুন প্রযুক্তির জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে কোনো এক অজানার পথে পাড়ি জমাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে আজ নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবই ঝুঁকে পড়ছে এর দিকে। আলিঙ্গন করে নিচ্ছে বুক উজাড় করে। এর ব্যবহারে গর্ব অনুভব করছে সবাই। নিজেকে মনে করছে একজন সফল ব্যক্তি। মূল্যায়ন করছে আধুনিক যুগের মানুষ হিসেবে।

এখানেই শেষ নয়, এগুলো ছাড়া নিজেকে যেন অসহায় মনে করছে। এই যুগের মানুষ প্রচার মাধ্যম গুলোতে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে। *Satellite Media* ডিশ ও *Internet* নর-নারী, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদেরকে আজ তার প্রেমের শৃংঙ্খলে আবদ্ধ করে লায়লী-মজনুর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। এগুলোর প্রেমে পড়ে তারা নিজেদের পরিচয় ভুলে গিয়ে নাচতে শুরু করেছে দিনে-দূপুরে, রাস্তা-ঘাটে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়। আধুনিকতার পরিচয় ঘটানোর জন্য উপযুক্ত ভাই ও বাবার সামনে প্রেমিকের হাত ধরে রাতের আঁধারে নয়, দিনে-দুপুরে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভাইও তাই মা ও বোনের সামনে প্রেমিকার বুকে মাথা রেখে নিজের জীবনের স্বার্থকতা প্রমাণ করছে।

কারেন্টের তারের মাধ্যমে সমাজের ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার বাসা-বাড়ীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে ছোট পর্দায় ভেসে উঠে তাদের নগ্নতা সম্পর্কে অবগত করছে বাসার ছোট-বড়, মা-বাবা,ভাই-বোন,

সবাইকে এক সাথে। এভাবে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে আমাদের বাসা বাড়ীতে পাশ্চাত্যের উলঙ্গ সভ্যতা প্রবেশ করে সবার সামনে ছোট পর্দায় নিজেদের নগ্ন দেহ পরিবেশন করে পরিবারের নারী-পুরুষের মাঝের দূরত্ব ও ব্যবধানকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। তরুণীরা সেই পাশ্চাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের পরিচয় ভুলে গিয়ে মডার্নিজমের নামে নাচতে শুরু করেছে সবার সামনে। আর যুবকেরা বিবস্ত্র নারীর যৌবনের সুধা পান করার জন্য যেখানে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারীর উপর। খামচে খেতে চাচ্ছে নারীর নরম দেহ। কারণ যুবকের মাথায় সারাক্ষণ ঘুর পাক খাচ্ছে নারী ও তার আকর্ষণীয় শারীরিক কাঠামো। যেহেতু নারী আধুনিকতার নামে মাতা-পিতা, ভাই-বোন কাউকে পরোয়া না করে প্রেমিকের হাতে হাত রেখে রাতের আঁধারে নয়! দিনের আলোতেই ঘর হতে বের হয়ে পড়ছে সেহেতু এখানে পরিণতি খারাপ হলেও দঃখ করার কিছু নেই।

তথাকথিত পশ্চিমা সভ্যতার স্বাদ এবং নারী স্বাধীনতার নামে তরুণ-তরুণী হারিয়ে যাওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারে কোনো গোপন স্থান ও নির্জন কক্ষের প্রয়োজন অনুভব না করে দিনে-দুপুরে শুধু পার্কের গাছ তলায় নয়; বরং লক্ষ মানুষের চোখের সামনে রাস্তা ঘাটকেই যথেষ্ঠ মনে করছে। তার একটি বাস্ত চিত্র আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবর, ঢাকা ভার্সিটির মাসজিদের চার পাশ ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীসহ ইডেন কলেজের সামনেই দৈনিক দেখা যায়। পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রের চিত্র লজ্জা ও শালীনতার চাদর গায়ে থাকার কারণে উল্লেখ করতে পারছি না। শুধু এই টুকু বলতে চাই, কখনো কখনো ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের সহায়তায় স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত জাতির ভবিষ্যৎকে ধরে নিয়ে এসে প্রকাশ্যে কান ধরে উঠ বস করিয়ে তাদের মা-বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের সম্মানিত মা-বাবারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের এসবকে দুষ্টুমী মনে করে ব্যভিচারের রাস্তা উন্মুক্ত রেখে পড়া-শোনা শেষ করা এবং স্টাবলিস্টের নামে বিয়ের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। তাই ভাই তার গর্ভধারিনী মাকে উপেক্ষা করে এবং উপযুক্ত বোনের সামনে

প্রেমিকার বুকে মাথা রেখে নিজের জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে বের করছে। কারণ নিজেদের বাসায় পরিবারের সবার সাথে একত্রে বসে ছোট পর্দায় নারীর আকর্ষণীয় দেহ ও নারী শিকারের পদ্ধতি শেখার পর সে আজ দিশেহারা। চোখের ঘুম হারাম করে মাতালের মত পড়ে থাকছে বিছানার উপর অথবা ভবঘুরের মত এখানে সেখানে ঘুরছে আর কোনো নারী দেখা মাত্রই বলে উঠছে **"চলনা হারিয়ে যাই"**।

কখনো তার এই আহবান মা-মেয়ে এক সাথে শুনছে আবার উপযুক্ত ভাই ও বাপের সামনে মেয়ে, আবার কখনো মা তার উপযুক্ত ছেলের সামনে শুনছে। কারণ সে এখন নারী ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। তাই নারী ভোগের পথ ও পন্থা খুঁজতে থাকে সারাক্ষণ। সাথে যোগ হচ্ছে রাস্তা-ঘাটে বে-পর্দার নারীর অশালীন কাপড়ে খোলা পেট ও পিঠ। যেন কিছু তার কাপড়ের ভিতরে থাকতে চাচ্ছেনা। যা দেখে যুবকের শরীর শিহরিয়ে উঠে। নারীর এহেন অবস্থা দেখে তারুণ্যে পা রাখার পূর্বেই কিশোররা পর্যন্ত নারীর অঙ্গের দিকে তৃষ্ণার্ত কাকের মত চেয়ে থাকে। পথে ঘাটের শ্রমজীবী এবং চলন্ত পথের পথিকের কথা আর বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফী বছর আমাদের উঁচু শ্রেণীর যুবকরা যৌবন সমুদ্রে নব-বর্ষ উদযাপনের নামে তরুণী শিকারের জাল নিয়ে রাতের আঁধারে নেমে পড়ছে অভিজাত এলাকায়। আর সেই জালে কোনো তরুণী অসতর্কতায় ধরা পড়ার পূর্বেই আমাদের বাঁধনরা রাতের আঁধারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেই ইয়াবা ও ভায়াগ্রা খেয়ে নারীর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়া উচ্ছৃঙ্খল যবুক ও মাতালদের বাহুতে যখন নিজেকে তুলে দেয় তখন ঐসব মাতালরা বাঁধনদেরকে ভোগের জন্য তো ঝাঁপিয়ে পড়বেই। অথচ এরা এতদিন যাবত শুধু বাঁধনদের অশালীন পোশাক দেখে চোখ জুড়াচ্ছিল তার ভিতরের রক্ষিত নারী সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেই দিন আমাদের বাঁধনরা সেই কাজটিও অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে করে নারী জাতির বারটা বাজিয়েছে। এখন আমরা কার চরিত্র নষ্টের মাতম করবো তরুণ না তরুণীর? মায়ের না বাবার?

নববর্ষ উদযাপনের নামে আজকের তরুণীরা বিয়ের পূর্বেই নারীর কোথায় কি আছে যুবকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। তাই এক বাঁধনের বাঁধ খুলে যাওয়ায় সকল বাঁধনের গোপনীয়তা মুহূর্তের মধ্যে মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজের ছোট-বড় সবার হাতে হাতে পৌঁছে গেল। জাগিয়ে তুললো তরুণ মন। মুহূর্তের মধ্যে নাড়া দিয়ে গেল তার দেহ ও দেমাগকে। ভাবতে লাগলো নারীর শরীর নিয়ে। করতে লাগলো নারী ভোগের সকল অসৎ পরিকল্পনা।

ঢাকার ইডেন কলেজের সামনের যে অসভ্য চিত্র ভাই যখন তার ছোট বোনকে স্কুলে দিয়ে আসতে বা নিয়ে আসতে যায়, পিতা যখন তার শিশু কন্যাকে নিয়ে রাস্তা পাড়ি দেন তখন তারা যখন জিজ্ঞেস করে আব্বা এরা এখানে কি করছে? আব্বা ও বড় ভাই যে কি লজ্জাকর অবস্থায় পড়েন তা পাঠক এই প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারবেন না। শুধু ভুক্তভোগী মা-বাবা, ভাই-বোনই এই লজ্জাজনক অবস্থা বুঝতে পারবেন। নারীরা তাদের শারীরিক স্পর্শকাতর অঙ্গ গুলো এমন ভঙ্গিতে তরুণদের সামনে প্রকাশ করছে যা দেখে তরুণদের জিভে তখন পানি এসে যায়। তাই সে সমবয়সি কোনো তরুণীকে নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার জন্য সময় ও সুযোগ খুঁজতে থাকে সারাক্ষণ।

তাই পড়া-শোনা ছেড়ে দিয়ে কখনো কোনো গার্লস স্কুলের সামনে, আবার কখনো মহল্লার গলির মুখে, অথবা বাসা-বাড়ীর ছাদে তৃষ্ণার্ত কাকের মত ঘুর ঘুর করে কাউকে খুঁজতে থাকে। আবার কখনো অধীর আগ্রহে তার বাসায় কোনো তরুণী আত্মীয়ার আগমনের অপেক্ষায় থাকে। কখনো আপন বোনকেই বলে তার কোনো বান্ধবীকে দাওয়াত দিয়ে বাসায় নিয়ে আসতে। আবার সুযোগ আসতেই পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটিকে কোনো এক পরিচিত আওয়াজের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি ও অপেক্ষার কথা জানিয়ে দেয়। বিকালে পার্কের গাছ তলায় গিয়ে কখনো স্মার্ট হয়ে কাউকে প্রেমের জালে বন্দি করার জন্য, আবার কখনো অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো তরুণীর করুণা পাওয়ার জন্য।

অন্য দিকে তার মত অনেক তরুণীও যুবকদের বাহুতে শান্তির ছোঁয়া পাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে ঘর হতে। যদিও সে তরুণী বহু বাহুর ছোঁয়ায় আজ কাতর। তবুও নিত্য নতুন ছোঁয়া পাওয়াই তার জীবনের

সকল চাওয়া পাওয়া। এসবের *Practical* চাবি-কাঠি একটিই, আর তাহলো আধুনিক প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়ায় প্রচারিত সিনেমা-নাটক। ব্যবসায়িক পণ্যের বিজ্ঞাপনেও নারীর রূপ, চুল, দাঁত, শারীরিক গঠন এমনকি বিশেষ সময়ের ব্যবহৃত সেফটি প্যাড, জন্মনিয়ন্ত্রনের কনডম ও পিলসহ আরো কত কি আলোচনা বাসার মিনি সিনেমায় দেখে ও শুনে তখন যুবকের মাথায় সারাক্ষণ নারী ভোগের চিন্তা ঘুর পাক খাওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া তথাকথিত কবি সাহিত্যিকদের নভেল নাটক তার *Theoritical* কাজ করছে, যেগুলো শুধু কল্পিত নারী, নারীর শারীরিক গঠন ও তার মন এবং নারী অঙ্গের গুণ কীর্তনসহ প্রেমের পদ্ধতি নিয়ে রচিত হয়েছে। আর এসব কল্পিত উপন্যাস আমাদের যুব সমাজকে এমনভাবে প্রভাবিত করার কারণে ভাই-বোন সমান তালে এইগুলো উপভোগ করছে। একে অপরকে এই সব অসভ্য উপন্যাস শুনাচ্ছে। ভাই তার বোনের জন্ম দিনে, আর বোন তার ভাইয়ের পরীক্ষা পাশের সারপ্রাইজ নাম দিয়ে চরিত্র ধ্বংসের এসব আবর্জনা কিনে এনে মা-বাবার সামনে পড়তে শুরু করেছে। পরিশেষে ভাইও তার বোনের বান্ধবীর সাথে, আর বোন নিজ ভাইয়ের বন্ধুর সাথে প্র্যাক্টিস করার জন্য সবার সামনে ফ্রি মাইন্ডের নামে ঘর হতে বেরিয়ে পড়ছে। কত নির্লজ্জ আমরা ও আমাদের সমাজ!!

ভাই তার বোনের বান্ধবীর মধু আহরণে, আর বোন তার ভাইয়ের বন্ধুর যৌবনের বাহুতে *Free Mind* নাম ব্যবহার করে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে *Practical Practice* শুরু করে দিয়েছে সবার সামনে। আর আমাদের অপদার্থ মা-বাবারা এসবকে উদারতা ও আধুনিকতার নামে গর্ব ও আনন্দের সাথে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এভাবেই তরুণ-তরুণী পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত হলে অবৈধভাবে একে অপরের সুধা পান করে যৌনক্ষুধা মিটিয়ে চলছে। এই হলো আমাদের সমাজের আধুনিকতা? এই হলো আজকের মডার্নিজন এবং নারী স্বাধীনতার নমুনা ও বাস্তবতা। ছি... ছি....আমাদের এই পরিণতি?

এরাই নাকি আবার সমাজে নারী অধিকার এবং নারীর হক্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ এধরনের মা-বাবারা তো সেই দিনই নিজের মেয়ের হক্ব নষ্ট করেছে

যে দিন শিক্ষার নামে তাকে বে-পর্দায় ঘরের বাইরে পা রাখতে সুযোগ করে দিয়েছে। অতএব আজকের নারী অধিকার বঞ্চিত হওয়ার পেছনে তাদের মা-বাবা, ভাই ও স্বামীই দায়ী। তার দুন্ইয়া ও আখেরাত হারানোর পেছনে সব চেয়ে বড় ভূমিকা এরাই পালন করছে।

অথচ আজকের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে মানব সমাজ জীবনের সর্বস্তরে একটি উপযুক্ত স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছে। দূর হয়েছে বহু অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী। জ্ঞান ভান্ডারের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে খুব সহজেই। ধরা পড়েছে নিজেদের জ্ঞানের পরিধি ও সীমারেখা। বুঝতে শিখেছে নিজের অজ্ঞতা ও মুর্খতা। পরিষ্কার হয়েছে অক্ষমতা ও অপারগতা। দূর হয়েছে শিক্ষার জগতে সকল দুর্বলতা। জাগরিত ও মূখরিত হয়েছে নতুন নতুন চিন্তা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। আবিষ্কার হয়েছে প্রচার ও প্রসারের নতুন পদ্ধতি ও এক বিশাল দিগন্ত। মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়েছে অঞ্চল ও রাষ্ট্র, জাতি ও গোষ্ঠীর মাঝের ভৌগোলিক দূরত্ব।

মোট কথা, বর্তমান যুগোর ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় করে ফেলেছে। তাই আজ তার চাকচিক্যে সবাই দিশেহারা। তার রঙে সবাই নিজেকে রাঙ্গাতে চায়। কোনো পার্থক্য করার প্রয়োজন মনে করছে না কেউ। অথচ ইসলাম এসেছে সমাজের সকল অস্পষ্ট ও প্রচলিত রঙ পাল্টিয়ে সমাজ ও জাতিকে তার উজ্জল রঙে রাঙিয়ে দিতে। ইসলামের দাবী হলো তার রঙের চেয়ে উত্তম কোনো রঙ নেই বা হতেও পারে না। এমনকি এর বাইরে কেউ তা খুঁজেও পাবে না। পবিত্র ক্বোরআন এই সম্পর্কে পরিষ্কার ঘোষণা করেছে:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ﴾[১১০]

'আল্লাহর রঙ গ্রহণ করো, আর কার রঙ তার চাইতে উত্তম?'

ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। সমগ্র মানব জাতির জন্য ইসলামের আগমন ঘটেছে এই পৃথিবীতে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই কথাটি

১১০- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৩৮।

ক্বোরআনে উল্লেখ করেছেন এবং অত্যন্ত পরিষ্কার করে মানব জাতিকে তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ﴾[১১১]

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'

পবিত্র ক্বোরআনের এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনিত ধর্ম। বিশ্বধর্ম ও *Universal Truth* হিসেবে এই দুন্‌ইয়ায় ইসলামের আগমন ঘটেছে। মানবীয় ছোট-বড় সকল বিষয়ের সমাধান রয়েছে তার আঙ্গিনায়। সেখানে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর যেখানে মানব সন্তান রয়েছে সেখানেই ইসলাম বিশ্বধর্ম হিসেবে মানবতাব মুক্তির সনদ নিয়ে হাজির হয়েছে।

এই জন্যই ইসলামের ধারক বাহকদের কাছে তার দাবী হলো, ইসলামের পয়গাম সঠিক স্পিরিটের সাথে সবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যবহার করতে হবে উন্নত প্রযুক্তি ও সকল প্রকারের আধুনিক টেকনোলজি। ইসলামে মানব জাতির সম্মান ও গুরুত্ব, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, রাসুলুল্লাহ্ (স.) এর রণ কৌশল ও যুদ্ধনীতি সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর চেয়ে উত্তম আর কোনো কথা ও কাজ হতে পারে না। মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দা'ওয়াত তুলে ধরে ইসলামের উপযুক্ততা প্রমাণ করার সকল পদ্ধতি অবলম্বন করাই হলো একজন দা'ঈর ঈমানী দায়িত্ব। ক্বোরআন রাসূলুল্লাহ্‌কে দা'ওয়াতের পদ্ধতি এভাবে বাত্‌লাতে দিয়েছে:

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾[১১২]

'হে নাবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন, এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম

১১১- সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯।

১১২- সূরাতুন নাহ্‌ল, আয়াত নং-১২৫।

পন্থায়। আপনার রাব্বই ভালো জানেন কে তাঁর পথচ্যুৎ হয়ে আছে এবং কে সঠিক পথে আছে।'

কোনো মুসলমান দা'ওয়াতের কাজ না করে আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত পাওয়ার আশা করতে পারেনা। কারণ এটি প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এটি কোনো দল বা গোষ্ঠীর কাজ নয় এটি প্রত্যেক মুসলমানের কাজ। একজন মুসলমানের দুন্‌ইয়ার জীবনের দায়িত্ব বলতে গিয়ে ক্বোরআন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[১১৩]

'এখন তোমরাই (মুসলমান) দুন্‌ইয়ার সর্বোত্তম দল। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। এই আহ্‌লে কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।'

বর্তমান বিশ্ব আজ অত্যাধুনিক মিডিয়ার জগতে প্রবেশ করেছে। অজানা আরো অনেক প্রযুক্তি মানব সমাজে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। আজকের শিশুরাও ব্যবহার করছে আধুনিক প্রযুক্তি। মুহূর্তের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তের খবর। এক জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৌঁছে যাচ্ছে হাজারো গোত্র ও জাতির ঘরে। বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির নিত্য নতুন কলা কৌশল। পৃথিবী আজ এইযুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রবেশ করছে নতুন এক জগতে। নিজেকে তুলে দিয়েছে সেই প্রযুক্তির হাতে। তার জালে আটকে পড়ে বিলীন করে দিচ্ছে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের অস্তিত্বকে। তার স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে। এই জালটি সকল প্রযুক্তি হতে উন্নততর ও আধুনিকতর। যার স্রোতের ধারা খুবই শক্তিশালী। যাকে বর্তমান

১১৩- সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং-১১০।

সমাজের ছোট বড় সবাই এক নামে চিনে ও জানে। তার নাম হলো *Internet*।

ইন্টারনেট আজ সমগ্র পৃথিবীকে একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলেছে। যার অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, সামান্য পড়া-লেখা জানা লোকও এই জালের ছোট-বড় সকল মাছ যে কোনো মুহূর্তে সে ধরতে সক্ষম। *Internet* ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই পাশ্চাত্যের লাইব্রেরীর সকল তত্ত্ব ও তথ্য ঘরে বসেই জানতে পারে। প্রয়োজন হতেই ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার সকল লাইব্রেরীর সকল তথ্য সংগ্রহ করতে সে সক্ষম। মানব ও দানব সংক্রান্ত সকল বিশ্বকোষের পাতা উল্টানো ঘরে বসেই সম্ভব। পৃথিবী, দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতিতে এটি এক বিশাল ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রেই এই জাল আজ বিস্তৃত। এরই সাহায্যে গড়ে উঠছে উন্নত হতে উন্নততর সমাজ ও সোসাইটি। উপহার দিচ্ছে উত্তম একটি জাতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কিন্তু এত সব উপকারিতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, *Internet* হলো একটি ধারালো তলোয়ার। যদি এর ব্যবহার কারীরা তাকে কাটতে না পারে, তাহলে তাদের অলসতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে সে-ইতার প্রেমিক ও প্রেমিকাদেরকে কেটে দ্বীন-ধর্ম ও মানব সমাজের সকল রীতি-নীতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবীর সকল জাতি ও গোত্রকে একসাথে হত্যা করতেও সে কখনো কুণ্ঠাবোধ করবে না। তবে এই গণহত্যায় তার হাত কখনো কারো রক্তে রঞ্জিত হবে না। তার কাপড়ে কারো রক্তের দাগ পড়বে না। কোনো নদীর পানি কারো রক্তে লাল হবে না। লাশের দুর্গন্ধে পরিবেশও কখনো দূষিত হবে না। তবুও সমাজ ও জাতি একত্রে দূষিত হবে। জীবিতরাই মৃত বলে পরিগণিত হবে। একে অপরকে দেখে নাক ছিটকাবে। চক্ষু এমনিতেই বন্ধ হয়ে আসবে। নাকে রুমাল চেপে ধরে দূর হও দূর হও বলবে। আর সেই *Internet* দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে এবং হাসবে আর বলবে খু...উ ব....ই....ম...জা।

এভাবে একদিন এই পৃথিবীতে সভ্য বলে কোনো জাতির অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বন্যপ্রাণীরা যেমন যেখানে সেখানে যৌন তাড়নায় অন্য

প্রাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সবার সামনে কামনা চরিতার্থ করে লজ্জাহীন ভাবে, মানব নামক জীবগুলোও তাদের কান্ড দেখে লজ্জায় মাথা নত করে পথ চলা শুরু করে আমাদের সমাজেও ঠিক একই অবস্থা হতে যাচ্ছে। কেননা ইন্টারনেট যেমন উন্নতি ও অগ্রগতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম, ঠিক অনুরূপভাবে এটি মানব সমাজের চরিত্র বিধ্বংসী একটি ভয়ানক ফাঁদও বটে। ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক বাধা বিপত্তি ও সর্ব প্রকারের শৃংখলা ছিন্ন করার এটি একটি ধারালো অস্ত্র। তাই বলছিলাম, মুসলিম উম্মাহ্কে মনে রাখতে হবে, সালাত একজন মু'মিনের জীবনে দৈনিক পাঁচ বার ফার্য হলেও নৈতিক চরিত্র বজায় রাখা মুসলিম উম্মাহ্র প্রত্যেক নর-নারী যতক্ষণ বেঁচে থাকবে তার জীবনে ততক্ষণ ফার্য। এ ব্যাপারে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

এটি না বোঝার কারণে ইন্টারনেট তার আশ্চর্যজনক মো'জেযা ও রঙ বে-রঙের প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানব সমাজকে দিনে দুপুরে সবার সামনে দিগম্বর করে ফেলছে। বিশেষ করে নারীর মাথা হতে পা পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের একটি লোলুপ চিত্র যুবকদের অন্তরে অংকন করে যাচ্ছে। আর এই ভাবে নারীর শরীরকে খামচে খাওয়ার জন্য প্রত্যেক তরুণকে উৎসাহিত করছে।

শুধু তাই নয়; এই Device বা যন্ত্রটি মানব জীবনের সকল দিকের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। তাই বয়সের ভেদ-বিচার, দেশ-জাতি, দ্বীন-ধর্ম, গোষ্ঠী ও বর্ণ ছাড়া সবার অন্তরে নিজের প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সমান তালে। আর এই প্রেমের আগুন আজ তুষের আগুনের মত মুসলিম-অমুসলিম সবার অন্তরে জ্বলছে। এই একটি কারণেই আজ মানব সমাজ ও চরিত্রে ঘুণে ধরেছে।

এইভাবে একদিন ঘুণে খাওয়া কাঠের মত মানব সমাজের শৃংখলা সবার অজান্তে ভেঙ্গে পড়বে। কারণ তার প্রেমিকরা দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে তার প্রেমের বাগানে। আবার কেউ কেউ তার প্রেমের সুধা পান করছে দিনের পর দিন। আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে ৯০% মানুষ বলে উঠবে *Internet* হতে আজকের যুব সমাজের সিংহ ভাগ কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করছে না। উল্টো কু-শিক্ষা ও চরিত্র ধ্বংসের সকল কিছুই

সময়ের পূর্বে শিখে নিচ্ছে। শিক্ষার সকল বিভাগকে তারা কোনো বিভাগই মনে করছে না; বরং সময় নষ্ট বলে অভিহিত করছে। আন্তর্জাতিক বিষয়ে গবেষণা ও গঠনমূলক কোনো প্রোগ্রামই কাজে আসছে না। তারা তাদের অর্ধেক সময়েরও বেশী সময় কাটাচ্ছে এই প্রেমিকার ভুবনে।

অথচ তারা বুঝতেছে, এখানে শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। তবুও তারা এই অঙ্গনে সাময়িক আনন্দ ও স্ক্রীনে নারী ভোগের জন্য নিজের জীবনকে অবমূল্যায়ন করে নষ্ট করছে একটি মহা মূল্যবান জীবন। এই বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে *Internet* ব্যবহারকারীদের দরজার কড়া নাড়াচ্ছে। ইন্টারনেটের প্রেমে পড়ে আজকের মুসলিম উম্মাহ্‌র সন্তানরা ছাড়ছে দৈনন্দিন ইবাদাতসহ সালাত ও সাওম। নষ্ট করছে এমন মূল্যবান সময় যার মাধ্যমে সে উপকৃত হতে পারতো, গড়তে পারতো একটা উন্নত ভবিষ্যৎ। পরিবর্তন আনতে পারতো নিজ পরিবার ও সমাজে। আবার কখনো বিশ্ব আন্দোলিত হতো তার অবদানে।

অথচ এমন একটি জীবন হারিয়ে যাচ্ছে কোনো এক অজানা সমুদ্রের অতল গভীরে। কোথায় গিয়ে শেষ হবে এই জীবন? কে দেখাবে তাদেরকে সঠিক পথ? কীভাবে পাবে তারা সিরাতে মোস্তাক্বীমের সন্ধান? এই ইলেক্ট্রনিক প্রেমিকার ফাঁদে পড়ে যুবক হারাচ্ছে তার স্বাস্থ্য। তরুণ হারাচ্ছে তার দৃষ্টি শক্তি। আর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একসাথে হারাচ্ছে মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ "লজ্জা"। সমগ্র মানব জাতির সামনে দিনে দুপুরে তাদের লজ্জা শরমকে একই স্থানে একই রশিতে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আকাশ বাতাসের কেউ এই গণহত্যায় ব্যাথিত হচ্ছে না। এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরছে না কারো নয়নের। যেন সমগ্র পৃথিবী আজ এক পাষাণে পরিণত হয়েছে। পাথরেরও যদি অন্তর থাকতো তাহলে মানব শক্তির এই হত্যাযজ্ঞ দেখে ফেটে পড়তো তার অন্তর।

শুধু তাই নয়, এই বৈদ্যুতিক প্রেমিকা তার প্রেমিকের সকল মধু চুষে খেয়ে প্রেমিককে ফাক্বীর ও মিস্‌কিন বানিয়ে অন্যের দুয়ারে হাত বাড়াতে বাধ্য করছে। কারণ তার প্রেমে পড়ে সে উপার্জনের ক্ষমতা ও সাহস হারিয়ে ফেলেছে। কর্মহীন ও মানব সমাজ হতে সে আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পরিশেষে পরনির্ভরশীল, অপদার্থ জীব ও সমাজের একটি বোঝা

হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকে। আর তাই **রাসূলে আরাবী** (স.) মানব জাতিকে চৌদ্দশত চল্লিশ বছর পূর্বে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)[১১৪]

'ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.)একজন লোককে নাসীহাত করতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি সময় থাকতে গুরুত্ব প্রদান কর:

১. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের।
২. রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বস্থ্যের।
৩. দরিদ্রতা আসার আগে সচ্ছলতার।
৪. ব্যস্ত হওয়ার আগে অবসরের।
৫. মৃত্যু আসার আগে জীবনের।'

উপরোক্ত হাদীসটি আমানাতদারীর সাথে পড়ে ইন্টারনেটের সাথে তুলনা করে দেখলে যে কেউ দেখতে পাবে যে, ইন্টারনেট মানব শরীরের বহু শক্তি যেমন ধ্বংস করে দিচ্ছে, তেমনিভাবে মানবচরিত্রের সকল দিকও নষ্ট করে ফেলছে। আমরা মনে করি অপ্রাপ্ত তরুণী রেপিংয়ের শিকার হওয়ার পেছনেও ইন্টারনেটের ভূমিকা রয়েছে। মা-মেয়ে এক সাথে একই যুবকের প্রেমের আহবান শুনছে। পার্থক্য করছেনা মা-মেয়ে ও ভাই- বোনের মধ্যে।

যেনা-ব্যভিচার যেন কোনো বিষয়ই না। পাপাচার ও অনাচার এখন সবার কাছে একটি সাধারণ এবং সহনীয় ব্যাপার হিসেবে দাঁড়িয়েছে। লজ্জা-শরম হয়ত কোনো এক কালের কোনো এক অজানা বংশের পরিচয় ছিল। সেই বংশের মৃত্যুতে যেন লজ্জা-শরমেরও মৃত্যু হয়েছে। লোক চক্ষুর অন্তরালে গভীর অন্ধকার রাত্রিতে কোনো এক অজানা করস্থানে দাফন করার কারণে

১১৪- المستدرك على الصحيحين، كتاب الرقاق، رقم الحديث: ٧٩٥٧ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ)

কেউ আজ সেই লজ্জা-শরমের কবরের সন্ধানও দিতে পারছে না। বর্তমান পৃথিবীর কেউ বলতেও পারছে না তাদের কবর কোথায়? যদি কেউ তাদের কবরের সন্ধান দিতে পারতো তাহলে হয়ত কেউ সেখান হতে কিছু হাওয়া বাতাস বোতলে ভরে নিয়ে আসার অমূলক চেষ্টা করতো আর তা বর্তমান সমাজে ছেড়ে দিয়ে পরিবেশ রক্ষার অপপ্রয়াস চালাতো। হয়ত সে তার রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে লজ্জা-শরমের ফ্যামিলির জন্য মানব সমাজে পুনরায় একটি প্লট বরাদ্দের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতো। এইভাবে সে নতুন প্রজন্মকে ইন্টারনেটের বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা হতে রক্ষা করার চেষ্টা করতো। যার স্ক্রীনে নারী সারাক্ষণ তার যৌবনের শরীরের প্রদর্শনী করে চলছে। নারীর বিশেষ অঙ্গ নগ্ন ও অর্ধ নগ্ন হয়ে নাচতে থাকে। আকৃষ্ট করছে যুব সমাজসহ বিভিন্ন বয়সের পুরুষকে।

আন্তর্জাতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের সামনে প্রকাশ হয়েছে যে, শতকরা ৪৩% ইন্টারনেট ব্যবহার কারীর বয়স ২০-২৯ বছর। ৩৭% ভাগের বয়স ১৪-১৯ বছর। ২০% ভাগের বয়স ৩০ উর্ধে। ৩৭% ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। ১৮% ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। ৫% ভাগ ডিপ্লোমা ৪% ভাগ উপযুক্ত। ৮০% ভাগের বয়স ত্রিশ বছরের কম। ২৭% ভাগ পুরো সময় কাটায় ইন্টারনেটের সামনে। ৬৮% ভাগ মানুষ চার ভাগের এক ভাগ সময় কাটায় ইন্টারনেটের আঙ্গিনায়। আর অবশিষ্ট লোকেরা দৈনিক দশ ঘন্টা কাটায়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের এই সমীক্ষা আরো ১৫ বছর পূর্বের।

উল্লেখিত সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা যা বুঝতে পারলাম তা হলো, যেহেতু তারা এখানে সময় কাটাচ্ছে, অতএব পরিবার ও সমাজের সাথে এদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এভাবে আজকের যুবকরা ইন্টারনেটের যৌন সুড়সুড়িমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে গিয়ে সমাজ ও পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। উঁই পোকা যেমন নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে একটি যুবক তার সকল দায় দায়িত্ব ফেলে পড়া-শোনা ত্যাগ করে ইন্টারনেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ইসলাম, ঈমান, আক্বীদাহ্ ও ইবাদাহ্সহ সামাজিক আচার আচরণের দাবীতো তার কাছে এখন কাল্পনিক ও অবাস্তব একটি দাবী ছাড়া আর

কিছুই নয়। আমার এ বক্তব্য কোনো গাল গপ্প নয় বাস্তব সত্য। সন্দেহ হলে যে কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন। Cyber Cafe গুলোতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন। গত কয়েক বছর আগে আমার এক নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে গিয়ে এর বাস্তবতা খুঁজে পেলাম। কনের বাসার একটি ছেলে কম্পিউটার নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলো যেন সে জানেই না যে, আজ তার বড় বোনের বিয়ে। বর আসছে সঙ্গী সাথী নিয়ে। হৈ চৈ হচ্ছে, বরযাত্রীদের সাথে গেইটে প্রবেশের সময় বখশিশ দেয়া নেয়া নিয়ে হৈ হট্টগোল হচ্ছে যা বিবাহ অনুষ্ঠানের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অতঃপর এটি দাও, ঐটি নাও, এখানে বস, ঐখানে যাও, খাওয়ার সময় নতুন বউয়ের সাথে বর পক্ষের মেয়েদের বসানো নিয়েও হৈ চৈ শুরু হলো। আবার রাত তিনটায় যখন বাসর ঘরের দরজায় পুনরায় বখশিশের জন্য মেয়েরা ফিতা দিয়ে বরকে আটকে রাখলো এদিকে আমরা ঘুমে কাতর সকল বিপদের ঘাট হতে বরকে উদ্ধার না করে আসতেও পারছি না, তাই রাগে ধাক্কা দিয়ে সবাইকে ফেলে দিয়ে বরকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয়াতে কনে পক্ষের অনেকে মনে কষ্টও পেয়েছেন। যেহেতু আমি নিজেও বরের ভগ্নিপতি তাই সম্পর্কটা অত্যন্ত নাজুক হওয়াতে কেউ কিছু বললেন না তবে চোরের কিল মতনে খাওয়ার মত সবাই চুপ থেকে গেলেন। অথচ এসব কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। যেন সে অন্য কোনো জগতের মানুষ, এসবের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

ইন্টারনেটে কি হচ্ছে আর তরুণ-তরুণীরা কি করছে? তা *Internet* খুললেই বুঝতে পারবেন। তরুণী খুঁজছে হ্যান্ডসাম এক যুবককে, আর যুবক খুঁজছে তেমনই এক তরুণীকে। এরই মাধ্যমে তাদের ফটোও আদান প্রদান হচ্ছে। প্রকাশ করছে একে অপরের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা। আবার অতি উৎসাহি কোনো তরুণী নিজের রূপের আকর্ষণীয় ছবি তৃষ্ণার্ত যুবকদের জন্য ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছে। তার কাছে চাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করছে না। শুধু তাই নয় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র নারীর অসংখ্য ছবি ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। বহু *Web Sitets* রয়েছে যেগুলো খুলতেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র তরুণীর ছবি ও স্বামী-স্ত্রী দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের মত দৃশ্য

চোখের সামনে ভেসে উঠবে। যুবকরা সারাক্ষণ এই গুলো খুঁজে বেড়ায় এবং নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের সুযোগের সন্ধান করতে থাকে। ইন্টারনেটে কোথাও কোনো বন্ধুর নিকট তথ্য পাঠানোর সময় এসব তরুণীর ছবিও উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু নিজের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে না; বরং অন্যের চরিত্রও ধ্বংস করা হচ্ছে।

আজকের মুসলমানদের কাছে ইসলাম হলো কিছু নিয়ম নীতি ও সাধারণ সামাজিক কিছু আচার আচরণের নাম মাত্র। যার বিচরণ ভূমি হলো হাতে গোণা কিছু পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র। পরিবারের কারো মৃত্যু, বা জন্ম। এই উপলক্ষ্যে নিজেদের বানানো মতে কিছু লোকের খাবারের অনুষ্ঠান করলেই পাক্কা ইসলামিক ফ্যামিলি। অথবা ঘর-বাড়ী নির্মাণ, দোকান-পাট উদ্বোধন করাসহ বিবাহের সময় ইসলামের ডাক পড়ে। অসহায় বেচারা ইসলাম তার রক্তহীন শরীরে এই ডাকে সামান্য রক্তের সঞ্চার হলেও মুহূর্তের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। লাশ দাফনের সাথে সাথে ইসলামেরও দাফন হয়ে যায়। ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট উদ্বোধনের পর পরই খুব জোরে মাইক লাগিয়ে গান-বাদ্য শুরু করে ইসলামের প্রয়োজন শেষ হওয়ার প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়।

বিউটি পার্লার হতে বৌ সাজিয়ে এনে ধনী-গরীব, ফকির-মিসকিন, খালাতো-মমাতো-ফুফাতো ভাই ও নিজ অফিসের বস, পিয়ন, সুইপার এবং ক্লিনারসহ সকল বেগানা পুরুষের সামনে নব বধূর রূপ তুলে ধরে পরিশেষে ইসলামকে অপমান করে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয়া হয় তথাকথিত সেই মুসলমানদের বাড়ী ও বিবাহ অনুষ্ঠান হতে। চক্ষু বন্ধ করে আমাদের বিবাহ উৎসবের কথা চিন্তা করলেই মুহূর্তের মধ্যেই ইসলামের বর্তমান *Temperature* ধরা পড়বে ও বাস্তব চিত্র সবার সামনে ভেসে উঠবে। এটি পরীক্ষার জন্য দেশী-বিদেশী ডিগ্রীর প্রয়োজন হবেনা। এরজন্য লাগবেনা কোনো ডক্টরেট ডিগ্রী বা বিদেশী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডাক্তারী সার্টিফিকেট। প্রয়োজন হবে না কোনো গবেষণা কর্মের।

সমাজের ছোট-বড় সবাই মনে করে ইসলাম হলো কিছু রীতি-নীতির নাম। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-ভদ্রতা ও সংস্কৃতি সমাজনীতি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

জনজীবনের সাথে যার নেই কোনো সম্পর্ক। আর তাই তা কখনো কোনো কাজে আসবে না। অথচ এখান হতেই মানব জীবনের যাত্রা শুরু ও এখানেই শেষ। এখানেই ইসলামের বীজ রোপন সম্ভব ও ইসলামের বৃক্ষ মোটা তাজা হওয়ার সময় ও সুযোগ। এখান থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র পৃথিবীতে। পৌঁছে যাবে ধনী গরীবসহ সকলের দ্বারে। আর ইসলামের এই দাবী স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্বোরআন বলেছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾[১১৫]

'হে মানব আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতে ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।'

দুন্‌ইয়া হতে চলে যাওয়ার পদ্ধতি শিখাতে গিয়ে ক্বোরআন অন্যত্র বলেছে:

﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[১১৬]

'কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।'

শত আফসোস আমাদের সন্তানদের প্রতি! হাজার আফসোস ইসলামের ধারক বাহকদের প্রতি! আমরা কারা? কোথা হতে আমাদের আগমন? কি ছিল আমাদের দায়িত্ব? কি করছি? অথচ পবিত্র ক্বোরআন আমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই আমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছে।

আমরা যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাই তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ইন্টারনেটকে এই যুগে ইসলাম প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে দেখতে পাই। সফল দা'ওয়াতী কাজ চালানোর একটি উত্তম পন্থা। উম্মাতে মুসলিমাহ্‌কে সকল ভুল ত্রুটি হতে মুক্ত করে সমগ্র মানব

১১৫- সূরাতুল হুজুরাত, আয়াত নং-১৩।
১১৬- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং- ১৩২।

জাতির পথ পদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করার একটি বিশেষ যন্ত্র হলো এই *Internet*। এই বিষয়টি আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও উম্মাতের কিছু দরদী মনীষী যাঁরা উম্মাতের সন্তানদেরকে বাঁচানোর জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে যথেষ্ঠ ভুমিকা রেখে চলছেন। ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যাতে করে মুসলমানদের সন্তানরা ইন্টারনেটের ভাল মন্দ যাচাই বাছাই না করে তার উপর উঁই পোকার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের মূল্যবান জীবন নষ্ট না করে দেয়। এই ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ঠ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের বাস্তবরূপ দিচ্ছেন।

অতএব ইন্টারনেটের জন্ম যদি ইসলামের মূলোৎপাটন করার জন্য হয়ে থাকে আমরা সেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত ও পয়গামকে মানব জীবনের গভীরে পৌঁছে দিতে পারি। ইন্টারনেটের জন্ম ইসলামের মৃত্যু ঘটানোর জন্য হয়ে থাকলে আমরা সেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের উত্থান ঘটাতে পারি। আর তাই সেই ইন্টারনেটে এখন পাওয়া যাচ্ছে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। প্রত্যেকটি বিষয়ে জানা যাচ্ছে শারী'য়াতের সঠিক দিক নির্দেশনা। ছড়িয়ে পড়ছে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার। কারণ যারা দাঈ তারা মনে করেন দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুধু মাসজিদের চার দেয়াল, আর ওয়াজ মাহফিলের আঙ্গিনায় সীমাবদ্ধ নয়, এর ক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী এবং সমগ্র মানব সমাজ এর বিচরণ ভূমি।

তাই বিশ্বব্যাপী তাঁরা ইসলামের দা'ওয়াত সকলের কাছে খুব সহজে এবং দ্রুত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে সর্বদা সুযোগের সন্ধানে থেকে সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। এই চিন্তা প্রতিনিয়ত তাঁদের মাথায় ঘুর পাক খেতে থাকে। ক্বোরআনের ভাষায় বলতে হয়:

﴿لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ﴾[১১৭]

'তারা বিশ্বাস করেনা বলে আপনি হয়ত মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন।'

১১৭- সূরাতুশ্ শু'য়ারা, আয়াত নং-৩।

অতএব আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে আমাকে আপনাকে সবাইকে সেই আমানাত আদায় করতে হবে, যেই আমানত বহনে অস্বীকার করেছিল পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস। ক্বোরআনের ভাষায়:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾[১১৮]

'আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো কিন্তু মানুষ তা বহন করলো নিশ্চয় সে অতি অত্যাচারী ও অজ্ঞ।'

আজ সেই আমানত বহনকারী মানব তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সকল প্রকারের পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটি তার ঈমানের দাবী। ছুটে চলতে হবে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ক্বোরআনের শেখানো পথ ও পাথেয় অবলম্বন করে। ক্বোরআনের দা'ওয়াতী পদ্ধতিকে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে শুরু করতে হবে দা'ওয়াতী কাজ। শুধু তাই নয়, সে তার রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছে তিনি হযরত আলী (রা.) কে দা'ওয়াতের কাজে উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেছেন:

(عَنْ سَهَل بن سَعْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعَلِي: فَوَ اللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم)[১১৯]

'সাহাল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) আলী (রা.) কে বলেছেন: আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হিদায়াত পায় তাহলে তোমার জন্য এটি লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।'

রাসূলের এই বাণী স্মরণ রেখে কিছু ইসলামী মনীষী *Internet* ব্যবহার করে পৃথিবীব্যাপী দা'ওয়াতের কাজ শুরু করেছেন। মানব সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন ঠেকাতে তাঁরা নিরলসভাবে *Internet* ব্যবহার করে চলেছেন। মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলো ঈমান-আক্বীদার এই চ্যালেঞ্জকে খুব গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন

১১৮- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৭২।

১১৯- متفق عليه عن سهل بن سعد

করতে শুরু করেছে। তাই তারা দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে *Internet* ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠানোর মত ইন্টারনেটের অন্ধকার হতে যুব সমাজকে রক্ষার কাজে সেই ইন্টারনেটকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম মনে করছে। অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য ইন্টারনেটই হলো উত্তম পন্থা। তাই এই ময়দানে *Islam on Line* এবং *Islamnet* উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। এই দুটি *website* অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

Islam on Line ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯ সালে কাতারে শুরু হয়েছে। এই সংস্থাটিই সর্ব প্রথম আধুনিক প্রযুক্তিকে দা'ওয়াতের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এই সংস্থাটি দা'ওয়াতী ময়দানে এক বিশাল ভুমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে ইসলামের সঠিক পয়গাম ও নির্ভেজাল দা'ওয়াত পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তারা দা'ওয়াতী প্রোগ্রামটিতে সকল প্রকার মতপার্থক্য ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত ও দূরে অবস্থান করে সবার দুয়ারে ইসলামের সঠিক পয়গাম পৌঁছানোর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। এটিই সর্বস্তরে গ্রহণ যোগ্য একটি সঠিক পন্থা। তাই *Internet* ব্যবহারকারীদের উপর এর যথেষ্ঠ প্রভাবও পড়েছে।

তাদের অনুকরণে আমরা আরো অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দা'ওয়াতী ময়দানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে দেখছি। কম বেশী সব গুলো সংস্থাই এই ময়দানে প্রবেশ করে এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও অর্থ যোগান দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কুয়েতের ইসলাম প্রচার সংস্থা এক বিরাট অবদান রাখছে। তাদের *website* টি ইসলাম বিরোধী অন্য যেসব *website* রয়েছে সেগুলোর প্রতিরোধ করার জন্য দাঁত ভাঙ্গা জাওয়াবও দিয়ে যাচ্ছে। যেমন কাদীয়ানী বা আহমাদী গ্রুপের ইসলাম বিরোধী তৎপরতাকে প্রতিরোধ করছে। তুলে ধরছে ইসলামের সঠিক চিত্র ও আক্বীদাহ্। দৃঢ়তার সাথে ইসলামের সঠিক রূপ পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে *Islamnet* নামে এই সংস্থাটি গত বিশ বৎসর যাবত দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে। আগামীতে খুব স্বল্প সময়ের

মধ্যে এই ইন্টারনেটটি তার সকল দা'ওয়াতী প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সক্ষম হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। তারা সকল প্রকারের আধুনিক প্রযুক্তিকে দা'ওয়াতী কাজে লাগানোর জন্য বড় বড় সংস্থাগুলোর সাথে পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। যেন তাদের প্রোগ্রামের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যায়। মুসলমানদরে মাঝে মুসলমানদের ভাষায় ও তাদের সংস্কৃতিতে দা'ওয়াতের কাজ করছে।

Islamnet খুব সহজ ও সরল ভাষায় দা'ওয়াতী কাজ করছে। তাই ইসলামের পয়গাম বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হয় না। নও মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এর মাধ্যমে বিরাট কাজ হচ্ছে। বর্তমান যুগের এটি একটি বিরাট ও বিশাল ইসলামী খেদমাত। আধুনিক প্রযুক্তিকে দা'ওয়াতী কাজে লাগাতে পারলে ইসলামের দা'ওয়াত খুব সহজে সবার কাছে একটি গ্রহণ যোগ্য পন্থায় উপস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এটি একটি গঠনমূলক, আন্তর্জাতিক ও যুগোপযোগী কাজ। যেখানে দুশমনরা ইসলামের মুলোৎপাটনের জন্য ওৎপেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই তারা তাদের সেই বিষাক্ত ছুরিটি ইসলামের পিঠে চালাতে বিলম্ব করছেনা। মনে করছে ফুঁ দিয়ে এই নূরকে নিভিয়ে দিতে পারবে। ক্বোরআন তাদের এই অপকর্ম ও ইসলামের শক্তি সম্পর্কে রেকর্ড করে রেখেছে:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾[১২০]

'তারা তাদের ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন। যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।'

তাই আজ পৃথিবী জুড়ে বহু অমুসলিমকে ইসলামের দিকে ধাবিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে দেখা যাচ্ছে। তারা তাদের অতীত জীবনের উপর অতিষ্ঠ হয়ে শান্তির অন্বেষায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইসলামের ছায়া তলে তারা সেই শান্তি দেখতে পাচ্ছে। এই লেখাটি যখন লিখছি তখন আমার জীবন সঙ্গিনী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী ইন্টারনেট হতে

১২০- সূরাতুত্ তাওবাহ, আয়াত নং-৩২।

নাইজেরিয়ায় অবস্থিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটির তিনজন প্রফেসরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেখালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, বর্তমান পৃথিবীতে এমন অসংখ্য শিক্ষিত মানুষরা শান্তির খোঁজে রয়েছে। তারা বুঝতে পারছে যে, ইসলাই একমাত্র তাদেরকে শান্তি দিতে সক্ষম। তাই তারা ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে।

যদিও তারা স্বাধীন ভাবে অতীত জীবন কাটিয়েছে, যেই জীবনে ছিলোনা কোনো নিয়ম নীতি ও সীমা রেখা। বিচরণের সকল ভূমিই ছিল তাদের জন্য উন্মুক্ত। কোনো প্রকারের নিয়ম নীতির বালাই ছিলনা তাদের জীবনে। নারী সম্ভোগই ছিল তাদের জীবনের সকল সুখ ও আনন্দ, শুরু ও শেষ এবং জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া। কিন্তু এখন তারা বুঝতে শুরু করেছে যে, নারী দিয়ে তাদের আসল পিপাসা নিবারণ সম্ভব নয়। যৌন স্বাধীনতা তাদেরকে শারীরিক শান্তি দিলেও মানসিক শান্তি তাদের জীবন হতে চির দিনের জন্য ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের হারানো এই শান্তি একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। তাই তাদের ধারণা অনুযায়ী ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করেছে। ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তাদের কেউ কেউ মুসলিম মনীষীদের নিকট রাসুল (স.) এর ফটো চেয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে।

আমেরিকার একজন মহিলা *Islamnet* বরাবর রাসূলের (স.) ফটো চেয়ে অনুরূপ একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলের ফটো তিনি তার বাড়ীর দরজায় বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রাখতে চান। এইভাবে তার বাড়ি ও বাড়ির লোকজন রাসূলের ফটোর মাধ্যমে বরকত লাভ করবে। আবার অন্য এক মহিলা মিউজিকের মাধ্যমে ক্বোরআনের কপি চেয়ে পাঠিয়েছেন। কারণ সে মনে করেছে খৃষ্টানদের গির্জায় যেমন মিউজিক বাজায় ক্বোরআনও মিউজিকের মত কিছু একটা হবে। যদিও তাদের এসব চিঠি হাস্যকর ও আশ্চর্য জনক। কিন্তু এগুলো মুসলমানদের দরজার কড়া নাড়িয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে, যারা মনে করছে আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি আমাদের দায়িত্ব এখানে শেষ। অন্য সব বণী আদমের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের নয়। এই বলে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ভুলে যেতে চাচ্ছে। অথচ

পবিত্র ক্বোরআন পরিষ্কার করে তাদের পজিশন ও দায়িত্ব বলে দিয়েছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বর্তমান যুগ হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের যুগ। নিত্য নতুন প্রযুক্তি উপস্থাপন ও সৃষ্টির যুগ। এই যুগে মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার কাজে ব্রত রয়েছে। প্রচার মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও উপকারিতা এই যুগে ছোট-বড় শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সবাই সমান ভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রচার-পরিচিতি অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ও প্রভাবিত হয়ে উঠছে মানব সমাজ ও সংস্কৃতি। বর্তমান যুগের ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যম ও আধুনিক পদ্ধতি যেন সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় বন্দী করে রেখেছে।

ইসলাম যেহেতু একটি সামগ্রিক ও সার্বজনীন ধর্ম। বিশ্বব্যাপী তার পয়গাম ও দা'ওয়াত, যেহেতু ইসলাম *Complete Code of life* তাই সমগ্র মানব জাতির জন্য মনোনীত ধর্ম ও নাজাতের একমাত্র সূত্রও রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্যারান্টি। বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহ্যে যেখানেই হোক এই বিশ্বধর্ম ইসলামের প্রচার ও পয়গাম সবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার তার জন্য অপরিহার্য। কারণ এই যুগে *Internet & Satellite Media* মানব জীবনের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। তাই ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য এই আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো অত্যন্ত প্রয়োজন ও বর্তমান সময়ের দাবী। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইউরোপ আমেরিকাসহ উপসাগরীয় মুসলিম দেশের স্কলারগণ এই ময়দানে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন।

ইন্টারনেটে শত শত নয়; বরং হাজার হাজার *Websites* পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে খুব সহজে সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়। এই প্রযুক্তির প্রয়োজনীতা ও জনপ্রিয়তা আমরা তখন অনুভব করতে পারি যখন আমরা জানতে পারি যে, বর্তমানে বিশ্বের শত কোটি মানুষ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যেহেতু ইন্টারনেটে ইসলামী *Websites* অনেক বেশী তাই ভুল ত্রুটিও অনেক বেশী এবং নিয়ম শৃংখলার প্রচন্ড অভাবও

পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সব সমস্যা ও ভুল ত্রুটি দূর করে অত্যন্ত সু-চ্ছৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা আবশ্যক। এটি করতে পারলে তখন ইসলামের উদ্দেশ্যও সাধন হবে খুব সহজেই **ইন্ শা আল্লাহ্**। আশা করা যাচ্ছে, খুব দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে করে *Internet* ব্যবহারকারীরা উপকৃত হতে পারে।

অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা যারা ইসলামের বিরোধিতায় আদা জল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে তারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে তাদের ভ্রান্ত ধ্যাণ-ধারণা প্রচার ও প্রসারের কাজে এই আধুনিক প্রযুক্তিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করে চলেছে। যার মাধ্যমে তারা ইসলামের সঠিক আক্বীদাহ্ ও শিক্ষা, তা'লীম ও তারবিয়াত, দা'ওয়াত ও পয়গামের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সরল মানুষদের অন্তরে সন্দেহের বীজ রোপন করে চলেছে। তারা এই কাজে সারাক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে যাচ্ছে। তাই *Internet* ব্যবহারকারীকে সাবধান ও ইসলামের শত্রুদের অপ-তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। বিশেষ করে কাদীয়ানীরা ইসলামের দুশমনদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার প্রসারে অধিক আগ্রহী ও পরিশ্রমী দেখা যাচ্ছে। তাদের *websites* রয়েছে অনেক যার সংখ্যা ৫২৬। *Home page* এর সংখ্যা ১৩২০। তাই তাদের প্রচার প্রপাগান্ডা হতে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

ইসলামের সঠিক পয়গাম বুঝার জন্য অন্যদেরকে *Islam on Line & Islam net* ব্যবহারের পরামর্শ দিতে হবে। *Islam on Line & Islam net* এই দুটি *website* অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের সঠিক পরিচিতি ও পয়গাম, ইসলামী আক্বীদাহ্ ও দা'ওয়াত, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার প্রসারের কাজ খুব গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দিয়ে আসছে। ৫ই অক্টোবর ১৯৯৯ সালে কাতার হতে সর্ব প্রথম এর যাত্রা শুরু হয়। আরবী প্রোগ্রামের সেন্টার হলো কায়রো এবং ইংরেজী প্রোগ্রামের সেন্টার হলো আমেরিকায়। উভয় প্রোগ্রামের প্রস্তুতি ও অঙ্গ সজ্জার কাজ হয় বাহরাইনে। বিভিন্ন দেশে ও বহু দূরত্বে কাজ হওয়া সত্বেও আধুনিক যুগের ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে হাজির করে দিচ্ছে। এক দেশ অন্য দেশের সামনে এসে হাযির হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মনে হচ্ছে যেন সারা

পৃথিবী এক শৃংঙ্খলে আবদ্ধ টান দিতেই এসে হাজির। এই *Website* টি খুব নিরবে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে সৃষ্ট সন্দেহ ও সংকোচ দূর করতে এক অনন্য খেদমাত আঞ্জাম দিচ্ছে। আমরা তাদের আরবী-ইংরেজী ভাষার প্রোগ্রাম গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি:

1. Education Centre
2. Service Centre
3. Media Centre

1. Education Centre এর মাধ্যমে ইসলামের সঠিক পরিচিতি পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে সৃষ্ট অভিযোগ, ভিত্তিহীন অপ-প্রচার ও প্রপাগান্ডা এবং ভ্রান্ত-ধ্যান ধারণা দূরীকরণ ও ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই হলো এর প্রধান কাজ।

2. Service Centre এই কেন্দ্রটির কাজ হলো মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দেয়া।

3. Media Centre এই কেন্দ্রটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও টেকনোলজী সম্পর্কে সঠিক ও নিত্য নতুন তথ্য প্রদান করে।

অনুরূপভাবে শার'ঈ ও ইসলামী জ্ঞান এবং ফাত্ওয়ার জন্য এই *web site* এ একটি ফাত্ওয়ার ব্যাংক এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস, তাহযীব ও তামাদ্দুন সম্পর্কীয় হাজার পৃষ্ঠায় বিস্তৃত খেলাফাতে বানু উমাইয়াহ্ হতে খেলাফাতে উসমানিয়াহ্ পর্যন্ত ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর ও সহজভাবে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এর সাথে কয়েক হাজার ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বহু মুসলিম দেশের ঐতিহাসিক শহর বন্দর ও অঞ্চলের ইতিহাস সঠিক ও সহজভাবে জানা যায়। ইসলামী ইবাদাতের নিয়ম নীতিগুলোও বিভিন্ন চিত্রের সাথে বুঝানো হয়েছে। যা এক জন মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারে। তাই বলছিলাম, ইন্টারনেটেই ইসলামের দা'ওয়াত খুব সহজেই সবার দ্বারে পৌঁছানো সম্ভব।

অতএব আমরা যদি এই আধুনিক পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে পারি তাহলে অচিরেই এটি হবে ইসলামের শত্রুদের দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেয়ার একটি মুল্যবান অস্ত্র। যা সবখানে সর্বাবস্থায় সমান তালে কাজে করবে। তিক্ত

হলেও সত্য, খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য যেভাবে *Internet* ব্যবহার করছে মুসলমানরা তাদের তুলনায় ব্যবহার করছে ১২% কম। তবুও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। এতেই ইসলামের সত্যতা ও গ্রহণ যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। তাই ওলামায়ে ইসলাম বর্তমান যুগে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ আমাদের রাসুল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)[১২১]

'হিক্বমাত হলো মুসলমানদের হারানো সম্পদ, এটি যেখানেই পাওয়া যাবে সেটির হক্বদার হলো মুসলমান।'

আনন্দের বিষয় হলো, মুসলমানদের এই মূল্যবান সম্পদটি এখন ধীরে ধীরে তাদের হাতে ফিরে আসতে শুরু করেছে। অতএব ওলামায়ে ইসলাম তাদের জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে এবং ধনী মুসলমানরা তাদের অর্থ খরচ করে বর্তমান যুগের আধুনিক ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রভাব বিস্তারকারী ইন্টারনেটকে ইসলামের কাজে লাগাতে পারেন। ক্বোরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমরা এখানে ইন্টারনেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ *website* তুলে ধরছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দাঈ ইলাল্লাহ্‌ যারা, তারা অবশ্যই উপকৃত হতে পারবেন **ইন্ শা আল্লাহ্‌**।

1. www.binbaz.org.sa
2. *www.ibnothaimeen.com*
3. www.salafi.net
4. www.islam-qa.cam/index arah.tml
5. www.is;am-online.net
6. www.al-islam.com/asite.htm
7. www.islam.gov.qa
8. www.islamic.news.org/arabic/index.html
9. www.islamweb.net/arabic

---

[১২১] - حاولت تخريجه فوجدته ضعيف جدا، أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الزهد/باب الحكمة)، ح ٤١٦٩ (٢/١٣٩٥)؛ والترمذي في سننه وقال الألباني: ضعيف جدا، المصدر نفسه.

10. www.naseei.com/islamic
11. www.islamsun.com
12. www.islamway.com
13. www.islamsun.com/serv/search/htm
14. alresalah.ejb.net
15. www.islam.org.sa/fsarbic/INFOL6A.htm
16. www.alazhar.org/index6.htm
17. www.dar-alwatan.com
18. meltingpot.fortunecity.com/seym our/153
19. www.islam.org.sa
20. www.naseej.com/islamic/events/profiles23.html
21. www.sultan.org/shia.html
22. arabic.islamweb.com/christianity
23. www.islamweb.com/arabic/omages/lessons/darb/darb.htm
24. alislam.com/AFDefault.htm
25. islamweb.islam.gov.qa/quraan/index.htm
26. www.geocities.com/Athens/Forum/2206/gazawat.html
27. www.ditnet.co.ae/contest/cuser13
28. feqh.al-islam.com
29. fatawa.al-islam.com
30. www.alazhr.org/ftawa.htm
31. www.alejaz.org
32. hajj-guide.org
33. Qaradawi.net

অতএব আমরা মনে করি, যে জাতি মানব সমাজে সভ্যতা প্রতিষ্ঠার দাবীদার হবে সেই জাতি সমাজের সৌন্দর্য এবং অন্যন্য প্রয়োজনকে কখনো উপেক্ষা করতে পারবে না।[১২২]

১২২-এই লেখাটির কিছু অংশ ১৬২-১৮৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত **'ইন্টারনেট ও ইসলাম'** শিরোনামে ঢাকার সাপ্তাহিক **'সোনার বাংলা'** পত্রিকাতে ২০০৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। নববর্ষ উদযাপন করতে এসে সে সময়ে ঢাকা ভার্সিটির কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের হাতে বাঁধন নামক এক তরুণীর নব বর্ষের জোয়ারে বাঁধন খুলে যাওয়ার ঘটনায় তখন সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিলো। মূলতঃ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই লিখাটি লেখা হয়েছিলো। এখন এই বইতে সংযুক্ত করার সময় আরো কিছু নতুন তথ্য সংজোযিত হয়েছে।

প্রফেসর নাদভীর গবেষণা কর্ম :

১. ফাত্ওয়া বিবাহ ও ত্বালাক্ব (আংশিক) ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
২. ফাত্ওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (আংশিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৩. আরবী বাংলা অভিধান (আংশিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
৪. নারী এজেন্ডা
৫. বিয়ে
৬. সংসার
৭. দাম্পত্য জীবন
৮. সভ্যতায় নারী
৯. বিশ্বায়ন ও নারী
১০. শ্বশুর বাড়ি ও বাবার বাড়ি
১১. বিশ্বধর্মে নারী
১২. ডিভোর্স

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর নাদভী দ্বীন ভিত্তিক সমাজ চিন্তক গভীর জীবন দর্শনে দক্ষ এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁর পিতা জনাব আব্দুর রাযযাক্ব মাস্টার। মাতা মেহের আফযুন বেগম। পৈতৃক নিবাস ফেনীর ফুলাগাজী উপজেলার নতুন মুন্সির হাটের নোয়াপুর গ্রামে। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তিনি নাদভী নামে ইসলামী লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর প্রকৃত নাম এইচ. এম. আতাউর রাহমান নাদভী। তার দুই পুত্র জারীর নাদভী ও জালীস নাদভী এবং দুই মেয়ে নাবেগাহ্ নাদভী এবং নাদেজাহ্ নাদভী। স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী।

নোয়াপুর প্রাইমারী স্কুল হতে ক্লাস ফোর পাস করে পুরাতন মুন্সীরহাট হাফেযিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনিই উক্ত মাদ্‌রাসার প্রথম ছাত্র। পরবর্তীতে জামেয়া ক্বোরআনিয়া আরাবিয়া (ঢাকা-লালবাগ) হতে ক্বোরআন হেফয সম্পন্ন করে তদানীন্তন জামেয়ার মুফতি এবং বায়তুল মোকার্‌রম মাসজিদের খাতীব আল্লামা মুফতি মঈয (রাহ.) কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। উক্ত জামেয়ার নাহ্‌ভেমীর (ক্লাস সেভেন) পর্যন্ত পড়ার পর ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌর নাদওয়াতুল উলামার মা'হাদ (মাধ্যমিক স্কুল) এর অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে দীর্ঘ এগার বছর অধ্যয়নের পর শারী'য়াহ্ ফ্যাকাল্টি হতে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

এখানে উল্লেখ যে, এত দীর্ঘ সময় বাংলাদেশী কোন ছাত্র নাদওয়ায় কখনো পড়েনি। এই সুযোগে তিনি নাদওয়ার উস্তাযদের দিক নির্দেশনায় দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় আরবীতে প্রবন্ধ লেখার পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হন। এ কারণেই তার চিন্তা-চেতনা অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম। নাদওয়ার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি আরবী-বাংলায় লেখা-লেখি শুরু করেন। তাঁর লিখিত আরবী প্রবন্ধ নাদওয়ার 'আল-রায়েদ' ও 'আল্-বা'আসুল ইসলামী' তে নিয়মিত যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনিভাবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলায় লিখিত প্রবন্ধগুলো ভারত-বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক এ প্রকাশিত হওয়ায় দেশ-বিদেশে বেশ সাড়া পড়েছে। তাঁর আরও সৌভাগ্যের বিষয় হলো, তিনি আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহ.) এর সরাসরি ছাত্র। বাংলাদেশে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে পুনরায় মাস্টার্স এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচ. ডি গবেষক। তিনি নাদওয়ার ডিগ্রীপ্রাপ্তদের প্রথম ছাত্র যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাদওয়ার ডিগ্রী সমতাকরণের মাধ্যমে নাদভীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির রাস্তা উন্মুক্ত করে।

তিনি IIRO(International Islamic Relief Organization) এর তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে ঢাকা হতে প্রকাশিত মাসিক **'আস্-সাহ্‌ওয়াহ্'** আরবী জার্ণালের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ঢাকার দারুল আরাবিয়াহ্ হতে প্রকাশিত মাসিক 'আল্-হুদা' আরবী জার্ণালের নির্বাহি সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাজ করেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এ আরবী ভাষার অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।